কবিতা

বার্ষিক সূচিপত্র
একবিংশ বর্ষ
আশ্বিন, ১৩৬৩
আষাঢ়, ১৩৬৪

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

ওঁ কৃতংস্মর ৩৬
দিনান্ত ৩৬
ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে ৩৭
রাত্রি ৩৭
যুগ্ম দূর ৩৮
শ্রুতি ৩৮
স্ট্রাটো স্কোয়াড্রন ২৫৩
দ্বীপান্তরে ২৫৪
আরো ২৫৪

অর্চন দাশগুপ্ত

সনেট ১১২
সম্রান্ত চাবুক ২৫৯

অরবিন্দ গুহ

প্রতিদ্বন্দ্বী ৪৪
বিপরীত ঋতু ৪৪

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেয়ালটা ১০৯
পান্থশালা : নীলকণ্ঠপুর ১১০
নতুন ১১০

আবুল কাশেম রহিমউদদীন

মঞ্জুশ্রীকে ৫

ধ্যান ৫

আকাশে তখন কান্না ২৪০

ইমামুর রশীদ

রাত্রির হাতে ২৪১

উৎপলা মুখোপাধ্যায়

আবিষ্কার ১৩৫

কমলেশ চক্রবর্তী

কুচু ও মস্তর জন্য ২৫৬

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে ৪৭

লগ্ন ১১৫

অপসরণ ১১০

গোপাল ভৌমিক

দ্বন্দ্ব ৫৪

দ্বিচারিণী ২৭১

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নীল চিঠি ১২৫

জীবনানন্দ দাশ

জীবনের মানে ভালো ১

জোনাকি ২

মরালীরা ৩

আমি ২৫০

চিঠি এলো ২৫১

জ্যোতির্ময় দত্ত

প্রাগৈতিহাসিক মৃগয়া ৪০

তপন চট্টোপাধ্যায়

বুড়ো লোকটা ১৩১

তরুণ সান্যাল

দু'একটি দুপুর ২৫৭

তারক সেন

অভিজ্ঞান ১৩২

দ্বীপ ১৩৩

দেবতোষ বসু

স্মৃতি ৩১১

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

না মিলুক নাম ১২০

নরেশ গুহ

বিকল্পে উটের সার ১৭৫

পরমেশ ধর

বাড়ি ২৩৬

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

বাদুড় ২৩৮

প[illegible]র্ভবাস্থ ২৩৯

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কাণ্ডাঘাট স্টেশনে ভোর ১২৩

পাখির মতো ২৪২

পর্দা ২৪২

প্রতিমা পাল

রূপকথা ৫২

জলছবি ১২২

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

পাথর-দিন ১৪১

হৃত-রোমাঞ্চ দিন ১৪১

মাঝরাতের ডাকবাংলোয় ১৪৭

মানুষ-মাটি-ঘাস ২৬৩

বিশ্বনাথ সমাজদ্বার

প্রশ্ন ২৬৮

বিষ্ণু দে

মালার্মে : প্রগতি ১০২

সনেট ২৪৯

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যাপ্ত ৩০৩

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

পাখি জানে ১৩৭

নদীর নায়ক, সূর্যের নায়িকা ১৩৭

বুদ্ধদেব বসু

অনুরাধা ৫৫

গ্যেটের অষ্টম প্রণয় ৩১৬

গ্যেটের নবম প্রণয় ৩১৭

সর্বেশ্বরী ৩১৭

মুক্তির মুহূর্ত ৩১৮

মৃণালকান্তি

একটি পাখি ১০৫

প্রেমিকের গান ১০৫

অন্বেষণ ১০৬

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দেখা ১১১

অরণ্যরাত্রি ২৬১

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টির সন্ধ্যা ১৩০

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

একগুচ্ছ রোদ :

১. আততায়ী ৩০১

২. কিম্পুরুষ ৩০১

৩. সুন্দরী ৩০২

রাজলক্ষ্মী দেবী

জলছবি ১০৭

একলা হৃদয়ের একলা ঘরে তুমি ২৬০

লোকনাথ ভট্টাচার্য

অনাগত সন্ধির ভোর ৪৬

তিন মুহূর্ত ২৬৫

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শপদী ৪৯

জরাসন্ধ ১২৯

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ ১২৪

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অম্বালিকা ৩০৫

শহীদ কাদরী

নির্বাণ ৪২

শান্তিকুমার ঘোষ

কানারীয় ১০৮

এস্‌কালেটর ৩০৬

ওয়াই ভ্যালি ৩০৭

শামসুর রাহমান

একান্ত গোলাপ ৫৩

সুন্দরের গাথা ১০৩

শোভন সোম

চক্রবৎ ১২৬

সুনীল সরকার

প্রথম ছোঁয়া চাই ৩০৮

পাখিটা ৩০৮

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নভরা রাত ১৩৬

সৈয়দ শামসুল হক

বস্তুত অরণ্য আমি ১১৩

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

দুই তীর ১২৭

গৌরী ১২৭

অনুবাদ কবিতা

কালিদাসের 'মেঘদূত'

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

১. পূর্বমেঘ ৪-১৮

২. উত্তরমেঘ ৮৫-১০১

ছত্তিশগড়ের লোকসংগীত ১১৭

(অনুবাদ : বিকাশ দাশ)

ফ্রীডরিখ হ্যেল্ডারলিন

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ ১৩৯

শার্ল বোদলেয়ার

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

১. ভাঙা ঘণ্টা ১৪৯

২. লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা ১৪৯

৩. ইকারুস-বিলাপ ১৫০

৪. কোনো ক্রেয়ল মহিলাকে ১৫১

৫. হেমন্তের গান

ক : 'বেশি আর দেরি নেই' ১৫১

খ : 'তোমার দীঘল চোখে ভালোবাসি' ১৫২

৬. বৃষ্টি ও কুয়াশা : ১৫৩

৭. De Profundis Clamavi

(পাতাল থেকে আমি ডেকেছি) ১৫৩

৮. প্রোজ্জ্বল ক্লেদ ১৫৪

৯. পিশাচী ১৫৫

১০. সিথেরায় যাত্রা ২৪৩

১১. শয়তান-স্তোত্র ২৪৫

১২. খুনের মদ ২৮৭

১৩. বিষাদ গীতিকা ২৮৯

১৪. ফোয়ারা ২৯১

১৫. প্যারিস-স্বপ্ন ২৯৩

১৬. এক শহীদ ২৯৬

১৭. পাঠকের প্রতি ২৯৯

প্রবন্ধ

জ্যোতির্ময় দত্ত

হাইনে : ফাউস্ট ও ফীনিক্স ৫৮

নরেশ গুহ

ডিলান টমাস ৭১

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ : দু'জন অসবর্ণ কবি ১৯

বুদ্ধদেব বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৭

সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত' ১৬৯

সন্তোষ প্রতিহার

'মেঘদূত' ও তার অনুবাদ ২৭২

চিঠিপত্র

জীবনানন্দ দাশের কবিতা ৩২০
প্রদ্যুম্ন মিত্র

তরুণ কবিদের প্রসঙ্গে ৮৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর নতুন সনেট ৮১
কার্তিক লাহিড়ী

'মেঘদূতে'র অনুবাদ
জ্যোতিভূষণ চাকী ১৬২
তন্ময় দত্ত ১৬৫

'মেঘদূত' অনুবাদকের বক্তব্য
বুদ্ধদেব বসু ১৬৬

আলোচনা

বু. ব ৭৮
['বুদ্ধদেব'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বুদ্ধপ্রসঙ্গ'—মহেশচন্দ্র ঘোষ, 'হিন্দু আইনে বিবাহ'—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
কবিতা মেলা ৩১৩

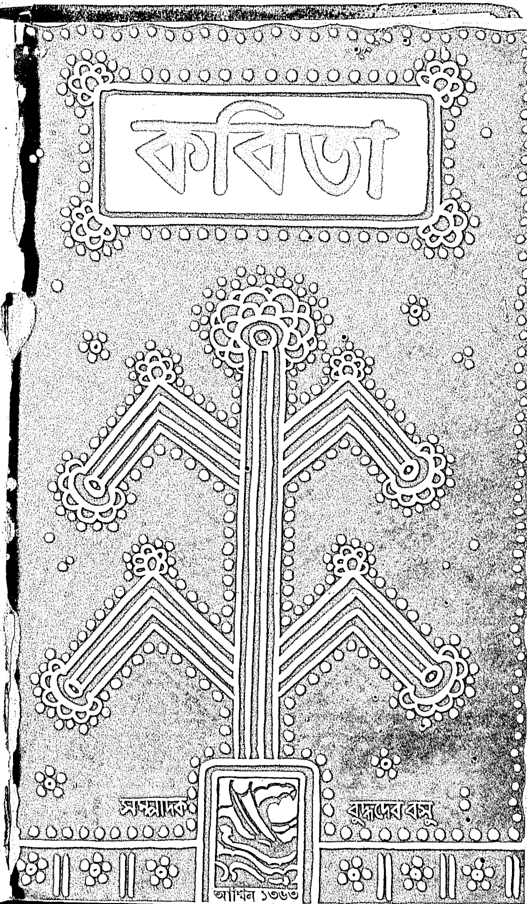

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

পঁচিশ বছরের

প্রেমের কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত

সংকলিত ৬০ জন কবির আদিতে আছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ হয়েছে তরুণতম কবির রচনা দিয়ে। উপরন্তু, গ্রন্থ সূচনায় সম্পাদক 'কবিতা ও প্রেম' বিষয়ে সুদীর্ঘ একটি দার্শনিক আলোচনা যোগ করেছেন। প্রবন্ধটি মূল্যবান।

জীবনের একটি পরম মূল্য প্রেমের উপলব্ধি। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানবমনের এই উপলব্ধি শিল্পের ও সাহিত্যের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। শিল্পী প্রেমিকের, শিল্প প্রেমের সগোত্র বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে নিশ্চয়ই।

'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সেই রকম উৎকৃষ্ট একটি আয়নার মতো মতো, যাতে প্রতিচ্ছায়ার বিকার ঘটে না, সাম্প্রতিক কবিমনে চিরন্তন প্রেমের প্রসঙ্গ যে-যে ভাবনা এবং উপলব্ধির সঞ্চার করেছে, তার নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায় সে-আয়নাতে। দাম ৪৷৷০। সিগনেট প্রেসের বই।

সিগনেট বুকশপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২
১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

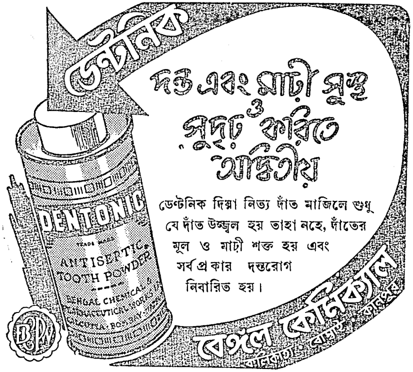

এইচ্, বি, ফাউন্টেন পেনের কালির অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়—এর পিছনে আছে সুদীর্ঘ দিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অনুশীলন।

তাই আজ শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী ও সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জনসাধারণ বেছে নিয়েছেন এইচ্, বি, ফাউন্টেন পেনের কালি একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব'লে।

ভালো কালি মহৎ রচনার প্রতীক

এইচ্, বি, এণ্ড কোং কলিকাতা-১৭

LOOKS AT BOOKS

BERNARD GRUN :	The Golden Quill : A novel built around the truly fabulous life story of the sublime Mozart.	16s.
BERNARD SHAW :	Advice to a Young Critic	16s.
EDMUND WILSON :	Red Black Blond and Olive : Studies in four Civilizations : Zuni, Haiti, Soviet Russia, Israel.	25s.
GEORGE PADMORE :	Pan-Africanism or Communism ? The Coming Struggle for Africa	25s.
HERMANN HESSE :	The Journey to the East : This novel by the author of SIDDHARTHA is regarded as being among Hesse's best work, and in its concept can be compared with his Nobel Prize novel Magister Ludi.	11/6d
JACK GAVER, Ed. by	Critics' Choice : New York Drama Critics' Circle Prize Plays 1935-55	21s.
JACK LINDSAY :	After The Thirties : The Novel in Britain, and its Future	15s.
JEAN COCTEAU :	Maalesh : A theatrical tour in the Middle East	16s.
	Paris Album 1900-1914 : Illustrated by the Author	16s.

Rupa & Co.

15, Bankim Chatterjee Street,
CALCUTTA - 12

107, South Malaka,
ALLAHABAD-1

11, Oak Lane, Fort,
BOMBAY-1

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) উইকুলী ওয়েষ্ট বেঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬ টাকা; ষাণ্মাষিক ৩ টাকা।

(২) কথাবার্তা—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাষিক ১॥০ টাকা।

(৩) বসুন্ধরা—গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) স্বাস্থ্যশ্রী—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টিবিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় মাসিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা।

(৫) পশ্চিম বংগাল—নেপালী ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ১॥০ টাকা।

(৬) মগরেবী বংগাল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

প্রকাশিত হল

শ্রীনন্দলাল বসু

শিল্পচর্চা

"শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁর দীর্ঘ জীবনে যেমন ভাবের ও রসের সাধনা করেছেন, তেমনি শিল্পের পুরাতন বা নূতন রীতি (style), অপরিচিত প্রকরণ (technique), বিচিত্র ও বিভিন্ন করণ ও উপকরণের ব্যবহার—এ সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহ সদা জাগ্রত। এই সুলিখিত সুমুদ্রিত ও প্রচুর চিত্রভূষিত গ্রন্থে শিল্পী সেই সমস্ত করণ উপকরণ প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর সারা জীবনের অমূল্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়েছেন।

"গ্রন্থের শেষভাগে মণ্ডনশিল্প, ছাপছোপ বা টাচের কাজ প্রভৃতি প্রসঙ্গে শিল্পী এমন অনেক কথা বলেছেন, যার গভীর তাৎপর্য অলঙ্কারশাস্ত্রী বা নন্দনতাত্ত্বিক ভাবুক ও তত্ত্বদর্শীদের চমৎকৃত করবে ও চিন্তার খোরাক হবে।

"এই গ্রন্থে ২৫টি আর্টপ্লেট এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে প্রচুর ব্যাখ্যামূলক চিত্র আছে। সুনির্বাচিত জগন্নাথের পট বা কালীঘাটের পট, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর রসভূয়িষ্ঠ চিত্রাবলি বইটিকে অত্যন্ত লোভনীয় করেছে। মুদ্রণ সম্পাদন প্রভৃতি বিশ্বভারতীর সুনামেরই উপযোগী।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

কাগজের মলাট ৫৲ বোর্ড বাঁধাই ৬॥০

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

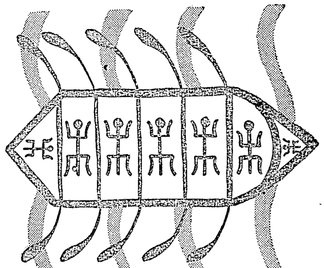

বৃষ্টি ভেজা গ্রাম। কানায় কানায় ভরা নদ নদী

খাল বিল। ঘরে ঘরে বৌ-ঝিরা সুরু করে ভাদুলী ব্রত

দাওয়ায় আর উঠানে আলপনা আঁকে

সাত সওয়ারীর না'—আপনজন সব বিদেশ

থেকে ফিরবে—নাও তাদের নির্বিঘ্নে ঘাটে এসে ভিড়ুক……

নির্বিঘ্ন যাত্রায় পূজার আনন্দ নিবিড় হোক

পূর্ব রেলওয়ে : দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

টাটা ষ্টীল

দেশের সেবায় নিরত

TN 1051

লেখকের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'য় প্রকাশের জন্য যাঁরা রচনা পাঠাতে চান, নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

(১) লেখা ফেরৎ পেতে হ'লে যথোপযুক্ত স্ট্যাম্প-সমেত ঠিকানা-লেখা খাম সঙ্গে দেবেন।

(২) যদি লেখা ফেরৎ না চান, কিন্তু সম্পাদকের সিদ্ধান্ত জানতে চান, তাহ'লে ঠিকানা-লেখা পোস্টকার্ড পাঠালেও চলতে পারে। সম্পাদকের 'মতামত' কোনোক্রমেই জানানো সম্ভব নয়।

(৩) লেখকের নাম ও ঠিকানা পাণ্ডুলিপির উপরে বা নিচে স্পষ্ট ভাবে লেখা থাকা প্রয়োজন।

(৪) রচনার সঙ্গে স্ট্যাম্প না-পাঠিয়ে, পরে তা ফেরৎ চাইলে বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে কোনো ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়।

(৫) বুক-পোস্টে রচনা পাঠালে সঙ্গে কোনো পত্র পাঠাবেন না।

(৬) আমরা ছদ্মনামের পক্ষপাতী নই, কিন্তু কোনো লেখক তা ব্যবহার করলে তাঁর প্রকৃত নাম ও ঠিকানাও জানাবেন।

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * যাণ্মাষিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। *সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

—এই সংখ্যায়—

কালিদাসের মেঘদূত (সম্পূর্ণ পূর্বমেঘ)
অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ দাশ-এর তিনটি কবিতা
ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত

দু-জন অসবর্ণ কবি : রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ
নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

হাইনরিখ হাইনে-র শতবার্ষিকী
জ্যোতির্ময় দত্ত

ডিলান টমাস
নরেশ গুহ

অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অরবিন্দ গুহ, গোপাল ভৌমিক, শামসুর রাহমান, লোকনাথ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় দত্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আবুল কাশেম রহিম উদ্দীন, প্রতিমা পাল, শহীদ কাদরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চিঠিপত্র : কার্তিক লাহিড়ী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত হ'লো

বুদ্ধদেব বসুর নতুন উপন্যাস

শেষ পাণ্ডুলিপি

বিবেকবান সাহিত্যিক সুধুমাত্র সর্বজনপ্রিয় উপন্যাস লিখে সুখী ও সন্তুষ্ট হন না। উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মন্বন্তরের দিনেও তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ অখণ্ড শিল্প সৃষ্টি করা। বুদ্ধদেব বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস 'শেষ পাণ্ডুলিপি'তে এ-কথাই সুপ্রমাণিত যে, সুলভ হাততালির প্রত্যাশা না ক'রে উপন্যাস-শিল্পের সমূহ দাবিপূরণের আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চমকপ্রদ সুগঠিত কাহিনী ও রচনাসৌকর্যে 'শেষ পাণ্ডুলিপি'র অসামান্যতা সুস্পষ্ট। এক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অকপট অথচ জ্বালাময় চরিত্রের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ ও চিত্রণ-নিপুণতায় অবিস্মরণীয় উপন্যাস। দাম—৩৷৹

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

লেখকদের বিষয়ে

অমিয় চক্রবর্তী সম্প্রতি ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জবাসী ভারতীয়দের অবস্থা অধ্যয়নের জন্য ঐ অঞ্চলে বিস্তীর্ণভাবে ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। **অরবিন্দ গুহ**-র জন্ম ১৯২৮-এ ; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দক্ষিণ নায়ক' 'কবিতা'র গত আষাঢ় সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। তাঁর কবিতা ও ছোটোদের গল্প বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। **আবুল কাশেম রহিম উদ্দীন**-এর জন্ম জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষক-পরিবারে ; তিনি নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো ক'রে কলকাতায় বসবাস করছেন। **গোপাল ভৌমিক** সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বহু পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারে কর্ম করেন। **নরেশ গুহ** বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদন করছেন। **নিরুপম চট্টোপাধ্যায়** বাংলা সাহিত্যর অনুরাগী, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং 'কবিতা'র সঙ্গে বহুকাল ধ'রে সম্পৃক্ত। **প্রতিমা পাল** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্রী। **শক্তি চট্টোপাধ্যায়** 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। **শহীদ কাদরী** ঢাকায় থাকেন, 'কবিতা'য় তাঁর লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে।

সংশোধন : গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'মিনতি' ও 'বিবৃতি' কবিতার লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপনা করেন, আমাদের এই ধারণা ভুল ব'লে আমরা জানতে পেরেছি। বস্তুত, তাঁর ছাত্রজীবন এখনো শেষ হয়নি।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৮৭

জীবনানন্দ দাশ-এর তিনটি কবিতা

[ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত]

জীবনের মানে ভালো

এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি—পাশে নদী—নদীতে স্টীমার ;
এ-দিকে বাবলার সারি বহু দূর চ'লে গেছে—দূর—আরো দূর—
আজ ভোরে ঝাউবনে মনে হয়েছিল, মন মৃত্যু অমৃত্যুর
সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর।
এখন বিকেল বেলা লাল নীল আলো জেলে ঝাপসা স্টীমার
কোথায় দিগন্তে যায়—কোন যাত্রী সঙ্গে আছে তার,
জানি না কো ; কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত স্নিগ্ধতার
কেমন নরম ছবি ভেসে ওঠে সন্ধ্যার আঁধারে ;
মুছে যায় কুয়াশার পারে দূর ছ' সাতটি নক্ষত্রের পানে :
শঙ্খচিল মাদারের ডালে ব'সে টের পায় শিশিরের ঘ্রাণে।
জীবনের মানে ভালো ; আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে।

কবিতা
আশ্বিন ১৩৬৩

জোনাকি

অসংখ্য সবুজ শিমে শিমলতা পাতা ভ'রে আছে ;
শিম পাড়ি ;—মেয়েটিও আছে কাছে কাছে ;
চার বছরের ছোটো মেয়ে :
কাঁপছিল হিমে ;
আঁচল ফেলেছে ভ'রে শিমে ;
জায়গা নেই যে এক তিল,
তবু সে বাড়ালো হাত—তারপর থেমে গিয়ে নিজ মনে বললে, 'কেমন নীল—
কেমন সুন্দর নীল শিমগুলো—
ঐ শিমগুলো, বাবা, গাছেই থাকুক।'
নদীর মতন টলমল চোখে তাকালো সে—তারপর মুখ
নামিয়ে সে চ'লে গেল—

বেলা শেষ হ'লে
শুনলাম ডুবে গেছে পুকুরের জলে।
অনেক গভীর রাতে দেখা গেলো জোনাকি পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে
শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে ;
আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা : 'বুঝেছ তো কে এই জোনাকি ?'
'চিনেছো ?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

কবিতা
বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

মরালীরা

মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি ; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া ; পক্ষীরাজের মতো কমলা রঙের পাখা ঝাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে ; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাধ
উঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
চ'লে গেছে কলরবে ; দেখেছি সবুজ ঘাস—যত দূর চোখ যেতে পারে :
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে ; দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন আকাঙ্ক্ষার রক্ত অপরাধ

মুছায়ে দিতেছে যেন বারবার—কোন এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কুহকের থেকে এসে
রাঙা রোদ, শালি ধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বার-বার রাখিতেছে ঢেকে
আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু—আমাদের বিস্মিত নীরব
রেখে দেয়—পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের, অশ্রু গেছি রেখে :
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে দেয় সব।

[জীবনানন্দ তাঁর পাণ্ডুলিপিতে তারিখ দিতেন না, কিন্তু তাঁর ভ্রাতা শ্রী অশোকানন্দ দাশ আমাদের জানিয়েছেন যে এই তিনটি কবিতার মধ্যে প্রথম দুটি অন্তত কুড়ি বছর আগেকার, এবং শেষেরটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রচনা। আন্তরিক সাক্ষ্য থেকে তিনটিকেই কবির বরিশাল-বাসের সমকালীন ব'লে মনে হয়।—সম্পাদক]

কালিদাসের মেঘদূত

পূর্বমেঘ

অনুবাদ : **বুদ্ধদেব বসু**

১

জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো ব'লে শাপ দিলেন প্রভু,
মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল ;
বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে,
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

২

যখন আট মাস কাটলো সে-পাহাড়ে কান্তাবিরহিত কামুকের,
সোনার কঙ্কণ স্খলিত হ'য়ে তার শূন্য হ'লো মণিবন্ধ।
দেখলো মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে—
বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে।

৩

কামের উদ্রেক যে করে, সেই মেঘে সহসা দেখে তার সমুখে
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে-মনে বহুখন :
নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন তারাও হ'য়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন।

৪

কেমনে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উন্নত শ্রাবণে
যদি-না জলধরে বাহন ক'রে আমি পাঠাই মঙ্গল-বার্তা ?
যক্ষ অতএব কুড়চি ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণয়ের অর্ঘ্য
স্বাগত-সম্ভাষ জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে।

৫

বাতাস, জল, ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়,
কোথায় ইন্দ্রিয়ে সুপটু, সজ্ঞান প্রাণীর প্রাপণীয়[1] সমাচার !
এ-ভেদ ভুলে গিয়ে ব্যগ্র বিরহী সে জানালে মেঘে তার যাচ্ঞা,
চেতনে-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তা-ই তো কামুকের স্বাভাবিক।

৬

হে মেঘ, জানি আমি ভুবনবিশ্রুত তুমি যে পুষ্কর আবর্তের
বংশে জাত, আর সেবক ইন্দ্রের, ইচ্ছেমতো নাও নানান রূপ।
দৈব প্রতিকূল, বন্ধু বহু দূরে, তোমার কাছে আমি প্রার্থী,
গুণীরে অনুনয় বিফল সেও ভালো, অধমে বর দিলে নিতে নেই।

৭

প্রিয়ার বাহু থেকে কঠিন বিচ্ছেদ কুপিত ধনপতি ঘটালেন,
আমার সমাচার, পয়োদ, নিয়ে যাও, তুমি যে তাপিতের আশ্রয় !
যক্ষপুরে যাবে, অলকা নাম, তার আছেন উদ্যানে শম্ভু,
সৌধশ্রেণী তার চন্দ্রমৌলির ললাট-জ্যোৎস্নায় ধৌত।

৮

যখন আরোহণ করবে বায়ুপথে, পথিকবনিতারা অলক তুলে
গভীর প্রত্যয়ে দেখবে তোমাতেই প্রিয়ের আগমন-আশ্বাস।
আমার মতো নয় যে-জন পরাধীন, বলো তো সে কি পারে দয়িতার
বিরহভারাতুর ব্যথা না-ক'রে দূর, গগনে তুমি যবে উদিত ?

৯

যেমন অনুকূল পবন ধীরে-ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তোমারে,
এবং বাম দিকে গরবী চাতকেরা ঐকতান তোলে মধুময়,
তেমনি নভতলে গর্ভাধানকালে মালার মতো বাঁধা বলাকা[2]
সহজ অভ্যাসে, হে প্রিয়দরশন, করবে আপনাকে[3] সেবায় সুখী।

---

[1]প্রাপণীয় : প্রেরণীয়

[2]বলাকা : স্ত্রীবক, বকপংক্তি। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করে-ছিলেন, কিন্তু তাঁর 'হংস'-সংযোগের ফলে বাংলায় কিছুটা ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে

১০

অবাধ গতি নাও, জলদ, চ'লে যাও, যেখানে একমনা ভ্রাতৃবধূ[৪]
দিবস-গণনায় এখনো বেঁচে আছে—বন্ধু, তুমি তাকে দেখতে পাবে !
ফুলের মতো মৃদু হৃদয় রমণীর, অচিরে বিচ্ছেদে ভেঙে যায়,
কী আর আছে, বলো, আশার বাঁধ বিনা, যা তারে তবু রাখে বাঁচিয়ে।

১১

প্রভাবে হয় যার পৃথিবী উর্বর, এবং ভ'রে ওঠে শিলীন্ধ্রে[৫],
শ্রবণ-রমণীয় তোমার সেই নাদ শুনবে চঞ্চল মরাল-দল,
পাথেয় পদ্মের টুকরো কচি ডাঁটা, মানস[৬]-উদ্দেশে উৎসুক,
আকাশ-পথে, সখা, আকৈলাস ওরা তোমার হবে সহযাত্রী।

১২

ভুবন-পূজনীয় রাঘব-পদরেখা রয়েছে আঁকা যার মেখলায়,
তোমার প্রিয় সখা তুঙ্গ এই গিরি, বিদায় বলো তারে তাহ'লে।
নিত্য কালে-কালে প্রাবৃট দেখা দিলে তোমার সঙ্গ সে ফিরে পায়
নিহিত স্নেহ তার বিরহসঞ্চিত উষ্ণ আঁখিজলে ব্যক্ত।

১৩

প্রথমে শোনো, মেঘ, বলছি আমি সব, যোগ্য পন্থার বিবরণ,
আমার সমাচার শুনবে তার পরে, করবে পান তুমি শ্রবণে।
শ্রান্ত হবে যেই, পা রেখো বিশ্রামে উদার পর্বতশৃঙ্গে,
শীর্ণ যদি হও, তখন কোরো পান নদীর অতি লঘু কোমল জল।

গেছে। আমি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে সাহস পেয়ে 'স্ত্রীবকসমূহ' অর্থে ব্যবহার করলাম।

[৩]যক্ষ মাঝে-মাঝে মেঘকে 'আপনি' বলছে। ৩৮ ও ৫১ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[৪]একমনা ভ্রাতৃবধূ : 'একপত্নীং ভ্রাতৃজায়াম্'। 'একপত্নী' মানে পতিব্রতা, যে-নারীর একটি বই পতি নেই। তার প্রিয়া সাধ্বী, এবং মেঘ তাকে ভ্রাতৃ-বধূরূপে জ্ঞান করবে, এই দুটি কথা একসঙ্গে জানিয়ে যক্ষ তার দূতকে যেন সাবধান ক'রে দিচ্ছে।

[৫]শিলীন্ধ্র : ব্যাঙের ছাতা। বৃষ্টি পড়লে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে ; তার মানে, আগামী হেমন্তে ফসল খুব ভালো হবে। আধুনিক ভারতীয় কবির

১৪

তোমার উৎসাহ দেখবে মুখ তুলে মুগ্ধ অপ্সর-অঙ্গনারা,
চমকে মনে-মনে ভাববে বায়ু বুঝি হরণ ক'রে নিলো অদ্রি !
আর্দ্র বেতসের আবাস এই স্থল ছাড়িয়ে, উত্তর-আকাশে
যাত্রা করো, পথে এড়িয়ে সংঘাত বিপুল দিঙ্‌নাগহস্তের[৭]।

১৫

উঁইয়ের ঢিবি থেকে বেরিয়ে এলো এই ইন্দ্রধনুকের টুকরো[৮],
রত্ন বহুবিধ মেশায় আভা যবে, তেমনি অভিরাম নয়নে ;
তোমার শ্যাম তনু কান্তি পাবে তাতে মোহন ভঙ্গিতে উজ্জ্বল,
ময়ূরপুচ্ছের দীপ্ত প্রসাধনে যেমন গোপবেশী বিষ্ণু।

১৬

তোমাতে নির্ভর কৃষির, তাই সব সরল জনপদবধূরা[৯]
বিলাসবর্জিত আয়ত দৃষ্টিতে করবে সস্নেহে তোমাকে পান।
লাঙল পেয়ে হোক সুরভি মালভূমি, তোমার বর্ষণে ধন্য,
এবার লঘু হ'য়ে খানিক পশ্চিমে, আবার দিক্ নাও উত্তর।

১৭

তোমার ধারাজলে ভীষণ দাবদাহ নিবলো যার, সেই আম্রকূট
সাদরে নেবে টেনে তোমারে বুকে তার, জুড়োবে ভ্রমণের পরিশ্রম ;
বন্ধু যদি চায় শরণ, তবে তার অতীত-উপকার-স্মরণে
ক্ষুদ্রজন সেও থাকে না উদাসীন, কী আর কথা তবে মহতের।

উপেক্ষিত এই উদ্ভিদের প্রতি উল্লেখের জন্য পংক্তিটি বিশেষভাবে আদরণীয় ; কিন্তু, বলা বাহুল্য, আধুনিক ভাষায় 'ব্যাঙের ছাতা' নামটাই কবিতার প্রতি-বন্ধক। [৬]মানস : মানস-সরোবর। রবীন্দ্রনাথের 'হংস যেমন মানস-যাত্রী' স্মর্তব্য। [৭]দিঙ্‌নাগ : দিক্‌হস্তী। হস্ত : হাতির শুঁড়। [৮]উঁইয়ের ঢিবিতে যে-সাপ থাকে, তার নিশ্বাসে রামধনু রচিত হয় ব'লে প্রবাদ আছে।

[৯]জনপদবধূ : গ্রামের মেয়ে। তারা পাড়াগেঁয়ে ব'লে ভ্রূবিলাস শেখেনি, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগরের মেয়েরা এর উল্টো।

১৮

প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক্ক ফল,
বেণীর মতো গাঢ় বর্ণধারী তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে—
দৃশ্য হবে যেন ধরার পয়োধর, অমরমিথুনের ভোগ্য,
গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।

১৯

কুঞ্জে ভ্রমে যার বন্য বধূগণ, ক্ষণেক থেকো সেই শৈলে,
মোচন ক'রে বারি ত্বরান্বিতগতি, নতুন পথে উত্তীর্ণ,
দেখবে নদী এক বিন্ধ্য-অচলের উপলবন্ধুর চরণে—
হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণ রেবা সেই বিসর্পিতা।

২০

যখন বর্ষণ ফুরোবে, পান কোরো তীব্রসৌরভ রেবার জল,
জামের বনে যার আঘাত লাগে, আর বন্য গজমদগন্ধে ভরা।
বিফল হবে বায়ু তোমার পরাভবে, হে মেঘ, যদি হও সারবান,
কেবল পূর্ণতা দেয় যে গৌরব, লঘুতা রিক্তেরই লক্ষণ।

২১

নব কদম্বের সবুজ-পিঙ্গল অর্ধবিকশিত বর্ণ
দেখে যে-মৃগদল, পুলকে নেয় ঘ্রাণ অতীব সুরভিত বনভূমির,
এবং মুকুলিত সদ্য ভুঁইচাঁপা জলার ধারে করে ভক্ষণ—
হে মেঘ, জলকণা-মোচনে উন্মুখ, তোমার হবে তারা দিশারী।

২২

যদিও জানি, তুমি আমার প্রিয় কাজে অচির যাত্রায় উৎসুক,
দেখছি তবু সব কুটজসৌরভে মোদিত পর্বতে কাটবে কাল;
সজল চোখে ক'রে তোমার অর্চনা তুলবে কেকারব ময়ূরগণ,
বিদায়কালে দেবে এগিয়ে কিছু পথ—ত্বরার তবু কোরো চেষ্টা।

২৩

তোমার আগমনে হবে দশার্ণেই যাত্রী হংসের বিশ্রাম,
সেখানে উদ্যানে কেতকী ফুটে উঠে পাণ্ডু ক'রে দেবে সাজানো বেড়া,
গ্রামের পথে-পথে আকুল হবে তরু কাকের বাসা-বাঁধা ঝাপটে,
পক্ক, পরিণত, প্রচুর জম্বুতে শ্যামল হবে বনপ্রান্ত।

২৪

বিদিশা নাম, সারা ভুবনে বিখ্যাত, যখন যাবে রাজধানীতে,
তখনই পাবে, মেঘ, সকল উপচারে কামুকবৃত্তির পূর্ণ ফল।
তটের কলতানে রূপসী রমণীর ভুরুর ভঙ্গিমা যে দেয় এঁকে,
ঊর্মি-চঞ্চল বেত্রবতী সে-ই—করবে পান তার মধুর বারি।

২৫

নীচৈ গিরি সেই নগরে আছে, তার শিখরে বিশ্রামে নামবে,
তোমার মিলনের পুলকে থরে-থরে মুঞ্জরিত হবে কদম্বেরা।
বারাঙ্গনাদের অঙ্গপরিমলে লিপ্ত শিলাগৃহ সে-পর্বতে
রাষ্ট্র ক'রে দেয় রতির উদ্গারে মত্ত যৌবন নাগরদের।

২৬

শ্রান্তি দূর ক'রে যাত্রা কোরো পুন, কিন্তু নদীতীরবর্তী
কাননে জলকণা ছিটিয়ে যেয়ো, মেঘ, তরুণ যূথিকার কোরকে;
কপোলে স্বেদ মুছে ক্লান্ত হ'লো যারা, মলিন হ'লো কানে পদ্মকলি,
আননে ছায়া ফেলে ক্ষণেক দেখে নিয়ো পুষ্পচায়িকা সে-মেয়েদের।

২৭

জেনেছো, উত্তরে তোমার অভিযান; যদি বা পথ হয় বক্র,
ভুলো না দেখে নিতে উজ্জয়িনীপুরে সৌধসমূহের উপরিতল;
সেখানে রূপবতী পৌর নারীদের স্ফুরিত বিদ্যুতে চকিত
বিলোল চাহনিতে না যদি প্রীত হও, হবে যে বঞ্চিত নিদারুণ।

২৮

দেখবে যেতে-যেতে স্খলিত, মনোরম ভঙ্গি নেয় নির্বিন্ধ্যা[১০]
ঢেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা করে তার কাঞ্চীদাম,
ঘূর্ণি নাভি তার দেখায়; তুমি তাই সরস হবে তার সন্নিপাতে[১১],
জানো তো হাবেভাবে আদ্য অনুরাগ জানায় দয়িতেরে প্রমদা।

২৯

বেণীর মতো ক্ষীণ জলের ধারা তার, তোমারই তাতে সৌভাগ্য[১২]
তটজ বৃক্ষের জীর্ণ পাতা ঝ'রে পাণ্ডু ক'রে দিলো বর্ণ ;
প্রবাসী ছিলে তুমি, তাই তো তটিনীর বিরহযাপনের লক্ষণ,
এবারে করো তা-ই, যাতে এ-তন্বীর ত্বরিতে কেটে যায় কৃশতা।

৩০

যাবে অবন্তীর পুরীতে, বৃদ্ধেরা যেখানে উদয়ন-কথাবিদ্[১৩],
বলেছি পূর্বেই ঋদ্ধিশালী সেই নগর বিশালার গৌরব ;
স্বর্গবাসীদের পুণ্য হ'লে ক্ষয় যা থাকে সুকৃতির অবশেষ,
প্রভাবে তারই যেন এনেছে ধরাধামে স্বর্গকণা এক কান্তিমান।

৩১

সেখানে ভোরবেলা শিপ্রাবায়ু বয় ফুল্ল কমলের গন্ধ মেখে,
এবং দূরে দেয় ছড়িয়ে সারসের মধুর, অস্ফুট কাকলি,
অঙ্গে অনুকূল সে-বায়ু, চাটুকার মিলনে উৎসুক প্রিয়ের মতো
হরণ ক'রে নেয় পরশে নায়িকার রতির উত্তরক্লান্তি।

---

[১০]নির্বিন্ধ্যা : মল্লিনাথের মতে যে-নদী বিন্ধ্য থেকে নির্গত হয়েছে। [১১]সন্নিপাত : সংগম। [১২]বিরহাবস্থার প্রসিদ্ধ লক্ষণ, একবেণী ও পাণ্ডু বর্ণ, নির্বিন্ধ্যা নদীতে দেখা যাচ্ছে, অতএব মেঘ ভাগ্যবান। বিরহের পরে নায়কের যেমন সম্ভোগ, তেমনি মেঘের কর্তব্য জলবর্ষণ ; তার দ্বারা নদী-নায়িকার কৃশতা দূর হবে। [১৩]উদয়ন : বৎসদেশের রাজা, 'রত্নাবলী' নাটকের নায়ক।

৩২

কেশের প্রসাধনে ধূপের নিবেদন বেরোয় অবিরল জানালা দিয়ে,
পুষ্ট তাতে, পাবে প্রীতির উপহার, পালিত ময়ূরের নৃত্য ;
শ্রান্তি হবে দূর, ছাখো এ-লক্ষ্মীরে পুষ্পবাসে ভরা ভবনে,
যেখানে আঁকা আছে ললিতা বনিতার অলক্তকরাগচিহ্ন।

৩৩

ত্রিলোকগুরু যিনি দেবাদিদেব, তাঁর পুণ্যধামে যেতে ভুলো না,
নিকটে নদী বয়, স্নিগ্ধ বায়ু তার আন্দোলিত করে উদ্যান,
এবং আনে বাস পদ্মপরাগের, যুবতী-জলকেলি-সৌরভ ;—
প্রভুর কণ্ঠের বর্ণ ধরো, তাই দেখবে সমাদরে প্রমথগণ।

৩৪

হে মেঘ, মহাকাল-দেউলে দৈবাৎ অন্য কালে যাও যদি বা,
তবুও থেকো তুমি, যতক্ষণে রবি না যায় নয়নের আড়ালে ;
শ্লাঘ্য রবে তুমি হবে যে ঢাক, তাঁর সান্ধ্য আরতির লগ্নে ;
মন্দ্র, গম্ভীর, মধুর নিনাদের পুণ্যফল পাবে অবিকল।

৩৫

তখন বেশ্যারা, নাচের তালে যারা তুলছে মেখলায় নিক্কণ,
সলীল ভঙ্গিতে রত্নছায়াময় চামর নেড়ে যারা ক্লান্ত,
তোমার দিকে তারা ছোটাবে চাহনির দীর্ঘ মধুকর-পংক্তি
কেননা নখরের আঘাতে আনে সুখ প্রথম বৃষ্টির বিন্দু।

৩৬

নৃত্য শুরু হ'লে শিবের, তুমি তাঁর বাহুর উত্তাল অরণ্যেরে
ব্যাপ্ত কোরো মণ্ডলের নিয়ে রূপ, সন্ধ্যাকিরণের জবার রাঙা ;
তোমার প্রতিবেশে তৃপ্ত হবে তাঁর আর্দ্র অজিনের বাসনা,[১৪]
তোমার ভক্তিরে শান্ত, অনিমেষ নয়নে দেখবেন ভবানী।

---

[১৪]শিব, গজাসুরবধের পর, মৃত অসুরের রক্তাক্ত চর্ম হাতে তুলে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাণ্ডব নৃত্যের সময় তাঁর আবার সেই ইচ্ছা

৩৭

সেখানে প্রেমিকের ভবনে যোষিতেরা চলেছে পুঞ্জিত আঁধার ঠেলে
বিজন রাজপথে, তামসী যামিনীতে, দৃষ্টিবিরহিত চরণে—
দেখিয়ে নিয়ো পথ স্নিগ্ধ বিদ্যুত নিকষে কনকের কান্তি এঁকে,
কিন্তু বরিষন অথবা গর্জন কোরো না, তারা অতি ভয়াতুর !

৩৮

পত্নী বিদ্যুৎ ক্লান্ত হ'লে পরে ঝলক তুলে-তুলে অনেক বার,
বিরাম নিয়ো কোনো ভবন-বলভীতে, যেখানে কপোতেরা সুপ্ত ;
সূর্য দেখা দিলে আবার বাকি পথে যাত্রা শুরু হোক আপনার—
বন্ধুবিনোদনে অঙ্গীকৃত জন পথে কি দেরি করে কখনো !

৩৯

তখন খণ্ডিতা নারীর আঁখিজল শান্ত ক'রে দেবে প্রণয়ী,
এবং নলিনীর কমল-বদনের অশ্রু মুছে নেবে সূর্য ;
প্রত্যাবর্তন অবাধ হোক তাঁর, ত্বরিতে ছেড়ে দিয়ো সেই পথ ;
বন্ধু, পাবে তাঁর তীব্র বিদ্বেষ রুদ্ধ করো যদি রশ্মি।

৪০

বরং গম্ভীরা নদীর অন্তরে প্রবেশ করো তুমি, হে সুন্দর !
অমল হৃদয়ের মতো সে-জলধারা তোমার ছায়ারূপে ধন্য হোক।
চটুল পুঁটিমাছ লাফিয়ে চলে যেন, ধবল কুমুদের কান্তি—
তেমনি তার চোখে চাহনি, তুমি তায় কোরো না নিষ্ফল ধৈর্য ধ'রে।

৪১

বসন ধ'রে আছে শিথিল হাতে যেন, তেমনি ঝুঁকে আছে বেতের শাখা,
মুক্ত কোরো, সখা, তটনিতম্বেরে সরিয়ে দিয়ে নীল-সলিল-বাস ;
সহজে প্রস্থান হবে না সম্ভব, তুমি যে তার 'পরে লম্বমান,
বিবৃতজঘনার বারেক পেলে স্বাদ কে আর পারে, বলো, ছাড়াতে !

জেগে ওঠে ; মেঘ তা তৃপ্ত করতে পারবে, কেননা তার গায়ের রং কালো, সূর্যাস্তের আভায় তা আরক্ত হয়েছে, এবং সে শিবের উত্তোলিত বাহুর উপরে আনত।

৪২

যখন যাবে দেবগিরিতে, বাতাসের বীজন পাবে মৃদুমন্দ,
সে-বায়ু রমণীয় তোমারই বৃষ্টিতে সদ্যপুলকিত মাটির ঘ্রাণে,
নাসিকারন্ধ্রের মধুর বৃংহিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল,
এবং বুনো ফল ডুমুর পেকে ওঠে শীতল তার সৌজন্যে।

৪৩

সেখানে নিত্যই আছেন কার্তিক, অধীন তাঁর সব ইন্দ্রসেনা,
অগ্নিমুখে ফেলা চন্দ্রমৌলির তীব্র তেজে তাঁর জন্ম,
প্রভাবে তাঁর কাছে সূর্য পরাজিত, হে মেঘ, তুমি তাঁকে অতএব
পুষ্পরূপ নিয়ে আকাশগঙ্গার আর্দ্র ফুলদলে করিয়ো স্নান।

৪৪

মন্দ্র গরজনে শৈল মেখলায় প্রতিধ্বনি তুলে অতঃপর
নাচাবে পাবকির[১৫] শিখীরে, পার্বতী স্খলিত, উজ্জ্বল পালক যার
পুত্রস্নেহবশে যত্নে প'রে নেন কর্ণে, কুবলয়কলির পাশে—
এবং ধবলিত নয়ন-কোণা যার শিবের ললাটের জ্যোৎস্নায়।

৪৫

নিলেন শরবনে জন্ম যে-দেবতা,[১৬] সাঙ্গ হ'লে তাঁর ভজনা,
এড়াতে জলকণা, দেবেন ছেড়ে পথ সবীণ সিদ্ধেরা সকলে ;
যোগ্য সম্মান দিয়ো সে-কীর্তিরে, গেছেন রেখে সেথা রন্তিদেব—
সুরভিসন্তান-নিধনে পরিণত নদীর স্রোতে ক'রে অবতরণ।[১৭]

৪৬

যখন হবে নত জলের 'পরে, তুমি শার্ঙ্গী[১৮] বিষ্ণুর বর্ণচোর,
গগনে গতিশীল যতেক অপ্সর অনেক দূর থেকে দৃষ্টি ফেলে
দেখবে সে-বিপুল নদীরে ক্ষীণতনু, যেন এ-পৃথিবীর কণ্ঠে
একক লহরের মুক্তামালা দোলে, মধ্যমণি তার ইন্দ্রনীল।

---

[১৫]পাবকি : পাবক বা অগ্নি থেকে জাত : কার্তিক। শিববীর্য অগ্নিমুখে পতিত হ'য়ে কার্তিকের জন্ম হয়, এই প্রবাদ আছে। [১৬]মতান্তরে, শিববীর্য

৪৭

সে-নদী পার হ'লে তোমার বিস্ময়ে দেখবে দশপুর-বধূরা
কৌতূহলে আর ভ্রূলতাবিভ্রমে চতুর, চঞ্চল নয়নে—
চক্ষুপক্ষ্মের চটুল উৎক্ষেপে ধবলে শোভা পায় কৃষ্ণ,
কুন্দকুসুমের আন্দোলনে যেন মুগ্ধ মধুকর ধাবমান।

৪৮

ব্রহ্মাবর্তের প্রথিত জনপদ, একদা যেথা কুরুক্ষেত্রে
কমলদলে তুমি যেমন ঢালো জল, তেমনি অবিরল শরজাল
শাণিত বিক্রমে শত রাজন্যের বদনে হেনেছেন অর্জুন—
এবার ছায়ারূপে যাবে সে-যুদ্ধের অস্ত্রচিহ্নিত ভূমিতে।

৪৯

সুহৃদ্ বন্ধুর প্রণয়পরবশে সমরে নিষ্ক্রিয় বলরাম
প্রেয়সী রেবতীর চোখের ছায়া-পড়া মনঃপুত সুরা হেলায় ঠেলে
নিতেন স্বাদ যার, সৌম্য, তুমি সেই সরস্বতী-বারি ভুলো না—
সেবন ক'রে হবে হৃদয়ে নির্মল, বর্ণে শুধু র'বে কৃষ্ণ।

৫০

ঐ যে হিমাচল, নিকটে কনখল, গা বেয়ে নামে তার গঙ্গা,
জহ্নু-দুহিতা সে, সগরবংশের স্বর্গযাত্রায় সিঁড়ির মতো ;
গৌরী তাকে যত ভ্রূকুটি করেছেন তত সে ফেনময় হাস্যে
ঢেউয়ের মুঠি তুলে ধরেছে শম্ভুর ইন্দু-জলা কেশগুচ্ছ।

শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সেখানে কার্তিক কৃত্তিকাগণের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন। [১৭]সুরভি : পুরাণে উক্ত কামধেনু ; তার সন্তান, গোজাতি। দশপুরের রাজা রন্তিদেব একবার গোমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তার গোরক্তধারায় এই নদীর সৃষ্টি হয়েছিলো। [১৮]শার্ঙ্গী : যিনি শৃঙ্গনির্মিত ধনুক ধারণ করেন. কৃষ্ণ।

৫১

আকাশে পশ্চাৎ এলিয়ে দিয়ে তুমি, আকারে যেন এক ঐরাবত
বক্র হ'য়ে যবে করবে পান সেই স্ফটিক-নির্মল অম্বু,
তখনই আপনার ছায়ার প্রচ্ছদ স্রোতের বিস্তারে দেখাবে
অতীব অভিরাম, যেন রে অস্থানে গঙ্গা-যমুনার সংগম।

৫২

সেখানে শিলাতল আসীন মৃগদের নাভির সৌরভে মোদিত,
তুষারে সমাহিত ধবল সেই গিরি গলিত গঙ্গার উৎস ;
শ্রান্ত হে পথিক, শিখরে তুমি তার বিরাম নিলে হবে শোভমান—
ধবল হরবৃষ শৃঙ্গ হেনে যেন উদ্ঘাটিত করে পঙ্ক।

৫৩

বায়ুর ফুৎকারে চমরী[১৯]-রোমরাজি দগ্ধ করে যার ফুলকি,
সে-ঘোর দাবানল, সরলবৃক্ষের স্কন্ধবিক্ষেপে প্রসূত,
দুঃখ দেয় যদি নগাধিরাজে, তুমি বিপুল বারিপাতে দমন কোরো,
কেননা পীড়িতের আর্তিনিবারণে বিত্ত সার্থক মহতের।

৫৪

মুক্ত ক'রে দিলে তাদের গতিপথ, অথচ আক্রোশে বেগবান
লম্ফ দিয়ে উঠে শরভ[২০] দলে-দলে তোমারে করে যদি আক্রমণ,
তখনই উতরোল শিলায় বর্ষণে অঙ্গ ক'রে দিয়ো চূর্ণ—
যত্ন নেয় যেবা অসম্ভবে, তার ঘটবে পরাজয় নিশ্চয়।

---

[১৯]চমর ; স্ত্রী, চমরী, তিব্বতী লোমশ গোরু বা মহিষ, এর লোমে তৈরি পাখার নামই চামর।

[২০]শরভ : বেদোক্ত হিমালয়বাসী প্রাণী, মহামৃগ বা মহাসিংহ, কারো মতে ঊর্ধ্বনেত্র, অষ্টপদযুক্ত, সিংহঘাতী হরিণ। হয়তো বা 'Abominable

৫৫

সেখানে প্রস্তরে ব্যক্ত শিবপদ ভক্তিভরে কোরো প্রদক্ষিণ—
সিদ্ধগণ যারে নিত্য পূজা দেন, এবং পেয়ে যার দর্শন
সকল পাপ থেকে মুক্ত হয় সে-ই, হৃদয়ে যার আছে শ্রদ্ধা,
মরণ-পরপারে প্রমথবৃন্দের পুণ্যপদে পায় আশ্রয়।

৫৬

বাতাসে ভরপুর বেণুর সুমধুর শব্দ ওঠে সেথা অবিরাম,
মিলিত কিন্নরীকণ্ঠে বেজে ওঠে ত্রিপুরবিজয়ের গীতিকা ;
বাজাও তুমি যদি পাষাণ-কন্দরে গভীর ধ্বনিময় পাখোয়াজ,
তবেই পশুপতি পাবেন উপচার পূর্ণ সংগীত-বাদ্য।

৫৭

ক্রৌঞ্চ পর্বতে এতক্ষণে তুমি আসবে এই সব পেরিয়ে,
রন্ধ্র, যার ভৃগুপতির যশে ভরা এবং বলাকার বর্ত্ম,[21]
তুমিও সেই পথে উদীচী-অভিমুখে আলম্বিত হবে তির্যক—
মোহন রূপ যেন শ্যামল পদপাত বলির বধে রত বিষ্ণুর।

৫৮

ঊর্ধ্বে জাগে তার ধবল কৈলাস, সেথায় হবে তুমি অতিথি,
শিথিল সানু যার রাবণ-বিক্রমে, দ্যুলোকবনিতার দর্পণ—
মহান তার চূড়া ব্যাপ্ত করে নভে শুভ্র কুমুদের কান্তি,
নিত্য-জমে-ওঠা অট্টহাসি যেন রাষ্ট্র করেছেন ত্র্যম্বক।

Snowman'-এর প্রবাদের এখানেই সূত্রপাত। [21]কার্তিকের সঙ্গে ভৃগুপতি বা পরশুরামের যখন যুদ্ধ হয়, পরশুরাম তীর ছুঁড়ে ক্রৌঞ্চ পাহাড় ফুটো ক'রে দিয়েছিলেন। এই সুরঙ্গের নাম ক্রৌঞ্চরন্ধ্র ; তা মানস-যাত্রী হংসগণের দ্বারস্বরূপ। মূলে 'হংসদ্বারং' কথাটাই ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৯

সদ্য-কেটে-আনা দ্বিরদ-দন্তের গৌর আভা যার তনুতে
তুমি সে-গিরিতটে যখন দেখা দেবে দলিত-অঞ্জন-বর্ণ,
শোভন হবে যেন শ্যামল বাস, বিন্যস্ত বলরাম স্কন্ধে,
বন্ধু, আমি জানি তখন হবে তুমি নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য।

৬০

রম্য সে-গিরিতে গৌরী সেইক্ষণে করেন যদি পদচারণা,
এবং মহাদেব ধরেন পাণি তাঁর, ভুজগ-কঙ্কণ-মুক্ত—
এগিয়ে যেয়ো তুমি, কিন্তু হৃদয়ের রুদ্ধ রেখো সব বৃষ্টিবেগ,
বরং ধাপে-ধাপে এলিয়ে দিয়ে তনু, সোপান হ'য়ে যেয়ো মণিতটের।

৬১

সেখানে নিশ্চয়ই স্বর্গযুবতীরা বলয়কুলিশের আঘাতে
উদ্গীরিত জলে রচনা ক'রে নেবে তোমাতে স্নানধারাযন্ত্র ;
গ্রীষ্মে খরতাপে তোমাকে পেয়ে তারা না যদি দিতে চায় মুক্তি,
রূঢ় গরজনে[22] দেখিয়ো ভয় সেই আমোদে মাতোয়ারা মেয়েদের।

৬২

সোনার অম্বুজ ফোটে যে-সরোবরে, সে-বারি পান কোরো কখনো,
ঐরাবতে দিয়ো কখনো সুখ, তার বদন ঢেকে দিয়ে সহসা,
কাঁপিয়ো বায়ুবেগে কল্পপাদপের সূক্ষ্ম-অংশুক-পল্লব—
হে মেঘ, এইমতো বিবিধ বিনোদনে কোরো সে-পর্বতে উপভোগ।

---

[22]'রূঢ় দীপের আলোক লাগিলো'-র অনুসরণে 'রূঢ়' এখানে তিন মাত্রায় বসিয়েছি।

৬৩

অলকা দেখা যায় অঙ্কে এলায়িত, প্রণয়ী যেন তার কৈলাস,
স্রস্ত অঞ্চলে গঙ্গা নেমে আসে, ভূষিত উন্নত বিমানে,[২০]
মুক্তাজাল যথা নারীর কেশে, তার শিখরে মেঘভার তেমতি—
স্বৈরী, তুমি সেই পুরীরে পুনরায় চিনতে পারবে না ভেবো না।

পূর্বমেঘ সমাপ্ত

[২০]বিমান : সাত-তলা বাড়ি।

কবিতা
বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ : দু-জন অসবর্ণ কবি

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন * শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এবং এই সংকলনে সংখ্যা এবং বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই সবচেয়ে প্রধান। উদ্দেশ্যে এবং চরিত্রে এই সংকলনকর্ম যদি Oxford Book of English Verseএর তুল্য হত তাহলে এই প্রাধান্য খুবই সংগত হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে সংকলনটি নেহাৎই আধুনিক, বাংলা কবিতার যে-কালটি এতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে তা আধুনিক কাল। স্পষ্টতই, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মতে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিক, এবং আধুনিক বাংলা কাব্যের চূড়াও তাঁর কবিতা স্পর্শ ক'রে গেছে।

এই মতে অনেকেই সায় দেবেন, সন্দেহ নেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের অগ্রগণ্য, রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম নতুন রবীন্দ্রনাথ নিজে, এ-জাতীয় উক্তি আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় স্বতঃসিদ্ধ ব'লে গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো স্বতঃসিদ্ধ থাকা উচিত নয়, এ-জাতীয় সকল সিদ্ধান্তেরই যেহেতু নিয়মিত পর্যালোচনা হিতকারী, এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার বিচার আশা করি হঠকারিতা হবে না।

আমরা যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করি, শুনেছি তখন থেকে বাংলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। 'প্রগতি' ও 'কল্লোলে'র পাতায় রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে এবং 'রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত' হবার চেষ্টা ক'রে তার আরম্ভ। আজ পঁচিশ বছর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনটি হাতে নিয়ে তাই খটকা লাগে। এর সম্পাদক একদা সেই বিদ্রোহের নান্দীপাঠ করেছিলেন। আজ তাহলে হয় বিদ্রোহের অবসান হয়েছে, সেদিনের তরুণ কবিরা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যে যে নতুন সুর তাঁরা

* আধুনিক বাংলা কবিতা। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬২। সাড়ে-পাঁচ টাকা।

বাজাবার চেষ্টা করেছিলেন তা আসলে মূল সুরেরই উদারা তারা। অথবা এই বিদ্রোহ একদিন রবীন্দ্রনাথকে দলে টানতে পেরেছিল।

আমরা যদি রবীন্দ্র-রচনার অবিভেদ স্বীকার করি, যদি মনে করি জীবন-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু অবিচল ঋজুতার পরিচয় দিয়েছেন, তাহলে তাঁকে এই সংকলনে স্থান দেয়া মানে আধুনিকতার চরিত্রকে অস্বীকার করা। কেননা, জীবনদৃষ্টির পার্থক্যই আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনকে সে-কালে অনিবার্য ক'রে তুলেছিল। অপর পক্ষে, যদি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মত মেনে নিই যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেন এবং তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ান তাহলে ধ'রে নিতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে এই সময় থেকে নতুন ধারায় কবিতা লিখতে শুরু করেন।

এই দ্বিতীয় মতটির বিচার ক'রে দেখা যাক। 'লিপিকা' ও তৎপরবর্তী গ্রন্থে যে রবীন্দ্রনাথের রচনা মোড় নিয়েছে তা যে-কোনো পাঠকেরই নজরে পড়বে; এই সব রচনায় আধুনিকতার অনেক গৌণ লক্ষণ উপস্থিত: কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা এখানে উপস্থিত হয়েছে, ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তুকে কাব্যের উপাদানের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, গদ্য রীতির আসন কায়েম হয়েছে। বর্তমান কালের জীবনও এই কাব্যে অধিকতর প্রতিফলিত। কিন্তু এই সব লক্ষণকে গৌণ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। যে-সব সামান্য লক্ষণে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের অধিকাংশ কবি সমকালীন, তা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। রবীন্দ্র-রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু একজায়গায় বলেছেন তাঁর কবিতায় উৎস বিশ্ববিধানে আস্থাবান এক চিত্তবৃত্তি। অথচ এই চিত্তবৃত্তির অভাবই আধুনিক বাংলা কবিতার মূল লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' (ভগবান, তুমি যুগে যুগে) কবিতাটি প্রায়ই তাঁর আধুনিকতার নজির হিসেবে দাখিল করা হয়ে থাকে। এই কবিতাটিতে বিশ্ববিধানের শুভময়তায় প্রশ্ন এবং কবিচিত্তে সংশয় কিছু প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় এই কবিতাটির পাশে যদি আমরা জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ' কবিতাটি দাঁড় করাই, তাহলে তৎক্ষণাৎ বোঝা যাবে 'প্রশ্ন' কবিতাটির দুর্বলতা কোথায়। 'অদ্ভুত আঁধারে' যেখানে কবির গভীর হতাশা ও বিক্ষোভ ধ্বনিত হচ্ছে, সেখানে 'প্রশ্ন' ঈশ্বরের সঙ্গে কেবল মান-

অভিমানের খেলা। জীবনানন্দের চোখে জল নেই, কেননা তার স্তর বহুপূর্বেই তাঁর চেতনা অতিক্রম ক'রে এসেছে। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'অশ্রুজল' কেবল কিঞ্চিৎ সান্ত্বনার অপেক্ষা রাখে; পাঠকের মনে সন্দেহ হয়, বুঝি বা কবির বিক্ষোভমোচন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মুখাপেক্ষী মাত্র।

'বাঁশি' কবিতাটিও ('কিনু গোয়ালার গলি') আমাদের সহায়তা করবে। দীন, সাধারণ জীবন থেকে সেখানে অনেকগুলি রূপকল্প উপস্থিত করা হয়েছে। এগুলি বাদ দিলে অবশ্যি কবিতাটি পুরোপুরি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু রূপকল্পগুলি কী-প্রকৃতির দেখা যাক:

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জ'মে ওঠে প'চে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।

এখানে যে ফর্দ উপস্থিত করা হয়েছে তা কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, গলির নোংরামি প্রমাণ করা ছাড়া তার অন্য কোনো ব্যঞ্জনা নেই। এর সঙ্গে আমরা যদি জীবনানন্দের কয়েকটি পংক্তি মিলিয়ে পড়ি:

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে;
চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে। ('রাত্রি')

তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করব চীনেবাদামের একটিমাত্র উল্লেখে জীবনানন্দ কত সুষ্ঠুভাবে আমাদের নগর-জীবনের বিশুষ্ক সত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে চীনেবাদামে বিধৃত হয়েছে নাগরিক আত্মা। এলিয়টের Gerontion কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথের মতো একটি ফর্দ আছে।

> The goat coughs at night in the field overhead,
> Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.

কিন্তু এই ফর্দটির প্রত্যেকটি রূপচিত্র এক-একটি প্রতীক। ছাগলের কাশি, প্রস্তরখণ্ড, শৈবাল, পাথুরে আগাছা, লোহখণ্ড, বিষ্ঠা—এর প্রত্যেকটি দেউলিয়া সভ্যতার স্বরূপ পরতে-পরতে খুলে দেখাচ্ছে।

এ-কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কখনো প্রতীক হয়ে উঠতে পারে না, আমি কেবল এই কথা বলতে চাই যে আধুনিক ভাব বা রূপচিত্র কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্বস্তি পাননি। আধুনিক কালের যে-রূপকল্প তিনি ব্যবহার করতে গেছেন তাতে এসেছে আড়ষ্টতার আভাস। যেমন 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ' কোনো আধুনিক কবির পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না, তেমনই আধুনিকতার সব চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহিরঙ্গের শোভাই থেকে গেছে, কখনো অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে নি।

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হয়ে উঠতে পারতেন না, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁদের ঋণ অমেয়, একথা সত্য। কিন্তু এটা স্বীকার করা আর রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকদের অগ্রগণ্য বলার ভেতর অনেক তফাৎ আছে। কবি আধুনিক কোন গুণে হন? ভাষাব্যবহারে কিছুটা, প্রতীক উপমা উৎপেক্ষায় কিছুটা, কিছুটা—নিজের অজান্তে—কালধর্মিতাকে বরণ ক'রে। কিন্তু এ-সবই বাহ্য। আধুনিকতার প্রাণ যে-মনোভঙ্গি, যার উদ্ভব বিশেষ ক'রেই বর্তমানের উপলব্ধি ও চেতনা থেকে, তার যদি অভাব কারো কাব্যে ঘটে তাহলে তাঁকে পংক্তি থেকে বাদ দিতে হয়।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কালের কবিদের তফাৎ মূলত দুটি। সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যধারার পরিপূর্ণ ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ আবাল্য অনুপ্রাণিত। তবু,

বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য থেকে বর্জনও তিনি কম করেননি। প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যে উদার সাযুজ্য, পার্থিব সর্ববিষয়ে নির্মল আনন্দ, এবং সর্বোপরি জীবনের শুভময়তা সম্পর্কে যে নিশ্চিত প্রত্যয় তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় সর্বদা প্রতিফলিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির সর্বাঙ্গ সত্যতা, বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর দেহাত্মপ্রত্যয় এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা নেই। এজন্য কোনো আক্ষেপ বা অনুযোগ না-ক'রেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি জিনিশকে চিরকাল পরিহার ক'রে এসেছেন। অপরপক্ষে 'কল্লোল'-যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধি অতিক্রম ক'রে যৌবনে উপনীত হলেও, বিশ্বসাহিত্য বিশেষভাবে আস্বাদন করেছিলেন। সমসাময়িক ইংরেজি বা ইওরোপীয় সাহিত্য কেবল যে কালধর্মিতায় প্রবল ছিল তাই নয়, তার ভেতর বাস্তবতার সহজ প্রকাশও ছিল বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ যে সর্বতোমুখী নন, তাঁর কাব্যে যে জীবনের সমগ্ররূপটি ধরা পড়ে নি এই চেতনায় তখনকার কবিকিশোরেরা বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অন্বেষণ ক'রে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অভাবপূরণ করার চেষ্টা করেননি, নিজেদের একাত্ম করেছিলেন ইওরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে। তার ফল শুভ কি অশুভ হয়েছিল সেটা আপাতত বিচার্য নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর একটি বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলনের হেতু কেবল এই নয়। রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা ইতিপূর্বে কারো চোখে পড়ে নি, সেজন্য কোনো অতৃপ্তি আমাদের পিতা বা জ্যেষ্ঠতাতদের কখনো ছিল বলে জানি না। রবীন্দ্রনাথ যে-কারণে আর অর্বাচীনদের তুষ্ট করতে পারলেন না তার কারণ বাংলা দেশের মানসিক ও সামাজিক হাওয়া-বদল। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য মহাদেশে এক শূন্যতা, এক অভাববোধের সৃষ্টি করে। শুভবস্তুর নিশ্চয়তায় পৃথিবীর লোকে আস্থা হারাল, যে-বিশ্বাস, যে-সহজ আত্মসমর্পণ ভিক্টরীয় চিত্তবৃত্তিকে ইংলণ্ডে কায়েম করেছিল তা যেন হঠাৎ আহত হল। ভিক্টোরীয় মনোভঙ্গির প্রবঞ্চনা ও তার অসারতা মহাযুদ্ধ এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করল যে তার পুনরুজ্জীবন ইওরোপে আর ঘটল না। আমাদের দেশে কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ততটা দেখা যায় নি, কেননা আমরা তখন রাজনৈতিক সংগ্রামে অনন্যমন। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন

খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু মনে রাখা দরকার, তখনো এর মধ্যে কোনো ব্যর্থতাবোধ আসে নি। বরং এমন একটি স্বদেশী উন্মাদনা দেশময় তখন ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাতেই আমরা জীবনের অনেক দীনতা ও গ্লানি ভুলে থাকতে পেরেছিলাম। কিন্তু তৃতীয় দশকের শেষভাগে পৃথিবী জুড়ে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল। বাণিজ্যে অতিমন্দা দেখা দেবার ফলে সর্বত্র বেকার সমস্যা দারুণ হয়ে উঠল, বিশ্বের মধ্যবিত্ত সমাজ আশঙ্কা করল তার বিলোপের সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীন ও শুভ বলে মেনে নিয়েছিল, এত-দিনে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করল। মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের দেশে একদিকে যেমন হাহাকার পড়ল, অন্যদিকে তেমনি এলো গভীর অনিশ্চয়তা, বর্তমান অতএব অতীত ও ভবিষ্যতে অনাস্থা, এবং হতাশা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতারণায় যে স্বাভাবিক ক্রোধ মানুষের মনে সেই সময়ে জেগেছিল, তা আমাদের দেশে প্রবল হয়ে ওঠে নি, কেননা আমাদের সকল ক্রোধের পাত্র ছিল তখন বিদেশী শাসক। স্মরণ থাকতে পারে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই কয়েক বছরই সবচেয়ে রক্তাক্ত ও গ্লানিময়।

রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচনা 'লিপিকা' পড়লে দেখা যাবে তাতে এক বেদনার আভাস আছে, ছোটোখাটো নানা দুঃখের উল্লেখ আছে। কিন্তু হৃদয়ের যে পরিপূর্ণতা থেকে বেদনা আসে, চিত্তের যে বিস্তার সর্বজীবে সহানুভূতি আনে তা সেই সময়ে দু-একজন মহাপুরুষে দেখা গেলেও দেশে সমগ্রভাবে একান্তই অনুপস্থিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশের দুঃখ বিষয়ে গভীর-ভাবে সচেতন ছিলেন ; কিন্তু ভিন্ন ঐতিহ্যে মানুষ তিনি, কী ক'রে সমসাময়িক হতাশার অন্তস্থল স্পর্শ করবেন ? দেশে তখন এমনই দুর্যোগ যে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আস্থাহীন বঙ্গযুবকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথে কোনো আস্থা বা চিত্তশুদ্ধি লাভ করা অসম্ভব ছিল। সমগ্রভাবে দেশের জীবন রবীন্দ্রনাথে প্রতিফলিত হয় নি, বিশ্ব জুড়ে সভ্যতার যে মড়ক তখন লেগেছিল তার আভাস সর্বশেষ 'সভ্যতার সংকটে' ছাড়া তার লেখায় নেই। তার দুর্মর আশা, ঔপনিষদিক শুভবোধ তাঁকে ঘিরে অন্য একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি

করেছিল, যা উজ্জ্বল বা ধ্রুব হলেও বর্তমান জীবন থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলন এই পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য মনে হয়। সাহিত্যের সঙ্গে, শেষ বিচারে, বর্তমানের, প্রত্যক্ষ সত্যের একটি অবিচ্ছেদ সম্পর্ক আছে ; সুতরাং কালের প্রয়োজনে সাহিত্যেও হাওয়া-বদল অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম ইঙ্গিত আমরা পাই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের রচনায়। তবু এঁরা যে কেউই আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াতে পারেন নি, তার কারণ হয়ত এঁদের রচনায় একাগ্রতার অভাব। এঁরা চেয়েছিলেন নতুনকে পুরোনোর পোষাকে সাজিয়ে পাঠকদের কাছে পেশ করতে, ভাষা ও কাব্যরীতির প্রথা থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন নি। ফলত এঁদের কাব্যে আধুনিকতার হাওয়া এসে লাগলেও সেটা কখনো কাব্যের প্রাণ হয়ে ওঠে নি। নজরুল ইসলামে প্রাণশক্তি ছিল দুর্দম, তখনকার দিনের ব্যর্থতা-বোধ তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতায় কিছুকাল বিকল্প-মুক্তিও খুঁজে পেয়েছিল ; কিন্তু নজরুলের রচনা কালকে মাতালেও মনে পৌঁছয় না। তাই কিছুকালের খ্যাতি উপভোগ ক'রে সেই কবিকৃতি আজ বুদ্বুদ হয়ে গেছে। অপর পক্ষে যতীন্দ্র-নাথের দুঃখবাদ রবীন্দ্রনাথের পর নতুন হলেও তা যেন ভঙ্গি ছাড়িয়ে অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারে নি। পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে এই দুঃখবাদের মূলে হয়তো কোনো আপাত-সহজ অগভীর জীবনদর্শন রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতা-পাঠান্তে কোনো-কোনো পাঠক তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্ন মত হলেও তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।

মোহিতলালের রচনায় সে-সময় যে-জিনিশটি সকলের চোখে পড়েছিল সমালোচকেরা তার নাম দিয়েছেন 'বলিষ্ঠ ভোগবাদ'। রবীন্দ্রনাথে এর অভাব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় না এই অভাব বাঙালি পাঠক তখন প্রবলভাবে অনুভব করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও বৈষ্ণবপদাবলীতে যদিও ভোগের বন্দনাগান কবিরা চূড়ান্তভাবে ক'রে গেছেন, তবু মোহিতলালের কাব্য-রচনার সময় আমাদের জীবনে ভোগের বড়ো সুযোগ বা লিপ্সা ছিল না। এক-দিকে রবীন্দ্রনাথের সাত্ত্বিক প্রভাব, অন্যদিকে রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা

ও সমাজের সংকট—এই দুয়ের ফলে বাঙালি পাঠক ঠিক মোহিতলালের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মোহিতলাল তাই কিছুটা খাপছাড়া ভাবে বাংলা কবিতায় এলেন এবং স্থায়ী কোনো প্রভাব রেখে যেতে পারলেন না। বিশুদ্ধ ভোগে আমাদের কোনোদিনই অভিরুচি ছিল না, আমরা হয় তাকে গার্হস্থ্যে মসৃণ করেছি, নয়তো অনুরাগে সম্পৃক্ত ক'রে তাকে শুদ্ধ করেছি। ভাবী বধূকে চোখে না-দেখেই তার সম্পর্কে প্রাক্‌বিবাহ মিলনোৎ-কণ্ঠা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কবিতায় তার প্রকাশ আমাদের কাছে নিতান্ত অশোভন লাগে। কবিতায় মোহিতলাল এই মিলনোৎকণ্ঠাকে যত সুন্দর সাজই পরান, পাঠকের কাছে তা নেহাৎই মেসে-হোটেলে থাকা অবিবাহিত যুবকের কামকল্পনা মনে হয়।*

৩

বাংলা নিসর্গকবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আসনটি জীবনানন্দ দাশের, এ-কথা নিশ্চিত। কিন্তু এই দুই কবির নিসর্গকবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে আমরা প্রায় বিপরীত আস্বাদ লাভ করি। প্রকৃতি উভয়েরই কাব্যচেতনার অবলম্বন, জীবনকে দুই কবিই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কী সেই জীবন, এঁদের চেতনায় যা প্রকৃতিতে আশ্রয় পেয়েছে?

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সহজেই বলা যায়, শুভময় জীবনের ধারণা তাঁর চোখে দেখা প্রকৃতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতিতে তিনি আনন্দ ঐশ্বর্য বিস্ময় যা-ই দেখেছেন, সর্বদাই মানুষের জীবনে তার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এমনকি প্রকৃতিতে যে-দুঃখ আছে তা যে মানুষের মনে মহত্তর আনন্দের চেতনা এনে দেবার জন্যই—এই প্রতীতি কখনো রবীন্দ্রনাথে আশা, ক্ষোভ, অথবা গ্লানি এনে দেয় নি। হয়তো এর জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতায় হেমন্তঋতুর তেমন সমাদর নেই। রিক্ততার ঋতু হেমন্ত; প্রকৃতি এবং মানুষের মনে কুয়াশা, অবসাদ আর মৃত্যুর ধূসর ছায়াফেলা এই ঋতুকে তাই অনিচ্ছুক খাজনা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কর্তব্য শেষ করেছেন। যে-হেমন্ত

* আমার এই মন্তব্যে মোহিতলালের অনুরাগী পাঠক যদি ক্ষিপ্ত হন তাঁকে অনুরোধ করব 'মিলনোৎকণ্ঠা' কবিতাটি আবার প'ড়ে দেখতে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতে সসংকোচে একটুখানি জায়গা ক'রে নিয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে কিন্তু তারই অবাধ পদচারণা। হেমন্তেও যে এত রূপ ছিল তা আমরা জীবনানন্দেই প্রথম আবিষ্কার করলাম। দৃষ্টি এবং স্পর্শের যে-জগৎ জীবনানন্দ আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন তাতেই নিশ্বাস ফেলে আমরা যেন স্বস্তি পাই। রবীন্দ্রনাথের পাঁচ ঋতু আমাদের মুগ্ধ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনানন্দের হেমন্তে এসে হঠাৎ আমরা উপলব্ধি করি আসলে আমরা এতকাল হেমন্তেই জীবনযাপন করেছি, হয়তো হেমন্তেই লীন হব। হেমন্তের রিক্ততায় যেন আমাদের সমাজসভ্যতার অন্তর্জলি, তার সেই নাভিশ্বাস যেন প্রকৃতিতে কুয়াশার পর্দা ফেলেছে। হেমন্তের বহু ঐশ্বর্য, বহু রূপ জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় আছে তবু তার সেই চেহারাই আমাদের মনে লেগে থাকে যার সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রেরা হিম হ'য়ে ঝরে যায়, যার বাতাসে বাসি পাতা ভূতের মতো উড়ে আসে, যার গাছে অসুস্থ বাসি পাতা দুলে খ'সে পড়ে।

হেমন্তের বর্ণনায় যেমন, জীবনদৃষ্টিতেও তেমনি জীবনানন্দের কবিচেতনার দ্বিমুখিতা লক্ষ্যণীয়। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে আস্তিক বা নাস্তিক সহজেই প্রমাণ করা যায়। জীবনানন্দকে প্রেমিক, আস্তিক, এবং সত্যবাদী প্রমাণ ক'রে ইতিমধ্যে একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আস্তিকতার সিদ্ধান্তে আসা সহজ হলেও জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেটি বিপজ্জনক। এ-কথা সত্য যে কোনো কবির অন্তিম রচনায় প্রেমপ্রীতিকরুণায় স্নিগ্ধ শিল্পচেতনার সন্ধান পেলে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হই। ইংরেজি সাহিত্যে যে-সব কবির মনে দ্বিধা ছিল, যাঁরা একদা সংশয়ের কবিতা লিখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই পণ্ডিতেরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে জীবনের সায়াহ্নে তাঁদের সব দ্বন্দ্বের বা সন্দেহের নিরসন হয়েছিল। মনে হয় চরম সিদ্ধান্ত এবং আস্থার প্রতি আমাদের জন্মান্তরের কোনো আকর্ষণ আছে, তাই কবিদের শেষ বিচারে তাঁদের আস্তিক প্রমাণ করতে পারলে আমরা খুশি হই।

জীবনানন্দ সম্পর্কে আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো আস্তিকতার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় আমরা প্রথম যে-বিস্ময়ের

আভাস পেয়েছিলাম তা শেষ পর্যন্ত উপস্থিত আছে। কবিতার বিষয়বস্তু বদলেছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তের ঋজুতা কখনো কোথাও আসে নি। রচনাকালের দিক থেকে সম্ভবত তাঁর শেষ কবিতা যে-তিনটি ('রক্তনদীর তীরে কালো পৃথিবীর', 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ'), তাতে অবশ্যই অমৃতের আভাস আছে ; শকুন আর শেয়ালের রাজত্ব এই পৃথিবীতেও হরিতের অক্ষয় গুঞ্জরণ অথবা অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এই মন্ত্রগ্রহণ করতে হ'লে, জীবনানন্দ বলছেন, নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়কে বাঞ্ছা করতে হবে। মানুষের বুদ্ধি, চেষ্টা, সংকল্প কোনো কাজে লাগবে না, এমন কি তার ইতিহাসচেতনাও তাকে কোন ধ্রুবতার প্রতিশ্রুতি দেবে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মহাকাল, তার প্রতি মুহূর্তে নশ্বরতা ; মৃত্যুর ধূসর ছায়াই মানুষের চেতনায় চিরকাল অবিনাশী সত্য হয়ে আছে।

কিন্তু জীবনানন্দের প্রতীতি যদি স্বীকার ক'রে নিতে হয়, তাহলে কী অর্থ এই আত্মসমর্পণের চেষ্টায়, কি সান্ত্বনা ভবিষ্যতে আনন্দের আশ্বাসে ? যদি সাহস সংকল্প প্রেমকে বিসর্জন দিতে হয়, আমাদের বুদ্ধি যদি কোনোকালে শুভ হয়ে না উঠতে পারে, তাহলে কোন ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করব ?

জীবনানন্দের অন্তিম রচনা প'ড়ে তাই আমি প্রতারক সান্ত্বনায় তৃপ্ত হতে পারি না। অমৃতের যে-মূল্য জীবনানন্দ ধার্য করেছেন ('জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে', 'নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়/হরিতের কাছে এসে শিখবে অক্ষয় গুঞ্জরণ') মানুষ তা কোনোদিন দিতে পারবে না, আর তা দিতে না-পারলে যদি সেই মাশুল আদায় করতে শকুন আর শেয়ালের পেয়াদারা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তাহলে আস্তিকতার কী অর্থ হয় ?

৪

জীবনানন্দকে বাংলার নির্জনতম কবি একাধিকজনে বলেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিদ্রোহের, অতৃপ্তির, ব্যক্তির অহমিকার যে সুরটি বেজেছিল, জীবনানন্দ আপাতত তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে তিনি

একান্তভাবেই বাংলাদেশের কবি, ভাষা বা চিত্ররূপে কোথাও বিদেশী গন্ধ লাগে নি।* অনেকের মনে এইসব কারণে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাহলে কী অর্থে আধুনিক।

বাংলা নিসর্গকাব্যের যেটি মূল ধারা তা রবীন্দ্রনাথে বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বাঙালি কবিরা বরাবর অবিনশ্বরতার স্পর্শ পেয়েছেন। প্রকৃতি ঈশ্বরেরই আলেখ্য এবং প্রকৃতিরাজ্যে ঈশ্বরের চরম ন্যায়বিধান মানুষকে অহরহ মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করছে—এই কথা বাঙালি কবিরা বিভিন্নভাবে ব'লে গেছেন। ঈশ্বর-সাযুজ্যেই প্রকৃতির এই কল্যাণীরূপ, তার ফলেই মানবজীবনে তার অন্তহীন আশীর্বাদ—এই বোধ বাঙালি কবিদের নিসর্গকবিতাকে সমপর্যায়ে ফেলেছে। সচেতন মন দিয়ে, মানুষের বুদ্ধি ও যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানসহকারে প্রকৃতিকে যাচাই করার কথা কদাপি কেউ ভাবেন নি। মানুষের ইতিহাসচেতনা, যুক্তিপক্ষপাতী মন সমাজে প্রযুক্ত হয়েছে, মানবসভ্যতার ধারানির্ণয়ে সহায়তা করেছে। কিন্তু এই মন প্রকৃতিতে নিয়োজিত হল জীবনানন্দের কবিতায় প্রথম। বুদ্ধির বিচারে, ইতিহাস-চেতনার প্রয়োগে জীবনানন্দ ফলত অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁর প্রকৃতি-প্রেম অন্য কারো তুলনায় একরতি কম না হলেও, বুদ্ধির আত্মসমর্পণজনিত প্রকৃতিবিলাস তাঁর কাব্যে কোথাও নেই। প্রকৃতিকে অবিনাশী জানলেও জীবনানন্দ তার প্রতি মুহূর্তটিতে অন্তহীন প্রাণের স্ফুলিঙ্গকে নিভে যেতে দেখেছেন। তাই এই বিচিত্র ঐশ্বর্যময় প্রকৃতিতেও প্রেম নশ্বর, কাল বিনাশী এবং আকাশ আর প্রান্তর চিরহেমন্তে বিলীন।

জীবনানন্দের কবিতায় এই চেতনা বা সিদ্ধান্ত যথার্থরূপে বিদ্রোহী, কেননা বাংলা নিসর্গকাব্যের ধারাকে বর্জন ক'রে এখানে একটি নতুন পথ বেছে নেয়া হয়েছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র অন্যান্য কবিরা রবীন্দ্রনাথকে চোখের সামনে রেখে তাঁকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, অথচ জীবনানন্দ সে-রকম

*এ-প্রসঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবিকুল, বিশেষ ক'রে কীটসের কথা আমি ভুলি নি। কিন্তু জীবনানন্দ এঁদের এমনভাবে পরিপাক করেছিলেন যে ইংরেজি-না-পড়া পাঠক মুহূর্তের জন্যেও অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করবেন না। কুন্তিলতা যে প্রথম শ্রেণীর কবির রচনায় স্বকীয়তার মর্যাদা পায় জীবনানন্দ তার একাধিক প্রমাণ রেখে গেছেন।

কোনো চেষ্টা না-ক'রেই বাংলা কবিতার চরিত্র বদলে দিয়েছেন। আজকাল কেউ-কেউ জীবনানন্দের দৃষ্টিতে ছাড়া প্রকৃতিকে ভাবতেই পারেন না।

৫

জীবনানন্দের কবিতায় একটি সজ্ঞান মনের ক্রিয়া, ইতিহাসচেতনা-দ্বারা বিচারের একটি চেষ্টা আমরা বরাবর লক্ষ্য করি। অথচ এই কবি শেষে তাঁর বুদ্ধি সমর্পণ করেছেন নির্জ্ঞানের কাছে, সাহস সংকল্প প্রেম আহুতি দিচ্ছেন শান্তির আকাঙ্ক্ষায়। জীবনানন্দে যদি কোনো আস্তিকতা থেকে থাকে তবে তা রিক্তের, পরিক্রমাক্লান্ত পথিকের আত্মসমর্পণের। হয়ত নশ্বরতার যে-আবহমান লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যুগ-যুগান্তের যে-ক্লান্তি তাঁর উত্তরাধিকার ব'লে জেনেছিলেন; সভ্যতার নগর-গ্রামের যে-মড়ক তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল—তার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের বা যুক্তির কোনো মিল তিনি খুঁজে পান নি। আমাদের বুদ্ধি কেবল বিপথে চালিত করে, জ্ঞান এবং পর্যালোচনা ক্লান্তি ও নেতি ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। ঘড়ির দুটি ছোটো কালো হাত আমাদের যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে নিয়ে যেতে চায়, আমরা সহজ বুদ্ধিতে সেদিকে কখনো যাবো না, তবু পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় 'কী গভীর সহজ অভ্যাসে'। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি বৃথা, জ্ঞান বৃথা, যুগান্তের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বৃথা।

৬

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা 'কবিতা'য় (পৌষ ১৩৬১) শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতাটি জীবনানন্দের প্রধান কবিকর্মের অন্যতম এবং এতে এমন একটি মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, যা উপলব্ধি করতে পারলে জীবনানন্দ সম্পর্কে আমাদের মনস্থির করার সহায়তা হতে পারে।

পরবর্তী কালের অনেক কবিতার মতো এই কবিতাটিতে কবি কাহিনী বা তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। কাহিনীর ফাঁকে-ফাঁকে তাঁর প্রশ্ন আছে, সমাপ্তিতে মন্তব্য আছে। কিন্তু এই প্রশ্ন বা মন্তব্য কবির নিজের নয়, আত্মঘাতীর প্রতি জীবিতের অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসামাত্র।

এই কাহিনীতে আত্মহত্যার কোন সহজগ্রাহ্য কারণ নেই। মৃত্যুর, ঘুমের যে-সাধ অতৃপ্ত জীবন থেকে জাগে তা এক্ষেত্রে সক্রিয় নয়। প্রেম, আশা গৃহস্থালি, এমনকি বাৎসল্য রসেরও কোনো ত্রুটি তার জীবনে ছিল না; তবু কোন ভূত এই ব্যক্তি দেখল, উটের গ্রীবার মতো কোন নিস্তব্ধতা জানালার ধার থেকে তার কানে সর্বনাশের মন্ত্র দিয়ে গেল:

কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—

কিন্তু কেন এই মন্ত্রণা? ক্লান্তি, জানার বেদনার প্রত্যহের ভার তো সকলেই বহন করে, তবু বেঁচে থাকার কী অসীম তৃষ্ণা সকলের বুকে। পেঁচা, গলিত স্থবির ব্যাং, অন্ধকারের সজ্বারামে জেগে-থাকা মশা, রক্ত ক্লেদবসার মাছি—জীবনের প্রতি এদের সকলের উষ্ণ অনুরাগ অনুমেয়। এমনকি অল্পপ্রাণ ফড়িংও তার মৃত্যুর আগে আপ্রাণ প্রতিবাদ করে।

কবিতার এই অংশে বারোটি পংক্তির সাহায্যে কবি জীবনের একটি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এখানে লক্ষ্যণীয়, জীবনের প্রতি যে-সব প্রাণীর অনুরাগ অনুমেয়, তারা অনেকেই গলিত স্থবির, থুরথুরে অন্ধ, রক্তক্লেদবসাভোজী, অন্ধকারের অধিবাসী। অথচ ঘনিষ্ঠ আকাশ, বিকীর্ণ জীবন এদেরই মন অধিকার ক'রে আছে। অপরপক্ষে যে-লোকটি আত্মহত্যা করল তার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ছিল, জীবনে স্বাভাবিক দাবি ছিল। তবু সে যে একগাছা দড়ি হাতে একা-একা অশ্বত্থের কাছে গেল সে কি, 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা'—এই জেনে?

এইখানে কবি কবিতাটির আসল কথা বলেছেন। যে-জীবনের অনন্ত ঐশ্বর্যের গান 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে জীবনানন্দ গেয়েছেন, সেই জীবন সম্পর্কেই এই লোকটির প্রতীতি হল মানুষের জন্য তার ভালোবাসা নয়। যদি ফড়িঙের দোয়েলের জীবন মানুষের লভ্য হত, তাহলে হয়তো জীবনের বিশুদ্ধ প্রেমে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারত। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এক

বোধ জন্ম নেয়, 'সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।'

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়ের :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার! নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে নাকি?

হয়তো এই ক্লান্তিতেই, অবসাদের এই ভারেই, ধীরে শুয়ে থাকার ইচ্ছা দুর্দম হয়ে উঠেছিল ব'লেই অশ্বত্থের শাখায় সে দড়ির গিঁঠ বেঁধেছিল। অশ্বত্থ-শাখার প্রতিবাদ, জোনাকির মাখামাখি, অন্ধ পেঁচার তুমুল গাঢ় সমাচার—কিছুই তার সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে নি। তার চতুর্দিকে জীবনের লীলা তাকে নিরন্তর ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু এই মহাজ্ঞানী জেনেছে, এ-জীবন মানুষের নয়; শান্তির সময়, ধীরে শুয়ে থাকার স্বাদ কোনোদিন সে পাবে না। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে জীবিতের মনে ব্যঙ্গ উত্থত হবে, কেননা যে জীবিত, যে এই মৃত্যুর কাহিনীতে বিস্মিত, তার এই ক্লান্তির ভার এখনো অসহ্য হয় নি। এই মৃত্যুকে সে তাই স্বভাবতই প্রশ্ন করবে—

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োল
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

এই ব্যঙ্গের কোনো উত্তর নেই।

পরবর্তী অংশটুকুতে মৃতের জীবন আবার পর্যালোচনা ক'রে তার মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রেম, দাম্পত্যজীবন, সচ্ছলতা—

কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু এ-কথা বলার পর অপ্রত্যাশিতভাবে কবি বলছেন, 'তাই লাসকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।' কবিতার এই অংশে এসে কবি হঠাৎ তাঁর বিচ্ছিন্নতার দূরত্ব থেকে কিছুক্ষণের জন্য স'রে এলেন। জীবিত মানুষের যুক্তিতে এই মৃত্যুর কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না, এই কথাটা বলার জন্যই তিনি রূঢ়ভাবে কবিতাটির মোড় ফেরালেন :

হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবনে কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

এখানে 'তাই' কথাটির ওপর অনেকখানি ঝোঁক এসে পড়ছে। মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ এই ব্যক্তিটির ছিল না, সুতরাং এর মৃত্যু সাধারণ আত্মহত্যা নয়। সর্বপ্রকার সাংসারিক সফলতা এর ছিল, তাই সে আজ আত্মঘাতী। হয়তো এই সফলতা না-থাকলে সে তার চেষ্টায় নিজেকে ভুলে থাকতে পারত, হয়তো পরিশ্রমে, অনুশীলনে হৃদয়ের সেই বোধ ভোঁতা হয়ে আসত। কিন্তু তার পরিবর্তে সে কেবলই ক্লান্ত হয়েছে; প্রেম, সংসার-সুখ, সচ্ছলতা কেবল তাকে ক্লান্ত করেছে; তার সেই বোধ—যা স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, অন্য কিছু, তা সহবাসের শয্যাতেও তাকে বিনিদ্র রেখেছে। এই ব্যাখ্যা কবি মৃতের পক্ষ নিয়ে আমাদের কাছে পেশ করেছেন। বহু বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে লোকটি শেষে অশ্বত্থশাখায় গলায় দড়ি দিল, যে-লাসকাটা ঘরে ক্লান্তি নেই সেখানে সে আজ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

কিন্তু কবি কি এখনো মৃতের সিদ্ধান্ত বা তার কীর্তি সমর্থন করেন? এই স্তবকেই কবি বলছেন এক বিপন্ন বিস্ময় **আমাদের** রক্তের ভিতর কাজ করে, **আমাদের** ক্লান্ত করে। কিন্তু এই ক্লান্তির সমাধান করতে গিয়ে সে 'লাসকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে'। এখানে আর কবি মৃতের সঙ্গে একাত্ম নন, এমনকি তার শুয়ে থাকার বর্ণনায় মৃদু করুণারও আভাস আছে।

কবিতাটি এবার মৃতের জগৎ ছেড়ে জীবিতের পৃথিবীতে ফিরে এল।

আমরা জীবিত ব্যক্তিরা জানি, অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার পরেও ক্লান্তি আছে, আমরা জানি হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, সব নয়। তবু একই সত্য জেনে সে মৃত, আমরা জীবিত। পরিণতির এই বিষমতায় জীবনের বড়ো একটা ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়েছে কবিতার শেষ অংশে, যেখানে কবি আবার থুরথুরে অন্ধ পেঁচাকে সেই অশ্বত্থেরই ডালে বসিয়েছেন। পেঁচার পেছন পেছন, আমরা অনুভব করি, ব্যাং মাছি মশার বাহিনীও উপস্থিত হয়েছে। জীবনের স্রোতে কোনো টান পড়ে নি, একজন মানুষের মৃত্যু সেখানে কোনো আঁচড় কাটে না। 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচার সমাচারই শেষ পর্যন্ত বিচক্ষণ, কেননা কী হয় মানুষের আত্মহত্যায়, জীবনে তার কোনো স্বাক্ষর নেই। আমাদের মাথার ভিতরে যে-বোধ নিরন্তর কাজ করে, যা আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত করে, তা থেকে আত্মহত্যায় মুক্তি খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। এই জ্ঞান নিশ্চয়ই আমরা লাভ করেছি, তাই আমরা বেঁচে থেকে এ-মৃতের কাহিনী শুনছি। আর এই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য ক'রে চ'লে যাব।

জীবিতের এই সিদ্ধান্তের প্রতিও কবির ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তি ও কবি-স্বয়ং অভেদ, আজ আট বছর পরে যেহেতু তিনি সেই অপঘাতের পর্যালোচনা করছেন, ব্যঙ্গ তাঁকেও লেগেছে।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটিতে কবির এই প্রকীর্ণ ব্যঙ্গ—যা কবি বা পাঠক কাউকেই রেহাই দেয় নি—কবিতাটির সহজ ব্যাখ্যা বিপজ্জনক ক'রে তুলেছে। এই ব্যঙ্গটুকু বাদ দিলে কবিতাটির কোনো অর্থ হয় না, যদি মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে জীবনের জয়ধ্বনি শোনাবার ইচ্ছেই জীবনানন্দের থাকত তাহলে এই পদ্ধতিতে কবিতাটি তিনি লিখতেন না। লাসকাটা ঘরের শান্তি আমাদের কাছে অবোধ্য, তাই আমরা প্যাঁচার সমাচার গ্রহণ করেছি। মনে থাকতে পারে, যখন অশ্বত্থশাখা, জোনাকির স্নিগ্ধ মাখামাখি সমস্বরে আত্ম-হত্যার প্রতিবাদ করেছিল, তখন এই থুরথুরে অন্ধ পেঁচা তার চূড়ান্ত নিস্পৃহতা দেখিয়েছে। কবিতার শেষে, আত্মহত্যার পরও এই নিস্পৃহতায় কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আসলে এটা জীবনেরই নিস্পৃহতা, মানুষ যার বিধানে প্রক্ষিপ্ত।

৭

জীবনানন্দ তাঁর সবশেষের কবিতাগুলিতে ব্যাকুলভাবে শান্তির অভিলাষী হয়েছিলেন। জীবনে পবিত্র আনন্দ ও অবিনাশী শান্তির জন্য যে-কোনো মূল্য দিতে তিনি রাজি ছিলেন; কিন্তু তাঁর এই ব্যাকুল প্রার্থনায় দ্বন্দ্বের দীর্ঘ ইতিহাস, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দন আমাদের বিষণ্ণ ক'রে তোলে। জ্ঞানপাপ মুছে ফেলতে আমরা পারি নি, অহমিকার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কোনোদিন তা পারব কিনা তাও জানি না। তাই আনন্দের, শান্তির এষণা আমাদের আমৃত্যু তাড়না করবে। রবীন্দ্রনাথের গানে সুগভীর আস্থায় সেই আনন্দের, শান্তির কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে। 'অসীমের পথে জলিবে / জ্যোতি ধ্রুবতারকার'—এই পংক্তিতে বিশ্বাসের সে-স্বচ্ছতা আছে, 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, / তুমি তাই এসেছ নিচে / আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, / তোমার প্রেম হতো যে মিছে॥'—এই গানে অমৃতের যে-আত্মা বিধৃত হয়েছে—তা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু আজকের বিশ্বজোড়া মহামারীতে আমাদের চেতনা খণ্ডিত, বিশ্বাস শিথিল। বর্তমান এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমাদের যে রবীন্দ্রনাথের অমর্ত্যলোকে সহজভাবে নিশ্বাস নেয়া আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের জীবন, আমাদের দ্বন্দ্ব, আমাদের শান্তি ও আনন্দকামী চেতনার রক্তাক্ত সাধনা জীবনানন্দের কবিতায় প্রাণ পেয়েছে। জীবনানন্দ তাই আমাদের কবি।

দ্বীপাবলী

অমিয় চক্রবর্তী

ওঁ ক্রতং স্মর

জালানি-কাঠ, জলো
জলতে জলতে বলো
আকাশতলে এসে—
'আঙার হ'লো আলো
আঙার হ'লো আলো
পুড়লো কাঠের কালো,
পুড়লো কাঠের কালো,
নীল সন্ধ্যার শেষে ॥

বার্বেডোস দ্বীপ
ক্যারিবিয়ান
জুলাই ১৫, ১৯৫৬

দিনান্ত

যেতে যেতে,
ঘরের দেয়াল রাঙা আলোয় জড়িয়ে ধরে ;
জানলা ধারে রশ্মিমালা
চেনা গাছে
সব দেয়া তার চাওয়ায় ভরে ;
যতই মেঘের দূরে দাঁড়ায়
হাসে চিরদিনের হাসি ।

ত্রিনিদাদ
জুলাই ২৫, ১৯৫৬

ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে একদিন প্রশ্নোত্তরে

কিছুই না ব'লে
কী কথা গেলেন তিনি ব'লে
ভগবান বুদ্ধ, হাতে তুলে ধ'রে
পদ্মটি, আলোয় তুলে ধ'রে ॥

ত্রিনিদাদ
পোর্ট-অব্-স্পেন
জুলাই ২৬, ১৯৫৬

রাত্রি

কে আসে কে যায় আঙুল বুলিয়ে
আজ আকুলিয়ে
বুকের পিয়ানো বাজিয়ে সে যায়
ঢং ঢং রং হঠাৎ দুলিয়ে
কেঁপে-কেঁপে ওঠে আলাপে প্রলাপে ।

তারি সে আঙুল সবার আঙুলে
আজ রাত্রের সব ঢাকা খুলে
একেবারে এই বুকের নিভৃতে
ফিরে আসে সুর চির দুপুরের
বেজেছিলো ব্যথা চরম নিশীথে—
ফিরে সেই এক রাগিণী বাজায় ।

মার্টিনিক দ্বীপ
১৭ই অগস্ট, ১৯৫৬

যুগ্ম দূর

অদৃশ্যের কোটি কল্প চ'লে
হঠাৎ বিস্মিত শূন্যে আসে কৌতুহলে
কাছাকাছি দুই অগ্নিতারা।
প্রতিবেশী সৌরলোক দেখে দৃষ্টি অঙ্গীকার
হীরে আলো অঙ্গুলি-বিনিময় দোঁহে,
জ্যোতির মুহূর্তে চির চেনা।
মুছে যায় যুগান্তের অজ্ঞাত তৃষিত অন্ধকার
স্মৃতিহীন মোহে।

আকাশ জানে না
প্রকাশ রাস্তায় এ কী কুড়োনো স্বাক্ষর,
নক্ষত্রসমাজ খোঁজে শেষ পরিচয়—
ওরা পরস্পর
নূতন বিরহে পায় অভিন্ন বিচ্ছেদে দীপ্তিময়

উদ্ভাসিত দূরে দূরে অনন্ত বাসর।

গানানা
অগস্ট ২৬, ১৯৫৬

শ্রুতি

চীৎকার ক'রে কে দোতলায় ডাকছে
—"অ—ম—র দ—ত্ত"—
মাথা নেড়ে ভাবি ঠিক ; দেখি
হঠাৎ এ কী
নিজের চোখ আর বাইরের লোক
একতলার গলি আর কুমোরতলি
যা কিছু আছে, যা থাকছে,
—সমস্তই তাই।

দুপুরে কলকাতায় সন্ধান পাই,
অগাধ বিস্ময়ে
অপ্রমত্ত ॥
(জানি না ভদ্রলোক কে, গেলেন কারা কথা ক'য়ে)

হেইটি
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

প্রাগৈতিহাসিক মৃগয়া

জ্যোতির্ময় দত্ত

জড়ো হয় মাংসলোলুপ সন্ন্যাসীবৃন্দ
যখন আখরোট-বনের সেই সব অলস অপ্সরা
চুল খুলে ফেলে, চুলের কৃষ্ণ ফোয়ারা,
ছড়ায় যখন ভিজে শ্যাওলার জলীয় স্নিগ্ধ গন্ধ।

তখন বাইরে হয়তো দুপুর, পৃথিবী ধ্যানস্থ ;
বৈশাখ মাসের নীরব দুপুর
দু'হাতে আখরোট জড়িয়ে এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মতো
যেন গম্ভীর এক নিমগ্ন কাঠবিড়ালী পৃথিবীর এই আণুবীক্ষণিক খণ্ডটুকুর
বিশদ কোনো যুগান্তকারী পরীক্ষায় রত।

ঝোপের আড়াল থেকে সন্ন্যাসীরা দেখে গোপনে
আখরোট গাছের তলায় ইন্দ্রের রমণী ;
স্নায়ুর রোদনে
প্রতিধ্বনিত তাদের ধমনী
শূন্য ক'রে রক্তের সমুদ্রের ঢেউ হৃদয়ের তটে
পাখা ঝাপটায় আহত কবুতরের মতো।
আখরোট গাছের তলায় দেহের নরম পালকে
স্তন দুটি তার, তার দুই ঘুমন্ত ছেলে শায়িত ;
যেখানে শ্যাওলা ঢেকেছে ঝরা পাতা আর আখরোটে
হাত দুটি তার, অসহায় যেন, শাদা কবুতর ক্লান্ত !

তাদের স্নায়ুর সবুজ ডালের ফাঁকে-ফাঁকে
ডেকে-ডেকে হয়রান অগুনতি কর্কশ টিয়ারা ;
ঘাসের শয্যায় শুয়ে ঘুমন্ত অপ্সরা
শরীরের উত্তাপে উষ্ণ করে ঘাসের শীতল শোণিতও

হয়তো বা এই ভেবে, নির্বোধ দুরন্ত বালকের মতো
দূর্বা-ঘাস পায়ে দ'লে, পাতা ছিঁড়ে ঘরে ফেরে লজ্জিত সন্ন্যাসী।
কিন্তু আজ সব কিছু বিব্রত করে ; এমন কি উদ্ধত ঐ শালিকের হাসি
কিংবা পথের পাশে সূর্যের আলোয় সর্পিণীর কঞ্চুর
ঝলসে চমকে ওঠা, বর্ষীয়সী ঈপ্সিতার সামনে বালক হৃদয়ের মতো।
এ-অপরাহ্নে যা-কিছু রৌদ্রে আছে শুধু তা-ই ঈপ্সিত,
তপস্যার অন্ধকারে লব্ধ বুদ্ধির জরাহীন আধারও রৌদ্রে ভঙ্গুর
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে লাল সূর্য যেন ধ্যানস্থ আত্মার রক্তাক্ত ক্ষত।

নেই তপোবনে ফিরেও নিস্তার নেই
এমন কি তপোবনে
রাত্রে স্বপ্নের প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যে
ত্রাসে উলঙ্গ মেয়েরা পালায়। কণ্টকবিদ্ধ
স্তনের উপর ব'সে থাকা মখমল-পোকার মতো রক্তবিন্দু।
পিছনে কাতারে-কাতারে আসে বৃদ্ধ, লুব্ধ সন্ন্যাসীর দল,
কাঁটার ঝোপের ডালে পরিত্যক্ত, সিক্ত বল্কল
যেন সকল কালের সন্ত্রস্ত, মৃত পলাতক আত্মারা
চতুর হ'য়ে, দেহ ছেড়ে শুধু শুকনো চামড়ার
মতো বাকল হ'য়ে মৃদু দুলছে।
অরণ্যে স্থির শুধু অপ্সরার
ঘর্মাক্ত দেহের মাদক গন্ধের আমেজেও
আকাশের সাত চোখ, পাতার আড়ালে সাত তারা।

নির্বাণ

শহীদ কাদরী

রাস্তার ধারে সে ফুলছে,—বাচাল বসন্তের অধিরাজ।
পিচ্ছিল পোকাগুলো তার হাঁ-করা চোখের
চুঁইয়ে-পড়া রসে ঘুরছে, কী মসৃণ!

ঢের অলি-গলি মাড়িয়ে সে আপন
একাধিপত্যে মাননীয় ছিল সব গৃহস্থের ঘরে।
গুণীর মতো তার গলার সামান্য কসরৎ
সহজে লাগাতো তাক : মৃদু, একটু গরর্,
ত্রস্ত সবাই তারে পথ ছেড়ে দিতো,
এবং সে বিজয়ী রাজার মতো পায়ের অরণ্য ঠেলে
বেরিয়ে আসতো এই রাস্তার ধারে।

বড়ো রাস্তা,—যেখানে নশ্বর সব, মেলায়-মেলায়
চকিত উদ্ভাসে হল্লা, জেল্লা, মুখ, যান,—
তাকে সে এড়িয়ে চলেছে চিরকাল ; কেননা সেখানে তার
অস্তিত্ব শুধু একরাশ অস্বস্তির স্তূপ।

কখনও সে বৃত্ত ছেড়ে যায়নি কোথাও
এবং অলৌকিক বাসনায় ঘুরেছে চরকির মতো
নিজেরই বঙ্কিম, ঋজু, লেজের পেছনে।
এমন কি মাঝে মাঝে এক একটা সুডৌল দিন
ঘুরতে-ঘুরতে কেটেছে কী দুরাশায়!
নিজেকে করেছে সে ধাওয়া!

কিন্তু সে আশ্চর্য ফুর্তিবাজও ছিল,
রঙিন বলের সঙ্গে তার উল্লাস

আনন্দে ভ'রে তুলতো সারা পাড়া,
এবং তার উদ্ধত গলা-ফোলা গর্বের ভারে
আমরা নোয়াতাম সব মাথা।

সারাটা বসন্তকাল সে জলতো শিখার মতো ;
এবং ফুল-না ফুটলেও অন্তত তার লালা
চরাচর সিক্ত ক'রে, তীব্র কামনার মদে
ডুবিয়ে দিয়েছে সব ; সে-বিশাল আঁধারে
একান্ত নির্ভর ছিল মাতাল আশ্লেষ :
দৃশ্যমান অনন্ত পাল!

এখন সে নির্মোহ, পড়ে আছে একধারে, চুপ।
ফুলে গেছে জলভরা মশকের মতো ;
মন্মথ সুহৃদ তারে শুড়শুড়ি দিলেও
তেমনি সে প'ড়ে থাকে একলা, উদাস
সীমার বাইরে, অধিরাজ।

এবং চোখের মণিতে তার পড়েছে ধরা
নির্বিকার চিরন্তন,—থেমে আছে অপরূপ
বিশাল, বাসন্তী আকাশ সন্ধ্যার,—
গভীর ধ্যানীর মতো মোহন, তন্ময়!

দুটি কবিতা

অরবিন্দ গুহ

প্রতিদ্বন্দ্বী

আমি নির্ভুল বুঝেছি। যখন রাত্রি
সুদূর, আকাশে সূর্য একক যাত্রী ;
তারই অলজ্জ আশা
তোমার অঙ্গে লিখে দিয়ে গেছে অবোধ্য পরিভাষা।

আনত নয়নে কাজললিপ্ত গন্ধ
আমাকে করেছে গভীর সত্যসন্ধ ;
আজ বুঝি মনে মনে—
তোমার মুখের রক্তিম আভা সূর্যের চুম্বনে।

আকাশে ব্যাপ্ত অপার বিশাল বৃত্ত,
তথাপি সূর্য আজো সংযতচিত্ত
হ'লো না। কাকে কী বলি।
তোমার শান্ত শ্বেতনদী থেকে ভ'রে নিল অঞ্জলি।

নিজেই হলাম নিজের নিগড়ে বন্দী,
সূর্য আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ;
উভয়েরই প্রত্যাশা—
একা সব ঢেউ গুনে-গুনে নেবো, সব ভাষা, ভালোবাসা ॥

বিপরীত ঋতু

তোমার জননী জ্যৈষ্ঠ। তুমি উত্তাপের বৃন্তে ফুল।
আর আমি পৌষের নির্মাণ।
দুই বিপরীত ঋতু। মধ্যে আছে বসন্ত ; ব্যাকুল
ঋতুর ভূমিকা, তার গান।

এ প্রায় অভাবনীয়। দু-প্রান্তে বিষম অসংগতি
যে-সূত্রে স্পর্শিত সে তো চিরন্তনী স্বর্ণস্রোতস্বতী।

তোমার জননী জ্যৈষ্ঠ। এ-সংবাদে বিমূঢ় হলাম।
শত্রুর সাম্রাজ্যে গিয়ে কী ক'রে তোমার শান্ত নাম
উচ্চারণ করি ! সব বিতর্ক বিফল ?
কালে-কালে লুপ্ত হবে উগ্র প্রতিবাদী কোলাহল।
ইতিহাসে বিখ্যাত ও অখ্যাত শহর, নদী, গ্রাম—
সকলের চেয়ে ধন্য এই স্রোতস্বিনীটির জল।

তোমার জননী জ্যৈষ্ঠ। আমি উত্তাপের অভিলাষী।
যদিও পৌষের কাছে ঋণী, তবু জ্যৈষ্ঠের দুয়ারে
প্রার্থী হই। এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুর সংসারে
এসেছি। এখানে আমি এখন প্রবাসী।
উষ্ণতার অন্তহীন মধুর সম্মান
নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো শ্বেতশুভ্র গান
শীতের সর্বস্ব থেকে। আমি সংসারের কাছে ঋণী—
দুই ঋতুপ্রান্ত ছুঁয়ে বয় একই স্বর্ণস্রোতস্বিনী।

অনাগত সন্ধির ভোর

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ছু লো কি ছুঁলো না তার হাত, জাগলো পদ্ম। আর সেই রজনীতে পাগলটা
ঘুরে মরলো কেঁদে ফিরে-ফিরে—সবুজে জড়িয়ে বৃথাই নামলো কালো
অরণ্যে, বললো ব্যথা করে ভাই, ব্যথা আমার মজ্জায়, আমার অন্তর-গুহায় :

আর আকাশ জুড়ে, যেন হারানো দিনের রাজপুত্র ফিরে এলো ভেবে, ভেঁপু
বাজালো মেঘ। কিন্তু বৃথাই—পড়লো না একবিন্দু জল ; তৃষিত ক্রৌঞ্চ
ক্রৌঞ্চীর এক জোড়া চোখের সামনে ছটফটিয়ে ম'রে গেলো।

পাগল বললো পদ্ম ? কী হবে আমার পদ্মে ? বাঁচাও দেখি ম'রে-যাওয়া প্রাণ,
জল দাও দেখি জলহীনকে ?

হাত বললো পাগল, তোর কথাও সমান পাগল—তবে দেখবি তোর প্রাণ,
দেখবি তোর জল ?

তবু ছুঁলো কি ছুঁলো না তার হাত, আবার জাগলো পদ্ম। মরীয়া হয়ে আবার
ছুঁলো সে, আবার পদ্ম—আবার, আবার, আবার ছুঁলো সে, আবার পদ্ম।
পাগলও উঠলো খেপে, আরো আরো খেপে।

এই খেলা চললো সারা রাত। সবুজ জড়িয়ে কালো নিস্পন্দ-নিশ্বাস, ভুলে
গেছে ব্যথা—মেঘ বহুক্ষণ হতবাক। ক্রৌঞ্চের রক্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে নিঃশেষ
হওয়ার আগেই রাত্রির আত্মা বৃদ্ধ কুমারী শুষে নিলো সে-উত্তাপ।

ভোর হলে পাছে কী দেখতে হয় ভেবে পাগল দিলে দৌড় : নিজের
চোখ দুটোকেই তার ভয় !

—তখন পদ্ম বসলো কাঁদতে।

বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কী ক'রে তোমাকে আমি ফিরে পাবো
এই ভিড়ে, বিভ্রান্ত শহরে ?
যদি রাত বৃষ্টি আনে কোথায় দাঁড়াবো,
আয়োজন হবে কার ঘরে ?

দিনে সূর্য দুর্বিষহ, রাত্রে অন্ধকার,
দিনে ভিড়, রাতে নিঃসঙ্গতা ;
কোথায় ঠিকানাহীন খোঁজাখুঁজি আরম্ভ আবার,
নৈকট্যে কোথায় গভীরতা !

কী ক'রে তোমাকে ফের ফিরে পাবো
এই ভিড়ে, নীরক্ত সংসারে ;
অনেক ক্লান্তির শেষে কোথায় দাঁড়াবো
রাত্রির নীরন্ধ্র অন্ধকারে ?

ল্যাম্পপোস্ট আলো জ্বালে ; বৈদ্যুতিক তারে
হঠাৎ আলোর ছটা, মেদুর আকাশ ;
যদি জোর বৃষ্টি নামে, হাওয়ার জোয়ারে
ঘুচবে কি সব দীর্ঘশ্বাস !

হু-হু ক'রে হাওয়া আসে, সামুদ্রিক হাওয়া,
উড়ায় বিশুষ্ক পাতা, পথের জঞ্জাল ;
ধূসরিত স্মৃতিতটে করে আসা-যাওয়া
স্মরণের তরঙ্গ উত্তাল।

রজনী গভীরতর, পথে মাঠে লোকজন কমে,
চমকায় বিদ্যুৎ দিকে-দিকে ;
ঘনায় গম্ভীর মেঘ, ঘনপাণ্ডু অন্ধকার জমে,
আদিম গানের কলি বুকে।

এ-সময়ে একা একা, তোমাকে কোথায় ফিরে পাবো,
পরিত্যক্ত, নির্জন শহরে ;
বৃষ্টি তো আসবে জোর, কোথায় দাঁড়াবো,
আয়োজন হবে কার ঘরে ?

ষোড়শপদী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি তার অঙ্গ ছুঁয়ে পাই নগ্ন অরণ্যের মুখ,
ধারায় আহত ব্রণ, তীব্র গ্রীষ্মে দগ্ধ তৃণভূমি।
ভুলে থাকি দর্শনের মূলসূত্র, সাহিত্য, মৌসুমী
এবার কিছু বা আগে এসেছেন, সংগ্রামে উৎসুক
জনগণ প্রতি পথে, জননীর মাসিক আহার
আমারি অর্জনে হয়, অবিধবা ভগিনীর স্বামী
বাউণ্ডুলে চিরদিন, পৃথিবীর দারিদ্র্যের হার
আমি পরি কৌতূহলে, প্রভাতেই গর্ভ হতে নামি।

চক্ষেতে গৈরিক নদী রঙ্গনটী দশগীর মতো
বসনে বিছায় মাছ কুচি-কুচি পালকের মণি।
রোদ্দুরের কাঁটা অঙ্গে, হাওয়ার হাসির ভারে নত;
সুদুর্লভ পদ্মনাগ অন্ধকারে খোঁজে পদ্মযোনি।
আমি সব ভুলে থাকি অনুদ্ধত বর্ষায় শরতে,
নদীর, পাখির রং, যদি পাই অরণ্যের মুখ,
অন্ধকার স্তনভার, তপ্ত মগ্ন নিশ্বাসের স্রোতে
সিক্ত হই মত্ত সিংহ, সিক্ত হোক সিংহের চিবুক।

দুটি কবিতা
(মঞ্জুশ্রীকে)

আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন

সর্বনাশের সূর্য যেখানে জ্বলে
সেখানে হঠাৎ তোমার চোখের ছায়া
দহনের চিতা আড়াল করেছে বলে,
যদিও কৃপণ তোমার মনের মায়া
আমার পৃথিবী তুমিই করেছ জয়,
তোমাকে দিলাম আমার যা সঞ্চয় !

অবশ্য নেই দিব্যবিলাসী ঢেউ,
হতেও চাইনি নটরাজ-অনুচর,
কণ্ঠসভায় আমাকে ডাকে না কেউ—
বৈশ্যের দেবী আমাকে দেয়নি বর।
তোমার যোগ্য হয়তো কিছুই নেই,
তবুও দিলাম আমার যা তোমাকেই !

দিলাম আমার মনের তীব্র জ্বালা,
বিফল পূজার দুঃখের নামাবলী,
বেদনার নীল অপরাজিতার মালা
আর পথ-চাওয়া ব্যর্থ কৃষ্ণকলি !
সঙ্গে মিলাই ঝড়ে ঝ'রে-পড়া আশা
এবং হৃদয়, হৃদয়ের ভালোবাসা।

হয়তো জীবনে পেয়েছ যা-কিছু পাওয়া,
হয়তো রঙিন অন্য পৃথিবী কোনো
পেয়েছে তোমার মনের উষ্ণ হাওয়া,
তুমিও ফুলের আসরে ইমন শোনো।

কাজের আমার অর্ঘ্য বা উপাসনা
তোমার চলায় পথের বিড়ম্বনা।

তবুও আমার পৃথিবী তোমার হাতে ;
তোমারই ধ্যানের অসীমে হয়েছে জমা
যা কিছু আমার, হে আমার প্রিয়তমা !
তুমিই অন্ত অন্তিম বেদনাতে,
যদিও তোমার কৃপণ মনের মায়া
পাইনি, পেয়েছি উদাস চোখের ছায়া।

ধ্যান

শুধু পূজারীর মন যদি হয় অমলিন
যদি তার ধ্যানে একেরই প্রদীপ জ্বলে,
বাসি ফুল, বাসি মন্ত্রেও নাকি কোনোদিন
মাটি-পাথরের প্রতিমাও কথা বলে !

তুমি সচেতন, ধ্যানের বেদীতে বাঙ্ময়,
জ্ঞানের তীর্থে যাত্রী তোমার প্রাণ,
ফুলের বদলে তোমাকে দিয়েছি এ-হৃদয়—
তোমাকে দিয়েছি সারাজীবনের গান !

প্রার্থনা হয়ে পরশ হয়েছি বাতাসের
অথচ পাইনি তোমার মনের সাড়া,
তোমার দিনের খেয়ালি খেলায়, আকাশের
ব্যর্থ দেয়ালি আমার রাতের তারা !

মাটির প্রতিমা কিংবা নিয়তি পাথরের
তুমি নও, তুমি কঠিন কি তারও চেয়ে,
অথবা রঙিন খেলনা, শিশুর আদরের,
অথবা কি শুধু রূপকথা-শোনা মেয়ে ?

রূপকথা

প্রতিমা পাল

নিঃঝুম দুপুরের বিষণ্ণ আলোয় মাছরাঙা
ওড়ে সবুজ পানাপুকুরের ধারে নিমগাছের
পাতার ফাঁকের শাদা আকাশটুকুতে। কখনো বা
জলের ধারে এসে বসে, ছায়া-ঢাকা লাল মাটির
রাস্তায় সবুজ ঘাসবুনুনির উপর, ও যেন
একটা চকমকি পাথর ; এখুনি ইচ্ছে করলে
জাগাতে পারে আশ্চর্য দুপুরের ঘুমন্ত আকাশ ;
এক টুকরো আগুনের ফুলকির মতো হঠাৎ
চমক লাগিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে এই ক্লান্তির
গুণ্ঠন। এই নির্জন অবকাশের মধ্যে ঐ শুধু
চঞ্চল, উৎফুল্ল ডানায় ভর ক'রে একবার
গাছের পাতা ছুঁয়ে যায়, আবার গিয়ে বসে জলের
ধারে ; জলের আয়নায় হয়তো আকাশকে দেখে
নয়তো মন্থর শামুকের সঙ্গে মিতালি পাতায়।

একান্ত গোলাপ

শামসুর রাহমান

আমার হৃদয়ে নেই লোকাতীত একান্ত গোলাপ,
সৌরভের উন্মোচনে যার রূপসী মহিলা তুমি,
তুমি হবে প্রমোদের রানী নেপথ্যে বসন্তদিনে।
বরং হৃদয় আজ ভয়াবহ তীব্র তিক্ত গন্ধের অধীন। ভ্রমে যদি
নিষ্ঠুর দুর্গন্ধে ভরা এই হৃদয়েরে মনে করো
অলীক অম্লান ফুল, সে কার চক্রান্ত তবে, কার ?

আমার হৃদয় যেন অতীতের বিধ্বস্ত নগর,
যেখানে প্রেতের মতো ভাঙা থামে নিশান্তের হাওয়া
মাথা কোটে অবিরাম, শূন্যতায় তারার বৈভব।

মানি না আত্মার আয়ু যতিহীন, স্বর্গ-নরকের
প্রাক্তন কাহিনী শুনে কখনো হইনি বিচলিত।
'দেহের বিনাশ হ'লে পরপারে পুনর্মিলনের
উৎসব উজ্জ্বল হবে'—করবো না সে-কথা স্বীকার।
বিশ্বাসের ঝুলি ঝেড়ে অদ্যাবধি পাইনি তবুও
অন্তত একটি কণা সান্ত্বনার। তাই বলি, তুমি
আমার কামের ফুলে মুঞ্জরিত হও দ্বিধাহীন :
তোমার অধর দাও, দাও তুমি মধুর আলস্যে ভরা কেশের মিনার,
এবং বিশ্বাস করো তোমাকে যে ভালোবাসি, তার
চিহ্ন তুমি কখনো পাবে না খুঁজে প্রথাসিদ্ধ পথে॥

দ্বন্দ্ব

গোপাল ভৌমিক

শীতের দিনে শিশিরে ভেজা ঘাস
চাইলে তুমি পাবে কি বারো মাস ?
করুণা-প্রীতি বিশেষ মুহূর্তের
চিরন্তন হয় কি ? যদি জের
টেনেই চলি কেবল পূর্বাপর,
সময়াতীত সূর্য-স্বয়ংবর
শিশির-কণার মৃত্যু আনে ডেকে
কমলা রোদে ভোরের হাসি ঢেকে ।

অনুরাধা

বুদ্ধদেব বসু

গিয়েছিলাম হ্রদের ধারে
  বিকেলবেলা ;
বরফ-গলা-হীরক-জলা
  ক্বচিৎ ঢেউ করে খেলা ।
ঠাণ্ডা দিন, আকাশ ম্লান,
  বাতাস মৃদু,
ঘোমটা-পরা নটীর মতো
  নতুন ঋতু
চটুল, ছোটো, অলংকারে
  ছিটিয়ে দেয় ঝিকিমিকি—
সন্ত-ফোটা সবুজ পাতা, ছুটো রঙিন
  রবিন্ পাখি ।
ভালো তো সব ;—কিন্তু কেন
  অবশেষে
তাকিয়ে থাকি যেখানে জল
  দিগন্তের শূন্যে মেশে ;
    এবং ভাবি, ‘বাধা !—
ঐ ওপারে লুকিয়ে আছে
  আমার অনুরাধা ।’

চলেছি নীল হাওয়ায় ভেসে
  এরোপ্লেনে
পাহাড়-বন-শহর-ভরা
  বসুন্ধরায় সঙ্গে টেনে ।
স্বচ্ছ ভোর, গোলাপি রোদ,
  ঝাপসা মাটি,

বইয়ের খোলা পাতায় মেশা
কফির বাটি
পেরিয়ে যায় দাবার ছকে
গির্জে, হোটেল, নির্জনতা,
ইতস্তত তুষার-চূড়ায় আর বছরের
তন্ময়তা।
দেখছি সবই ;—কিন্তু তবু
মনে-মনে
খুঁজি কোথায় মিলায় ছবি
মৌলিকের অন্বেষণে ;
কেবল বলি, 'বাধা !—
হয়তো পিছে লুকিয়ে আছে
আমার অনুরাধা।'

দাঁড়িয়েছি এক সাগর-তীরে
বেলাবেলি,
রজস্বল জগৎ এসে
যেথায় করে জলকেলি।
নরম দিন, উদার জল
রৌদ্র মাখা,
কাফে-র ভিড়ে পটের মতো
দেখছি আঁকা
সোনালি চুল, নীলাভ চোখ,
বিরাম, সুখ, নিটোল ছুটি,
সম্ভোগের আঁচল-ধরা নির্বেদের
কঠিন মুঠি।
মুগ্ধ আমি ;—তবুও মন
হঠাৎ ভাবে

উঠবে কখন যবনিকা
নটেশ্বরীর আবির্ভাবে ;
এবং বলে, 'বাধা !—
ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে
আমার অনুরাধা।'

আবর্তমান কমলালেবুর
পরিশ্রমে
অম্ল-মধুর ইন্দ্রিয়লোক
সকল দিকে উঠছে জ'মে।
স্বল্প আয়ু, ধ্রুপদী কাল
অপরিমাণ,
অথচ এক আবেগময়
ব্যাকুল যান
ফেনিয়ে তোলে সাগর, বন,
নগর, দ্বীপ, শৈলশ্রেণী,
এমনকি দূর ছায়াপথের পরমাণুর
দীপ্ত বেণী।
বুঝি তো সব ;—তবুও মন
অন্ধকারে
হাৎড়ে বেড়ায় প্রামাণ্য এই
উন্মোচনের পরপারে ;
কেবল বলে, 'বাধা !—
আপন ছায়ায় লুকিয়ে আছে
আমার অনুরাধা।'

হাইনে: ফাউস্ট ও ফীনিক্স

জ্যোতির্ময় দত্ত

আধুনিক কবিতার উন্মেষকালে ১৮৫৬ সালে হাইনরিখ হাইনের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই একশো বছরের পুরোনো আধুনিকতার ও হাইনের মৃত্যুর, উভয়েরই শতবার্ষিকী আমরা একই সঙ্গে পালন করতে পারি। প্রচুর জাঁকজমক ও প্রাতিষ্ঠানিক আড়ম্বর সহযোগে উৎসব করার এই প্রকৃত সময়। আধুনিকতা যেমন এই একশো বছরে এক সম্ভ্রান্ত চেহারা পেয়েছে, অন্তত একজন কবির— ভালেরির মৃত্যুতে যেমন সমস্ত রাষ্ট্র বিপুল সমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টি পালন করেছেন—তেমনি হাইনেরও প্রাপ্য বরাদ্দ নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। তিনিও যে বঞ্চিত হয়েছেন এমন নয়। চতুর্দিকেই হাইনেকে স্মরণ করা হচ্ছে। একশো বছরে তাঁর তীক্ষ্ণতা ক্ষ'য়ে গেছে, যেমন আমরা সময়ের সাহায্যে অতিকায় জানোয়ারকেও জাদুঘরে রাখি এবং নির্বোধ মানব-শিশুরা পরম অবহেলা ভরে তাদের দাঁতে টোকা মারে, তেমনি সেই একদা বিদ্রোহীকে আমরা প্রায় প্রতিষ্ঠানিক ক'রে ফেলেছি।

আধুনিক কবিতার সঙ্গে হাইনের যে-কোনো একটা সম্পর্ক বার করার প্রলোভন ত্যাগ করা এ-সময়ে অসম্ভব। এবং সে-সম্পর্কগুলি আবিষ্কার করাও কঠিন নয়। তাঁর জীবন যেমন আধুনিক শিল্পী-জীবনের প্রতীক, তাঁর কালের ইতিহাস আমাদেরই এই একশো বছরের অভিজ্ঞতার উপমা। আধুনিক শিল্পী যেমন নিজের সমাজ, রাষ্ট্র এবং স্থানে-স্থানে এমনকি নিজ সংস্কৃতি থেকে নির্বাসিত, তেমনি হাইনেও ধর্মচ্যুত ও স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পিতৃদত্ত ইহুদি ধর্মও যেন তাঁর প্রতি গৃহহীনতার দণ্ড-বিশেষ। এমনকি, তিনি মৃত্যুতেও আধুনিক। প্যারিসের শেষ অন্ধকার বছরগুলিকে তাঁর শেষ জীবনের ভক্ত, সঙ্গী ও কবিতার অনুবাদক নেরভালের রচিত কোনো কৃষ্ণ দুঃস্বপ্ন ব'লে ভ্রম হ'তে পারে। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত কবির অন্ধকার ঘর, তাঁর একটি চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ, অন্যটির পাতা খুলতে কিংবা বন্ধ করতে হয় প্রায় বিকল ডান হাত দিয়ে, ঘরের কোণায় খঞ্জের যষ্টি দুটি (যেন কোনো অদ্ভুত, কাঁটায় আচ্ছন্ন, মানুষের প্রতিকূল, নিষ্পত্র উদ্ভিদ), ঘরের বাইরে কোকোতের—

তাঁর স্ত্রীর প্রিয় টিয়াটির—কর্কশ গলায় ফরাসী গালিগালাজ, ও শেষ কয়মাসে, সেই রহস্যাচ্ছন্ন মহিলা যিনি জাতিতে স্থবির কিংবা পোল, কিংবা হাঙ্গেরীয় কিংবা চেক, যাঁর নাম এলিজে, ওরফে কামিই ওরকে বেলজের্ন ওরফে মার্গট, এবং যিনি মাইসনের, হাইনে ও টেইনএর যথাক্রমে সহচরী, সেক্রেটারি, প্রেমিকা ও রক্ষিতা হবার সন্দেহজনক গৌরবের অধিকারিণী; এই সব কিছু মিলে মৃত্যুর জন্য তাঁর এগারো বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিনগুলিকে এক অতি-বাস্তব আবহাওয়ায় ঘিরে রাখে। টমাস মানের ধারণা শিল্পী মাত্রেই অসুস্থ এবং শিল্পকর্মের প্রেরণা জোগান শয়তান স্বয়ং। সমস্ত যুগের শিল্পী-দের বেলায় প্রযোজ্য না হোক, আধুনিক শিল্পীর বেলায় এ-কথা খাটে। এবং প্রথম দৃষ্টিতে হাইনের জীবন ও শিল্পকর্ম যেন এই মতের স্বপক্ষে চরম সাক্ষ্য। যে-ফাউস্টের কাহিনী তাঁকে সমস্ত জীবন অনুপ্রাণিত করেছিলো এবং যে-প্রেরণার কথা জানিয়ে তিনি গ্যেটের বিরাগভাজন হন, সেই ফাউস্ট-পুরাণ যেন তাঁরও নিজের জীবনের চিত্রকল্প। অল্প বয়সে, গটিনজেনে ছাত্রাবস্থায় তিনি যে যৌন ব্যাধির বীজ আহরণ করেছিলেন, শেষ বয়সে সেই ব্যাধিই তাঁকে পঙ্গু ক'রে দেয়। এমনকি সেই ব্যাধির ক্রমপ্রকাশ ও সে-সম্পর্কে তৎকালীন চিকিৎসা-শাস্ত্রের ধারণাও যেন কোনো আধুনিক লেখকের বিশ্ব-ব্যাপী ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে লেখা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো মনে হয়। যেমন আঁরি মিশো কি কাফকার রচনায় কেউ বোঝে না কোথা থেকে নিদারুণ আঘাতগুলি আসে ও সেই আঘাতের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় তারা যেমন হাস্যকর সব প্রতিষেধকের আশ্রয় নেয়, তেমনি হাইনের রোগের স্বরূপ কোনো চিকিৎসকই ঠিক ধরতে পারেননি। তাঁদের ধারণা হয় যে তাঁর মেরুদণ্ডের মজ্জা গ'লে গেছে। সেই কারণে যখন ব্যথা প্রবল হ'তো তাঁর মেরুদণ্ডে গরম লোহার ছেঁকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আফিমের গোলায় ঘা গুলি ভিজিয়ে রাখা হ'তো। কোন শয়তানের নরক এই অনন্ত এগারো বছরের চেয়ে দীর্ঘ? এই ভ্রান্তির চেয়ে নিষ্ঠুর ও পরিত্রাণের উপায়বিহীন?

বাল্যকাল অতিক্রমের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮১০ থেকে ১৮৫৬ শাল, এই স্বল্প পরিসরের ইতিহাস আমাদের এই একশো বছরের অভিজ্ঞতার অনুরূপ। আমাদের শতাব্দীর শুরুতে ছিলো এক অস্বভাবী

শান্তি, নিশ্চিন্ততা ও প্রগতির কাল। বিসমার্কের জয়লাভে যদিও অন্তত ফরাসী জাতির মনে আক্ষেপ ও অনুযোগের অবধি ছিলো না, তবুও অল্প কয়জন ব্যতিরেকে কারুরই মনে হয়নি শান্তি কতো ভঙ্গুর, 'প্রগতি' স্থবির, ও চতুর্দিকে বৈশিষ্ট্যবিলোপকারী কোনো শক্তির উদয় হচ্ছে। ঐতিহাসিক বুর্কহার্ডট, দার্শনিক নীটশে, কবি রঁ্যাবো, সমাজপুরাণ-রচয়িতা স্পেংলার প্রভৃতি কয়েকজনের ক্ষীণ সন্দেহ কিংবা প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস উনিশ শতকের চিন্তায় অতি প্রবল ছিলো। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯২০ শালে বাণিজ্যের উন্নতি ও তিরিশে সংকট, ১৯১৭ সালে রুশ দেশের আশ্বাস ও পরবর্তীকালে, অনেকের কাছেই বিশ্বাসভঙ্গ এবং অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সমস্ত পৃথিবীর যেন দুই বিরোধী শিবিরে বিভাগ, যেখানে সংশয়ান্বিত ব্যক্তির পক্ষ নির্বাচন অসম্ভব না হোক কষ্টকর—এ-সমস্ত ঘটনা অন্য রূপে, ছোটো আকারে পাওয়া যায় নেপোলিয়নের পতন থেকে খুদে নেপোলিয়নের সিংহাসন-আরোহণের মধ্যবর্তী এই চল্লিশ বছরে। নেপোলিয়নের নির্বাসন যে স্বল্পকালের জন্য ইওরোপে স্থিতি আনে তা ভেঙে যায় জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আলোড়নে। তখন হাইনে ছিলেন সমুদ্রতীরে, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। তিনি এতোই উৎসাহিত হন যে তৎক্ষণাৎ প্যারিসে এসে ব্যারিকেডে যোগ দিতে চান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আশাভঙ্গ হ'লো। বিপ্লবের আড়ালে বেনে জাতির অর্থলিপ্সা নিত্য নতুন প্রকারে প্রকাশ পেলো, এবং নিজেদের প্রত্যাশাকে তারা সামাজিক প্রগতির লক্ষ্য ব'লে ঘোষণা করলো। অন্যদিকে হাইনের মনে হ'লো শ্রমিক শ্রেণীও উপযুক্ত নায়কের অভাবে, বেনেদের যন্ত্রপ্রীতি থেকে শুরু ক'রে প্রগতির বুলি সমস্ত কিছু মনে নিয়ে এক বিশাল, নির্বোধ কিন্তু শক্তিশালী, পোসা জন্তুর মতো বণিকের ইচ্ছা সিদ্ধি করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছে।

এ-সময়ে দুটি ভিন্ন উপায়ে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তাদের স্বজন ব'লে উপস্থিত হয় ও তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে। সোশ্যালিস্ট আন্দোলন ও সেন্ট সাইমনিজম উভয়ই হাইনেকে আকৃষ্ট করেছিলো। দ্বিতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আধুনিক ফ্যাশিজ্‌ম-এর সাদৃশ্য এতোই স্পষ্ট যে কম্যুনিজম এবং ন্যাশনাল সোসালিজমের সঙ্গে এই দুই মতবাদের তুলনা না-ক'রে উপায়

নেই। এই দুই দলে গোত্রভুক্ত হ'তে গিয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবীর যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, হাইনের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রতি মুহূর্তে শুধু দলের জীবনেই জীবন্ত হওয়া হাইনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অকারণে, অন্যায়ভাবে সোশ্যালিস্টদের প্রতিবাদ ক'রে তিনি নিজের ও অন্য প্রত্যেকের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তিনি গোষ্ঠী-অতীত, স্বতন্ত্র জীবনের অধিকারী।

কিন্তু সে-দশকের সঙ্গে এ-যুগের প্রধান মিল এই সমস্ত ঘটনায় নিহিত নেই। ১৮৫০ সালে বিপ্লবের ঐতিহ্যের, যেন অকস্মাৎ, যে-বিলোপ লক্ষ্য করি তা যদিও বিস্ময়করভাবে আধুনিক অভিজ্ঞতার অনুরূপ, তাহ'লেও, এমনকি এই ঘটনাটিতেও, এ-যুগের সবচেয়ে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে না। সেকালে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার অর্থ মনে হয় যেন পৃথিবীর ভাগ্যের প্রতীকী অর্থ, যেন কোনো ঐতিহাসিক কালের ঘটনা নয়—বরং পুরাণ-কথিত কোনো কাহিনীর অপভ্রংশ,—জটিল প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত এক ভবিষ্যৎবাণী যা তৎকালীন ফরাসী কাব্যের রূপই শুধু বদলে দেয়নি, যেন অবচেতনায় নিহিত থেকে প্রত্যেক ফরাসীর বোধকেই সিঞ্চিত করেছিলো। প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সাচ্ছল্যের কালে হঠাৎ যেমন উনিশশো তিরিশের অর্থনৈতিক সংকট অপ্রস্তুত ধনতান্ত্রিক সমাজকে ভাসিয়ে দেয়, ও পরবর্তীকালে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই যেমন উপস্থিত সাচ্ছল্যের কুহকে ভুলে নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তেমনি এক আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৮৩২এ প্যারিস শহর আক্রান্ত করে। তারপর থেকেই যেন ফরাসী কবিতার প্রকৃতি পরিবর্তিত হ'তে শুরু করে। এরপর ফরাসী কবিতায়, অন্তত তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তগুলিতে, নিশ্চিন্ততা বিলুপ্ত হয়, প্রগতির পরিবর্তে সেখানে বাসা বাঁধে প্রকৃতির অন্তরে কোনো প্রতিকূল শক্তির অস্তিত্বের চেতনা।

এ-কথা সত্য নয় যে সেই প্লেগই সমস্ত পরিবর্তনের জন্য দায়ী; ফরাসী কবিতার ঐতিহ্যের নিজস্ব গতি ও সমাজ-সংস্কৃতির জটিল সহযোগে এই পরিবর্তন ঘটেছিলো। কিন্তু এই অদ্ভুত দুর্যোগ, টমাস মানের গল্পে ভেনিস শহরে প্লেগের মতোই, যেন সুবিস্তৃত অর্থের আকর ও গল্পের প্রারম্ভে দৃষ্ট, সেই গাঙ্গেয় অববাহিকার অরণ্যের মতো দ্ব্যর্থক—একদিকে মৃত্যুর ও রোগের, অন্যদিকে নিরন্তর প্রজননের প্রতীক। এর দু'বছর আগে রোমান্টিক যুগের

"এরনানি" নাটকটি কমেডি-ফ্রাঁসেসে মঞ্চস্থ হয়। ফরাসী রোমান্টিকতার সে-ই ক্ষণটিই সবচেয়ে গৌরবের। কিন্তু য়ুগোর প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে-সঙ্গেই ফরাসী তরুণেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। প্লেগের সময় য়ুগোর আলো ছিলো, কিন্তু পূর্বের আঁচ তখন ফুরিয়ে গেছে। এর পর থেকে রোমান্টিকতা আর অগ্রবর্তীদের ব্যক্তিগত অধিকার রইলো না। তারা তখন রোমান্টিকতা ছাড়িয়ে আরো দূরে যাবার চেষ্টা করছে। প্লেগের কালে বাস্তববাদ ও আধুনিকতার যদিও অঙ্কুর শুধু প্রকাশিত হ'লো, তবু সেই সূক্ষ্ম সূত্রকে ঘিরেই সবচেয়ে অগ্রগামী এবং সবচেয়ে নির্ভীক শিল্পীরা একত্রিত হলেন।

এই প্রতীকী প্লেগের চিহ্নগুলি অনেক আগে থেকেই হাইনে তাঁর অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। তাঁর কবিতা যখন থেকে তাঁর স্বকীয় হ'লো তখন তিনি অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করেছেন, বাইরনিক ছদ্মবেশ পরিহার ক'রে হ'য়ে উঠেছেন ব্যঙ্গনিপুণ। এবং শুধু রোমান্টিকতার বিরোধেই নয়, আধুনিক চেতনার প্রকাশেও তিনি অগ্রণী ছিলেন বলা যায়। তাঁর 'বিকিনি' কি বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' (Le Voyage) কবিতার উৎস নয়? ১৮২৩-২৪-এ তাঁর রচনা 'নরকের সু-পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত অধিরাজ' বিষয়ে 'প্যারিস-সপ্লীনের সগোত্র নয় কি?' এমনকি বোদলেয়ারের মধ্য দিয়ে তিনি কি র‍্যাঁবোকে সাহায্য করেন নি?

সুতরাং অপ্রস্তুত পাঠককে হাইনের আধুনিকতা মেনে নিতে হয়। কারণ প্রথম পরিচয়ে প্রমাণগুলি অকাট্য। যদি শুধু কাল গুনে কিংবা সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে কবি আধুনিক কি বারোক কি রোমান্টিক হন, তাহ'লে হাইনে আধুনিক। যদি ব্যক্তিগত জীবনই শিল্পসৃষ্টির চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাহ'লে তিনি আধুনিক। যদি রোমান্টিকতার পরবর্তী কালে আধুনিকতার বিকাশ হয়েছে ব'লে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচার আধুনিকতা হয়, তাহ'লেও তিনি আধুনিক। কিংবা আধুনিক কবিতাকে তিনি প্রভাবিত করেছেন ব'লে, কিংবা আধুনিক সুরকারের উপযোগী গান লিখেছেন ব'লে, কিংবা নাৎসিদের বিরাগভাজন হয়েছেন ব'লে কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রবাসী জর্মনরা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ব'লে, কিংবা যখন তাঁর কালের অধিকাংশ জর্মান রোমান্টিক কবিকেই আজকাল অপাঠ্য মনে হয় তখন শুধু তাঁরই

কবিতা উজ্জ্বল আছে ব'লে তিনি যদি আধুনিক হন, তাহ'লেও তিনি তা-ই।

কিন্তু আধুনিক কবিতাই শুধু একালে পড়া যায় এমন তো নয়। আমাদের পিতামহীদের আমলের অলংকার এ-কালের সূক্ষ্ম চোখে বড়ো ভারি মনে হয়, কিন্তু সে-অলংকার যদি শিল্প হতো, যদি যে-অঙ্গ তাকে ধারণ করছে তার উপর এতো নির্ভরশীল না হ'তো তবে নিজ গুণে সে কালোত্তর হ'তে পারতো সন্দেহ নেই। সেকালের অধিকাংশ কবি রোমান্টিকতার যুগে ক্ষমতার অভাবে, কর্তব্য-বোধে রোমান্টিক ছিলেন; রোমান্টিকতার সংজ্ঞানুযায়ী উচিত কবিতা লিখতেন, চতুর অলংকার-রচয়িতা তাঁরা। কিন্তু রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধাচারই কি আধুনিকতার লক্ষণ? আধুনিক চেতনাকে কি রোমান্টিক বোধেরই এক চরম প্রকাশ বলা চলে না? রোমান্টিকতা, বাস্তববাদ, আধুনিকতা—পর-পর এই ধাপগুলি কি পূর্বনির্ধারিত পরিবর্তনের স্তরবিশেষ?

হাইনের জীবন ও জীবৎকাল আধুনিক উপন্যাসে বিবৃত প্রতীকী ঘটনার মতো। কিন্তু তাঁর কাব্যের বেলায়ও কি সেই তুলনীয় গুণ লক্ষ্য করা চলে? হাইনের সঙ্গে যাঁদের আমার মতো, শুধু অনুবাদের ভিতর দিয়ে পরিচয়, তাঁদের কোনো কবিতার ভাষায় ব্যবহার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না-করাই শ্রেয় মনে হ'তে পারে, তবু যখন এমনকি অনুবাদেও গেয়র্গে কি রিলকের সঙ্গে তাঁর ভাষার ব্যবহারের প্রভেদ এত স্পষ্ট যে আমরাও সে-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারি। হাইনের রচনার প্রধান গুণটি হ'লো এই যে কোথাও কোনো উপমা স্ব-নির্ভর নয়; কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলতে, কিংবা সুন্দর করতে, কিংবা পাঠকের কাছে তার আকর্ষণ বাড়াবার জন্য তিনি উপমা ব্যবহার করেন। উপমাগুলি যেন অন্তর্নিহিত ভাবার্থের টীকাবিশেষ। এখানে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ থেকে সংগৃহীত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

"সাচ্চা কিছুই নেই জগতে; দুষ্ট সবাই দোষে।
গোলাপ আপন বোঁটায়-বোঁটায় তীক্ষ্ণ কাঁটা পোষে।
সন্দেহ হয় উর্ধ্বলোকে দেবতা থাকেন যতো
হয়তো তাঁরাও খাদে ভরা মর্ত্যবাসীর মতো।
কিংশুকে, কই, সৌরভি নেই, বৃন্দাবনে তাপ,
গেরুয়া দিয়ে সাধু ঢাকেন মহাবিত্তার ছাপ।"

হাইনের প্রথম প্রণয়পাত্রী আমালী, তার ছোটো বোন টেরেসাকে লেখা একটি কবিতার শেষ চার লাইন :

"কিন্তু ধরলো মরা ডালে ফের শীষ।
স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয় বট তবে ?
তবু গূঢ় ক্ষতে চোঁয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে। (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সুধীন্দ্রনাথ যদিও উপমাগুলি ঘরের কাছাকাছি বস্তু দিয়ে সাজিয়েছেন, তবু যেখানে উপমা নেই সেখানে তিনি তা বসিয়ে দেন নি ; কিংবা যেখানে চিত্রকল্প ঘনবদ্ধ ছিলো সেখানে ভাষ্যের জল মিশিয়ে পাৎলা করেননি। আমাদের মনে ভাষ্য দেওয়া হয়েছে, গোপন উপমেয়গুলিকে অন্ধকার থেকে টেনে এনে আলোক-লাঞ্ছিত করা হয়েছে ব'লে যে-সন্দেহ, তা থেকে অনুবাদককে নিঃসন্দেহে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। এই রচনাভঙ্গির দায়িত্ব হাইনেরই নিজের। তাঁর ধারণা ছিলো যে কবিতার কাজ হ'লো, ব্যক্তিগত অনুভূতির বাহ্য প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করা, তাকে সর্বজনবোধ্য রূপ দেয়া। অনেক সময়েই তাঁর কবিতা-গুলিকে বিস্তারিত "poetic fallacy" ব'লে মনে হয়। অথবা অন্যত্র বাহ্যিক জগতে কোনো ঘটনা দেখে তিনি অন্তর্জগতে তুলনীয় কিছু দেখেন, তখন কবিতাটি হ'য়ে ওঠে বাহির ও ভিতরের সমান্তরাল কাহিনীর বিবরণ, বাইরের সঙ্গে অন্তরের মিল কিংবা প্রভেদের টানে কবিতাটি দাঁড়িয়ে থাকে।

কোনো আধুনিক কবি কবিতায় চিত্রকল্পকে এ-ভাবে ব্যবহার করেন না। চিত্রকল্প তাঁদের কবিতায় কোনো যুক্তির ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক উদাহরণ নয়, চিত্রকল্পই অর্থ, চিত্রকল্পের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনই এক ধরনের যুক্তি, চিত্রকল্পের সংকটই অভিজ্ঞতার সংকট। এখানে হাইনের সঙ্গে আধুনিক কবিদের আরেক প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। হাইনের যে-কোনো কবিতার প্রথম ছত্রগুলি যেন লেখা হয় শুধু শেষ কয় ছত্রের সংকল্পে পৌঁছবার জন্য। কবিতা-গুলি পড়তে-পড়তে মনে হয় শুধু শেষ ছত্রেই প্রথমগুলি অর্থ পাবে। যে-কোনো আধুনিক কবিতায় কবির ভাষা ও অভিজ্ঞতার যে-সংকট মূর্ত হয়েছে, তা কখনো শেষের কয় লাইনের জন্য সঞ্চিত রাখা হয় না। আধুনিক

কোনো শিল্পকর্মের কোনো অংশবিশেষ সমস্তের অন্য অংশের চেয়ে মূল্যবান নয়। অথচ হাইনের বেলায় প্রথম ও শেষের এই বিশেষ প্রভেদ আছে। "পরিবাদ" নামের যে-কবিতাটির কয়েক লাইন আগে উদ্ধৃত করেছি তার ভাবার্থ হ'লো যে সমস্ত কিছুই, তা যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, কোনো-না-কোনো দোষে কলঙ্কিত। কবিতাটি এই "সমস্ত কিছু"র এক বাছাই করা তালিকা। শুধু পরিণতিতে :

"তোমায়, দেবী, ভক্তি করি ; কিন্তু তোমার ত্রুটি
কত যে, তার হিসাব রাখি, কোথায় এমন ছুটি ?
ডাগর চোখে, শুধাও কি দোষ ? আছে কি তার শেষ ?
ঐ সমতল বুকের তলায় নেই হৃদয়ের লেশ !"

সমস্ত কবিতাটি আসলে এই উপসংহারে পৌঁছাবার জন্য লেখা।

তাঁর কয়েকটি কবিতার প্রথম ও শেষ ছত্রগুলি উদ্ধৃত করছি। চারটি কবিতার প্রথম লাইনগুলি এমা লাজেরাস-কৃত অনুবাদে এইরকম :

(a) "All in gray clouds closely muffled",
(b) "Marked is the likeness twixt the beautiful
And youthful brothers,"......
(c) "At times thy glance appeareth to importune."
(d) "My heart, my heart, is heavy !
Though merrily glows the May."

এই কবিতাগুলির শেষ লাইনগুলি যথাক্রমে :

(a) "And will sleep as Gods are Sleeping."
(b) "The best of all is never to be born."
(c) "Incurably thy heart must ache each hour
for love frustrated and frustrated life."
(d) "I wish he would shoot me dead."

যে-কেউ, কবিতাগুলির মাঝের অংশ না-জেনেও, এই প্রথম ও শেষ লাইনগুলির মধ্যে উত্তাপের প্রভেদ লক্ষ্য করবেন। যেমন শেক্সপীয়রের সনেটে প্রথম ছত্রগুলি অপেক্ষাকৃত নিরুত্তাপ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সুরু হয় কিন্তু শেষ লাইনে সমস্ত সঞ্চিত অনুভূতির প্রাবল্যে, বহুবর্ণ কিরণচ্ছটায় ফেটে।

পড়ে, তেমন হাইনের কবিতাও প্রথম দিকে কয়েকটি সংকেত জুগিয়ে শেষাংশে সূত্রগুলিকে নিপুণভাবে একত্রিত ক'রে বেঁধে দেয়। স্থানে-স্থানে নৈপুণ্য এতই বেশি যে আঠারো শতকের এপিগ্রামের মতো আঁটোসাঁটো, নিখুঁত মনে হয়। দ্বিতীয়ত, আঠারো শতকের এপিগ্রামগুলির মধ্যে যে-স্বচ্ছতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে তারও অভাব নেই। হয়তো এই কারণেই, জর্মানসুলভ ভাবপ্রবণতা থেকেও তিনি সহজেই মুক্তি পান তাঁর ভাবপ্রবণতার সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিলব্ধ প্রতিষেধক জুগিয়ে। লরেলেই-এর মায়াবী সংগীত ও তাঁর জীবনে আমালীর প্রভাবের করুণ দিকগুলি তিনি যেমন দেখতে পান, তেমনি তার হাস্যকর দিক সম্পর্কেও তিনি সচেতন। প্রবীণ রোমান্টিকদের ভাববন, বিষাদবিধুর নিষ্প্রাণতা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি নিজেকে নিজের দৃষ্টিতে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বহির্জগতের সামাজিক দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেন। "স্মৃতিবিষ" নামের যে কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছি তার সবচেয়ে বিস্ময়কর লাইনটি—"স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয়বট তবে"—নিজের সম্পর্কে যে-তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার ক্ষমতা রাখে তা নোভালিস-এর থাকলে তিনি এত অশ্রুসজল হতেন না, শেলির লেখায় থাকলে তাতে ছেলেমানুষির প্রাবল্য কমতো। তাঁর কবিতার আবেদন, আমাদের কাছে, ভাবাবেগের আড়ালে বুদ্ধির এই সর্বব্যাপী অস্তিত্বে। উত্তর সাগর প্রসঙ্গে কবিতাটির সূচনায় তিনি যে 'tiny morsel of reason'* এর উল্লেখ করেন তা প্রভাবে ও তীক্ষ্ণতায় মোটেই শীর্ণ কিংবা দুর্বল নয়।

হাইনের বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন আলোচ্য: কেন তিনি রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচার ক'রেও আধুনিক হলেন না, কী ক'রে রোমান্টিকতা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হয়েছিল ও সবশেষে যদিও তাঁর কাল আমাদের কালের উপমেয়, তবুও তিনি কেন আধুনিক ভাবের কবিতা লেখেন নি।

রোমান্টিকতার দুই দিক—ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভাষার সৃষ্টিকারী ক্ষমতার প্রতি আস্থা—হাইনে এই উভয়েরই বিরোধিতা

"*And as homage I dedicate to thee
The tiny morsel of reason,
That has been compassionately spared me
By thy predecessor in the realm."

করেন। নিজে অনুভূতির দ্বৈত রূপ প্রকাশের ও নিজেকে দূর থেকে দেখবার ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেন, তার মানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। রোমান্টিকতার পরিবর্তে বাস্তববাদকে গ্রহণ করেন তিনি; বাস্তববাদীদের মতো আত্মমুখ ও বিষয়মুখ সত্যের প্রভেদ স্বীকার ক'রে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান থেকে যে-টানের উদ্ভব হয় তারই ব্যবহার তাঁর কবিতার অঙ্গীকৃত।

কিন্তু আধুনিকতা রোমান্টিকতার বিরোধী নয়, বরং একদিক থেকে উভয়ে একই উৎস-জাত ও একই প্রক্রিয়ার, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধের, বিভিন্ন স্তর-বিশেষ। কবি যতকাল নিজেকে বিপ্লবী ব'লে জেনেছেন ততকাল ভাষার ক্ষমতা পরখ করবার সুযোগ (কোলরিজের কবিতা অবশ্য এর ব্যতিক্রম) তাঁর হয়নি। হাইনে, সাধারণত, বিপ্লবীর ভঙ্গি গ্রহণ করেন নি, হয়ত সে জন্যেই ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল ছিল। যতদিন পাঠককে পরিবর্তিত করবার দায়িত্ব বড়ো ছিল ততদিন কবিতায় বার্তার মূল্য ছিল বেশি। কিন্তু আধুনিক কালে কবি এই দায়িত্ব থেকে ছুটি নিয়েছেন ব'লে কবিতাকেও পাঠক স্রষ্টার অধিকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

কী ক'রে রোমান্টিক কবিতা আধুনিক কবিতায় রূপান্তরিত হ'লো, সে-ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ। রোমান্টিক রিভাইভাল-এর শেষদিকে ব্যক্তি তার-স্বাতন্ত্র্যের উৎসের অনুসন্ধানে না-গিয়ে তার প্রকাশভঙ্গির প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। আফিং, অদ্ভুত বেশভূষা, নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি—এই লক্ষণগুলি অনেকের কাছে অন্তর্নিহিত অর্থের চেয়ে মূল্যবান মনে হ'তো। আবার অনেকে, ন্যায্যভাবে, এইগুলিকে রোগের দুর্লক্ষণ মনে করেন, এবং রোগমুক্তির উপায় হিসেবে ব্যক্তিকে তার সংকীর্ণ বোধ থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক চেতনার বিশ্বজনীনতায় প্রবেশ করতে বলেন। কিন্তু কবির সমস্যা প্রধানত রোগমুক্তি নয়, তাঁর সমস্যা কী ক'রে এই পুরোনো, বহুব্যবহৃত লক্ষণগুলিকে অতিক্রম ক'রে কিংবা তারই সাহায্যে সত্যকার নতুন কবিতা লেখা যায়। যে-সময়ে জর্জ সাঁ সমাজচেতনায় রোগমুক্তির উপায় প্রদর্শন করলেন, ঠিক সেই সময়েই বোদলেয়ার তাঁর মৌলিক শিল্পনীতিকে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। রোগ কিংবা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধকে অস্বীকার না-ক'রে, বরং

তীব্রভাবে তাকে মেনে নিয়ে, তিনি চাইলেন রোগাক্রান্ত মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে। কারণ সমস্যার সমাধান কবিকৃত্য নয়; তাঁর কর্তব্য, নিজেকে ক্ষয় ক'রেও যদি হয়, উপস্থিত সত্যকে শিল্পের মধ্যে বিকশিত করা। তাই আধুনিক কবিরা মিসেস রাডক্লিফ, পো এবং কোলরিজের মধ্যে পুষ্টির সঞ্চয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ যাঁরা বিপ্লবের জল-হাওয়ায় বর্ধিত হ'য়ে আত্মকেন্দ্রিকতার অসারতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, শিল্পাতীত তত্ত্বের দিক দিয়ে হয়তো যাঁরা অন্যদের চেয়ে খাটো নন, বিপ্লবের জোয়ার চ'লে গেলে সেই সব শৈলীপন্থী চার্টিস্ট কবিরা—টমাস ওয়েড, টমাস কুপার, জেরাল্ড ম্যাসী, এবেনেজার এলিয়ট প্রমুখ কবিকুল—অনুকূল জলের অভাবে তীরের বালিতে সমুদ্র-পরিত্যক্ত গুল্মের মতো আজ শুকিয়ে গেছেন।

কবিতার ঐতিহ্যের নিজস্ব যে এক গতি আছে তার স্বীকৃতি আমাদের শেষ প্রশ্নের উত্তর জোগাবে। জগতের বর্ণনা শিল্পকর্ম নয়, জগতের অস্তিত্ব কবির ভাবাচেতনায় যে-প্রতিক্রিয়া জাগায় ও সেই আলোড়নের ফলে যে-গড়নটি বেরিয়ে আসে, তা-ই শিল্প। যদি জগতের বর্ণনা করা শিল্পীর দায়িত্ব হ'তো তবে তুলনীয় ঘটনা তুলনীয় শিল্পের জন্ম দিতো। কিন্তু আমাদের মন যে-আকার প্রসব করে তা নির্ভর করে মনের তৎকালীন ভাবাচেতনার উপর, কবিতার ঐতিহ্যের সেই মুহূর্তের পূর্ববর্তী শিল্পকর্মগুলি থেকে আহৃত ধারণার উপর। এই প্রসঙ্গে বিতর্কটি এত পুরোনো ও জরুরি যে শিল্প-অতিরিক্ত উদাহরণ মনে জাগে। মার্গারেট মীড তাঁর একটি বইয়ে তিনটি প্রাচীন জাতির আলোচনা করেছেন যাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশ একই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। জন্ম, মৃত্যু, লোকান্তরবাদ, ধর্ম, সমাজে নারীর স্থান, বয়ঃসন্ধিকালে তরুণ-তরুণীর নিয়ন্ত্রণ, সমাজে কর্মী পুরুষ ও নিষ্কর্মা বৃদ্ধদের সম্পর্ক—প্রত্যেকটি সমস্যা সম্পর্কেই ভিন্ন-ভিন্ন উপায়ে এই তিনটি সংস্কৃতি সমাধান জুগিয়েছে। যদিও একই ভিত্তির উপর সমাজগুলি স্থাপিত তবু জীবনকে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে তারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঠিক তেমনি আধুনিক জীবনের অনুরূপ সমস্যা বিভিন্ন রীতি ও বিভিন্ন ঐতিহ্য নিশ্চয়ই ভিন্নভাবে সমাধান ও রূপায়িত করবে। হাইনে যেকালে জন্মেছিলেন সেকাল হয়তো আধুনিকের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু

ইওরোপীয় ইতিহাসের যে-ক্ষণে হাইনে জন্মেছিলেন সে-ক্ষণে আধুনিক শিল্প ধারণার প্রতিরূপ পূর্ববর্তী শিল্পকর্মগুলি থেকে আহরণ করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সুখের বিষয়, আধুনিক হাওয়াটাই একমাত্র মানদণ্ড নয়। এবং ১৯৫৬ সালে লেখা না-হ'লেই যাদের কাছে কবিতা পাঠযোগ্য হয় না তাঁদের জন্য হাইনে কোনো যুগোপযোগী বুলি, কোনো প্রিয় মিথ্যাচারের ব্যবস্থা রাখেননি। এমনকি, একালের কবিদের সবচেয়ে যা পবিত্র চিন্তা অর্থাৎ কবিতা ও শিল্পের চরিত্র আলোচনা, তা-ও তিনি করেননি। তিনি একস্থানে লিখেছেন যে, তাঁর প্রথম যৌবনে অন্তত, কাব্যচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো তাঁর প্রণয়পাত্রী আমালী হাইনের মনোযোগ আকর্ষণ ও ঈর্ষার উদ্রেক করা। যে-ভাবে পুরুষ-পাখিরা পুচ্ছের বর্ণাঢ্য গৌরবের দ্বারা পক্ষিণীর হৃদয়-হরণ করে। কোনো আধুনিক কবির সম্পর্কে এ-কথা বললে তিনি যদিও অপমানিত বোধ করতেন, অন্য এক সৎ কবির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলে তিনি হয়তো অপ্রীত হতেন না। রবীন্দ্রনাথও 'ক্ষণিকা'য় কবিতাকে বিপদকালের দীন সঙ্গী ব'লে অভিহিত করেছেন; "ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে / বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে / মিষ্টি মুখে ভুবন ভরা হাসি / ওষ্ঠশেষে ওজন দরে মিলে" তখনই শুধু "কথার সাথে গাঁথো কথার মালা / মিলের সাথে মিল মিলাও মিল।" কিন্তু যদি "অরুণ চোখে তরুণ ফোটে হাসি" তখন খাতা পোড়াও, ক্ষ্যাপা কবি, দিলের সাথে দিল লাগাও দিল।""ক্ষণিকা"র সঙ্গে হাইনের শিল্পাচারের অনেক তুলনীয় গুণ লক্ষ্য করা চলে। "ওষ্ঠশেষে ওজন দরে হাসি" এই লাইনটির চতুর হাস্যরস, নিজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি ও স্বাভাবিক বাচনভঙ্গির মধ্যে হঠাৎ ঐ 'দিল' শব্দটির আমদানি থেকে অনুসন্ধান করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ হাইনের রহস্য জানতেন।

এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারো অবশ্য হাইনের কবিতার অনুশীলন থেকে সোজাসুজি পুষ্টি আহরণ করবার ক্ষমতা ছিল না। কারণ নিজেকে ও শিল্পকে এভাবে অতিক্রম করতে গেলে নিজের ব্যক্তিত্বের শিকড়কে কোনো শিল্প-অতিরিক্ত ও ব্যক্তি-অতীত গভীরে প্রবিষ্ট করতে হয়। অন্যদিকে আধুনিক শিল্পীকে হাইনে যেমন কিছু বিষয়, কিছু অপরিণত উপাদান জুগিয়েছেন, ঠিক তেমনি রোমান্টিক ভাবালুতার ও আতিশয্যের বিরুদ্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

নিজের শিল্পকর্মের মধ্যে রোমান্টিক বিরুদ্ধাচারের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ ক'রে দিয়ে আধুনিক কবিকে অন্য দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছেন। তিনি যে-ভাবে নিজের ক্ষয় ক'রে ভবিষ্যৎকে পুষ্ট করেছেন, তাঁর জীবনের শেষ কয় বছর যেন তারই প্রতীক। এগারো বছরের মধ্যে তাঁকে তিনবার চিকিৎসকেরা জানায় যে মৃত্যু তাঁর আসন্ন। ফীনিক্স পাখি যেমন তার চিতার মধ্য থেকে উঠে আসে, তিনি তিন বার তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে উত্থিত হন।

শুধু কোনো দৃষ্টান্ত হিসেবে নন, আধুনিক কবিতার প্রশস্তির উপলক্ষ্যে কিংবা কোনো সমসাময়িক ফ্যাশানের উৎস ব'লেই তিনি মূল্যবান নন। একশো বছর পরেও হাইনের কবিতা আমাদের আনন্দ দেয়। তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ এই যে, তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা কবিতাটিতে বিবৃত মাছির মতো, আমরা একবার তাঁর কবিতা থেকে জীবন ও জীবন থেকে কবিতার উপর এসে ব'সে পরিতৃপ্তির ভোজ আজও সংগ্রহ করতে পারি।

ডিলান টমাস

(১৯১৪-১৯৫৩) **নরেশ গুহ**

অবিরাম মদ্যপানজনিত বিষের ক্রিয়া থেকে অচৈতন্য অবস্থায় মার্কিন হাসপাতালে ডিলান টমাসের মৃত্যু হোলো। ইয়েটস-এর পরে ইংরেজি লিরিক কবিতায় তাঁকে আমরা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ব'লে মেনেছিলাম। চল্লিশ না-পেরোতেই তাঁর এই অপমৃত্যু তাই কঠিন শোক হ'য়ে বিঁধেছে। কারো কারো অনুমান এ-মৃত্যু স্বেচ্ছাকৃত। সুনীতির যাঁরা প্রতিপালক তাঁদের ধিক্কার সত্ত্বেও বলব—তিনি বেঁচে থাকলে সুখী হতাম, কিন্তু তাঁর মতো কবির পক্ষে আর কোনো মৃত্যুই যেন মানাতো না।

আমাদের কালে যৌবনেই কবিদের অবলম্বন প্রজ্ঞাপ্রস্থান। হয় তাঁরা কবিতায় মানুষের উপকারসাধনে বদ্ধপরিকর, নয়তো দুর্মুখ পেশল পৃথিবীতে শিল্পের স্বরাজ্যস্থাপনে শ্রমশীল। তাঁদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, তাঁরা ভাবুক, তাঁদের কল্পনা সৎচিন্তার অনুগামী। কিন্তু আরো একশ্রেণীর কবি আসেন পৃথিবীতে, জীবনকে ভালোবাসলেও দুরারোগ্য নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় জ্বলতে-জ্বলতে ফুরিয়ে যান যাঁরা, আমরা যাঁদের চরিত্রকে ঠিক সামাজিক আদর্শ ব'লে গণ্য করতে পারি না, সন্দেহ করি, কখনো ঘৃণা করি, বলি উদ্ধত, দুর্বিনীত, নির্দয়,—কিন্তু অসহায়,—কখনো বলি সমাজের শত্রু। যা-কিছু প্রচলিত সংস্কার তাকে তাঁরা হেলায় উপেক্ষা ক'রে চ'লে যান, এবং কোনো শর্তেই পৃথিবীর সঙ্গে সন্ধি হয় না তাঁদের। প্রথম দলে যদি এলিঅট, অডেন, দ্বিতীয় দলে ব্লেক, র‍্যাঁবো, ইয়েটস, ডিলান টমাস। প্রথম মহাযুদ্ধের অপরাহ্নে বাল্যকাল, এবং তিরিশের যুগের অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন অনগ্রসর ওয়েলস্ প্রদেশে কৈশোর কাটালেও ডিলান টমাসের কবিতায় সমাজ-হিতৈষণার অভাব বিস্ময়কর। কেন তিনি কাব্যচর্চায় নিরত, তার কারণে দেখিয়ে বলেছেন :

'These poems, with all their crudities, doubts, and confusions, are written for the love of Man and in praise of God, and I'd be a damn' fool if they weren't.'

অন্যত্র এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলেছেন কবিতায় :

> Not for the proud man apart
> From the raging moon I write
> On these spindrift pages
> Not for the towering dead
> With their nightingales and psalms
> But for the lovers, their arms
> Round the griefs of the ages,
> Who pay no praise or wages
> Nor heed my craft or art.

সমসাময়িক কবিকুলের সঙ্গেই নয় শুধু, ইংরেজি কাব্যের কোনো ঐতিহ্যের সঙ্গেই এ-কবিতা মেলে না। সাম্প্রতিক কবিতার তির্যক বিন্যাসে অভ্যস্ত যাঁরা, তাঁদের কাছেও ডিলান টমাসের বেশির ভাগ কবিতা অস্বচ্ছ এবং আচ্ছন্ন লাগতে বাধ্য। কিন্তু সব দুরূহতা আর অভিনবত্ব নিয়েও আধুনিক মনের এমন কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই তিনি মেটাতে পেরেছিলেন, যার ফলে শুধুমাত্র সমব্যবসায়ী মহলেই তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়িয়েছে তা নয়, বাইরে বৃহৎ জনতার মধ্যেও তা ঢেউ তুলেছিল। মার্কিন দেশে তাঁর কাব্যপাঠের সভা থেকে অকৃপণ বেগে অর্থাগমের এ-রকম মানে করলে ভুল হবে যে লোকেরা তাঁর দেবদূতের মতো দেহসৌষ্ঠব দেখতে অথবা কিন্নরকণ্ঠের আবৃত্তি শুনতেই শুধু ভিড় করতো। দেখতে তিনি সুপুরুষ ছিলেন নিশ্চয়ই। এবং ও-গুণ যদিও কোনো অজ্ঞাত কারণে কবিমাত্রেই অল্পাধিক উপস্থিত, তিনি আরো বেশি কান্তিমান ছিলেন সন্দেহ নেই। এডিস সিটওয়েলের প্রৌঢ় বয়সী চোখকে যদি বিশ্বাস করি :

> He was not tall, but extrenely broad, and gave an impression of extraordinary strength, sturdiness, and superabundant life. (His reddish amber curls, strong as the curls on the brow of a young bull, his proud, but not despising, bearing, emphasised this.) Mr. Augustus John's portrait of him is beautiful, but gives him a cherubic aspect, which, though pleasing, does not convey, to the present writer at least, Dylan's look of archangelic power.

কিন্তু নিছক দেহসৌষ্ঠবই কোনো কবিকে আমাদের প্রিয়জনে পরিণত করতে পারে না। আমরা তাঁর কবিতাকে ভালোবেসেছিলাম, কেননা সে কবিতায় যে-স্বাশ্রয়ী স্বতন্ত্র জগতের সন্ধান পাই, পরিচিত বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ যদিও নামমাত্র, তবু ভ্রমণের ফলে অভিজ্ঞতার এক অপূর্বতা নিয়ে ফিরে আসি আমরা। সেই অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে হানা দিয়ে ফেরে এবং তার প্রভাবে জীবনকেও আমরা অন্য ভাবে ভালোবাসতে শিখি।

18 Poems নামে তাঁর প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল ১৯৩৪ শালে। তার বারো বছর পরে চতুর্থ এবং শেষ বই বেরোয় Deaths and Entrances। মৃত্যুর আগের বছরে প্রকাশিত তাঁর সমগ্র কবিতার সংগ্রহে এই বারো বছরে লেখা ৮৪টি কবিতা ছাড়া শুধু একটি মুখবন্ধ এবং পাঁচটি রচনাকে তিনি স্থান দিয়েছেন। কলাকৌশলের দিক থেকে মুখবন্ধের এই কবিতাটিতে একটি আশ্চর্য ধৈর্যশীল পরিশ্রমী কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৪২ লাইনের এই কবিতায় ৫১ আর ৫২ লাইনের পদান্ত মিল সব চাইতে নিকটবর্তী। বাকি মিল সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে আরম্ভ এবং শেষের দিকে ক্রমে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে প্রথম পদের মিল দিয়েছেন তিনি কবিতার সর্বশেষ পদের সঙ্গে। এবং আশ্চর্য এই যে কলাকৌশলে অত্যধিক মনোনিবেশের পরিণামে রচনাটি নিছক অনুশীলনে পর্যবসিত হয়নি, কবিতাই হয়েছে। সংগ্রহে বর্জিত কিছু বাল্য এবং কৈশোর রচনা ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কবি নিজে যাদের রক্ষণযোগ্য ব'লে স্বীকার করেছিলেন তার প্রথম কবিতা থেকেই পাঠককে ধাক্কা খেয়ে চোখ-কান সজাগ ক'রে তুলতে হয়। অধিকাংশ কবিতারই স্বতন্ত্র কোনো নাম নেই, প্রথম পংক্তিকেই নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কদাচিৎ নাম দেওয়া থাকলেও Poem in October কিংবা Poem on His Birthday ধরনের নাম থেকে কবিতার উদ্দেশ্য অনুমান করা কঠিন। তবে অক্টোবর তাঁর জন্মমাস, আর সেই জন্মমাসকে অবলম্বন ক'রে লেখা কবিতার সংখ্যা থেকে বোঝা যায় জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর অদৃশ্য গোপন আর রহস্যময় প্রক্রিয়া তাঁর কবিচেতনাকে কতদূর আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। ডিলান টমাস নরনারীর প্রেমনিয়ে কবিতা লেখেন নি। প্রেমের কচিৎ প্রসঙ্গে তাঁর কবিতা বরং বিদ্রূপে-

শাণিত হয়েই উঠেছে, যার প্রমাণস্বরূপ 'Our eunuch dreams' কবিতার একাংশ তুলে দিই :

In this our age the gunman and his moll,
Two one-dimensioned ghosts, love on a reel,
Strange to our solid eye,
And speak their midnight nothings as they swell ;
When cameras shut they hurry to their hole
Down in the yard of day.

তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা নেই, বলতে গেলে কোনো কিছুরই তন্ময় বর্ণনায় তিনি আগ্রহ দেখান নি। জীবন নামক এই যে আবদ্ধ অস্তিত্বটুকু, মাতৃগর্ভবাসেরও পূর্বে এবং ধূলিকণায় পর্যবসিত হওয়ার পরেও যার জটিল গ্রন্থি কিছুতেই খোলে না, তার স্বরূপ কল্পনাতেই তাঁর জীবন কেটে গেল। 18 Poems-এর অন্তর্গত প্রায় সব কবিতার প্রসঙ্গই জন্মমৃত্যুর প্রক্রিয়া। তা ছাড়াও শেষ পর্যন্তই কবিতার পর কবিতায় জন্মের, মৃত্যুর—বিশেষত মৃত্যুর প্রসঙ্গ উপস্থিত : And death shall have no dominion, After the funeral, A saint about to fall, If my Head Hurt a Hair's Foot, Twenty four years, A refusal to mourn the Death, Poem in October, Do not go gentle into that good night, Over Sir John's Hill, Poem on his birthday.

২

এমন নয় যে পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ছিল না। কবিতার মতো গল্পে উপন্যাসেও তাঁর প্রধান উপাদান স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা। সেই সব চমকপ্রদ কাহিনীর বিন্যাসে আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে অপর চরিত্র, দৃশ্য এবং ঘটনারও আশ্চর্য নিপুণ বর্ণনা দেখা যাবে। তাঁর গদ্য রচনার ছন্দও সহজে ভোলবার নয়। কিন্তু গদ্যের এই স্বচ্ছতার পরিবর্তে কবিতায় সবটাই ঝাপসা, যেন দূর-থেকে দেখা কুয়াশার পর্দা ঠেলে পাহাড়তলির শহর আলোয় বেরিয়ে আসতে গিয়ে পারছে না। সমসাময়িক আরো অনেকের মতো তাঁর

কবিতা ব্যক্তিগত কিংবা অজ্ঞাত উল্লেখে কণ্টকিত নয়। কিন্তু তাঁর বাক্য-যোজনা দুরূহ, ছেদচিহ্নের ব্যবহার নিয়মভাঙা, এবং শব্দের অনভ্যস্ত ব্যবহার সময়-সময় জয়স-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। বাধা হিসেবে এর কোনোটাই অবশ্য দুর্লঙ্ঘ্য নয়। আসল বাধা উপস্থিত হয় তারও পরে যখন তাঁর ভাবনার আলো-আঁধারিতে ঢুকে আমরা থমকে দাঁড়াই। জানা পৃথিবীর কোনো মানচিত্রই সেখানে কাজে লাগে না। অথচ বুঝতে পারি রুদ্রভয়ংকর অথচ কোমল সুন্দর জীবনের এক পরম সত্য রূপ সেখানে উন্মোচিত হয়েছে। বাস্তবকে অবলম্বন ক'রেই কবির কল্পনা কতদূর রূপান্তরিত জগতের রচনা করতে পারে তার এক চরম দৃষ্টান্ত ডিলান টমাসের কবিতা। তুলনায় অডেন-এর কবিতা বুদ্ধি আর বিশ্লেষণের কাছে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

ডিলান টমাসের সমজাতীয় কবি বরং ব্লেক,

that William Blake
Who beat upon the wall
Till Truth obeyed his call.

শব্দের প্রচলিত অর্থ আর ব্যঞ্জনা নিয়ে যাঁর শেষজীবনের কবিতায় প্রয়োজন মেটেনি, ভাষাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে মস্ত বিপ্লবের কাণ্ড করতে হয়েছে। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়েই ব্লেক তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন :

'When I am Commanded by the Spirits then I write, and the moment I have written, I see the words fly about the room in all directions. It is then published. The Spirits can read and my MS is of no further use. I have been tempted to burn my MS, but my wife won't let me.'

ব্লেকের চাইতেও ডিলান টমাসের নিকট আত্মীয় র‍্যাঁবো। র‍্যাঁবোর মতোই তিনিও নির্দয় আত্মপীড়নের পথে তাঁর কবিপ্রতিভার মুক্তি খুঁজে-ছিলেন। বাহিরে রূঢ়তার আবরণে দুজনেই মনের মধ্যে শিশুর নিষ্পাপ কমনীয়তাকে লালন করেছেন, এবং দুজনের কেউই বাস্তব পৃথিবীর রীতিনীতি মেনে নিয়ে কাব্যরচনা করতে বসেননি, তার জন্য নির্ভর করেছেন তাঁদের বাঙ্ময় মনোজগতের উপরে, তীব্র কঠোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কর্ষণে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে সেই মনোলোকে দুরারোহ সুন্দরের ফুলকে তাঁরা ফুটিয়েছিলেন।

ঐতিহ্য থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন না-নিলেই তাঁদের চরিত্রহানি ঘটতো। সোয়ানসী গ্রামার-স্কুলের মাননীয় শিক্ষকতনয় ডিলান টমাস তাই নীতি আর সংস্কৃতির কৌলীন্যকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলেছেন। শোনা যায় তাঁর হাতের নখ অসম্ভব নোংরা থাকতো, ভদ্র পোষাকআসাকেরও বড়ো ধার ধরতেন না। এবং অভিজাত মহলের সাহিত্যিক আড্ডায় বসে অনর্গল যে-সব কুকথার ব্যবহার করতেন তা সচবাচর ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য। হার্ভার্ডের মতো সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সারবান সাহিত্য আলোচনার পরিবর্তে তাঁর মুখে অশ্লীল রসিকতার গন্ধ পেয়ে একে-একে তাঁর সম্বর্ধনাসভা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন ব'লেও শোনা যায়। এ ছাড়া মদ্যপানে তাঁর কোনোকালেই ক্লান্তি ছিল না। বি. বি. সি থর্ড প্রোগ্রামে কবিতা পড়বেন : পাঠ সুরু হওয়ার বিশ সেকেণ্ড আগে মাইকের সামনে তাঁকে মত্ত অবস্থায় নিদ্রিত দেখা গেছে। বেতার শ্রোতাদের ভাগ্য বলতে হবে যে, জাগিয়ে দেবার পর প্রায় নির্ভুলভাবেই সেদিনের কবিতা পাঠ তিনি শেষ করেছিলেন। শুধু কবিতার নাম পড়েছিলেন "শেন্ট শিশিলিয়াস ডে" যদিও তার কারণ ভিন্ন। নির্ভুল ছন্দের সতর্ক কবিকুলকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ড্রাইডেনকে তো নয়ই।

কিন্তু এ-তো ছবির উল্টো দিক। একে তুচ্ছ করাই উচিত। তাঁর মার্কিন দেশ ভ্রমণের সাহিত্যিক ঘটক জন ব্রিনিন অভদ্র তৎপরতার সঙ্গে তাঁর যত কুকীর্তির কথাই ফাঁস করুন না কেন, কবির স্ত্রী এ-বিষয়ে তাঁর যে-মত ব্যক্ত ক'রেছেন সেটাই আমরা গ্রহণ করব :

'There is no such thing as the one true Dylan Thomas, nor anybody else ; but, necessarily, even less so with a Kaleidoscopic-faced poet.'

তাঁর মতো অস্থির প্রতিভাকে অল্পকালের জন্য হ্রস্বদৃষ্টিতে দেখে সুবিচার করা অসম্ভব। স্বীয় জীবনকে ইন্ধন ক'রেই তিনি তাঁর কবিতার আগুন জালতে চেয়েছিলেন। রচনার মূল্য ভুলে জীবনের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে সেটা অন্যায় হবে। নতুন ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। এবং নিজের কবিতায় তিনি এক দুর্লভ সিদ্ধি নাই যদি লাভ করতেন তাহলে তার অকালমৃত্যুর বেদনা ইংরেজি কাব্যে আর-একটি অবিস্মরণীয় এলেজির কিছুতেই উপলক্ষ্য হ'য়ে উঠত না, সিটওয়েল যে এলেজির উপসংহারে লিখেছেন :

...There, in the maternal
Earth, the wise and humbling Dark, he lies—

The emigrant from a forgotten paradise—
The somnambulist
Who held rough Ape-dust and a planet in his fist

Far from the empires of the human filth...

So, for his sake,
More proudly will that Sisyphus the heart of Man
Roll the Sun up the Steep of heaven, and in the street
Two old blind men seem Homer and Galileo—blind
Old men that tap their way through worlds of dust
To find Man's path near the Sun.

সমালোচনা

বুদ্ধদেব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। ১৷৷৹

বুদ্ধ-প্রসঙ্গ : মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। ৷৷৹

হিন্দু আইনে বিবাহ : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। ৷৷৹

বৌদ্ধধর্ম ভারতে উদ্ভূত হ'য়েও ভৌগোলিক ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছিন্ন হ'লো কেন, ইতিহাসের এটি একটি বড়ো সমস্যা। তার কারণ কি হিন্দুর শোষণ-শক্তি, না বৌদ্ধের কোনো দুর্বলতা, কোনো রাজশক্তি, শঙ্করের প্রতিভা, না কি বৌদ্ধ বিহারে আত্মভেদ বা অবক্ষয়? এ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা বহু প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু কয়েকটা সাধরণ তথ্য প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে আজ পর্যন্ত সুস্পষ্ট; (১) বৌদ্ধধর্ম এ-দেশে না-থাকলেও বুদ্ধের স্মৃতি এ-দেশে জীবন্ত, কেননা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অমর নিদর্শনে তা বিধৃত হ'য়ে আছে; (২) বুদ্ধকে বিধর্মী মনে করা, বা ভক্তি না-করা আধুনিক হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়; (৩) যেমন বুদ্ধ নিজে জৈন ঐতিহ্যের কাছে ঋণী, তেমনি পরবর্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মানসকে অংশত আত্মসাৎ করেছিলেন, এবং (৪) বুদ্ধের কোনো-কোনো ধারণার সঙ্গে বৈদান্তিক ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরো একটি কথা ভারতবাসীরা সাধাণভাবে অনুভব ক'রে থাকে; সেটাই বেশি জরুরি, এবং ভারতে এই ধর্মের লুপ্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বৌদ্ধধর্ম নঙর্থক; তার লক্ষ্য কেবল নির্বাণ, বা শূন্যতা বা অস্তিত্বহীনতা। ধর্মের কাছে মানুষের দুটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা থাকে; প্রথমত, তা ভগবানের সঙ্গে তার একটি সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দেবে; দ্বিতীয়ত, তা দেবতা বা সন্ত বা অবতারের রূপে তাকে দেবে এমন কোনো অক্ষয় আধার, যেখানে সে পূর্ণ ভক্তি অর্পণ করতে পারে। এ ছাড়া নীতিধর্মও ধর্মের অন্তর্গত, কিন্তু সেটা তার গৌণ উদ্দেশ্য। মানুষ তার দৈনন্দিন ব্যবহারগত জীবন কী-ভাবে কাটাবে, সেটা সংহিতার (আধুনিক ভাষায় আইন) প্রদেশভুক্ত, ধর্মের মহত্তম সার্থকতা সেখানে নেই। অথচ বুদ্ধের বচন অধিকাংশই নীতিধর্মের উপদেশ; তিনি ভক্তির কোনো পাত্র তুলে

ধরেননি, ভগবান বিষয়ে নীরব ছিলেন, এবং নিষ্কাম কর্মের মতো কোনো সূত্রও দেননি, যাতে মানুষ তার কর্মকেই পূজা ব'লে জ্ঞান করতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম নঙর্থক; রবীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থটি এই কথারই প্রতিবাদ করছে। বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকেই ভক্তির পরম আধার রূপে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলো, কোনো-একজন মানুষকে এমন পূর্ণ ক'রে দেখা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম, এবং যীশুকে ভগবানের পুত্র রূপে ঘোষণা করার মধ্যেও হয়তো বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে—এই হ'লো রবীন্দ্রনাথের মত। খৃষ্টধর্মে ভগবান স্বতন্ত্র এবং পরিব্যাপ্তরূপে বিরাজ করছেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে অমিত বুদ্ধ আর ভগবানকে প্রায় অভিন্ন ক'রে দেখা হয়েছে, এই প্রভেদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে কোনো আলোচনা নেই। ভক্তি আর সর্বভূতে প্রেম, বৌদ্ধধর্মের এই দুটি দিক তাঁর রচনায় উজ্জ্বলভাবেপ্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রেম বলছেন, বৌদ্ধ পরিভাষায় তার নাম অহিংসা, সেটাও নঙর্থক বস্তু, বৈষ্ণবের, 'গীতাঞ্জলি'র, মিস্টিকের প্রেম নয়। এই অহিংসার ন্যায়সম্মত চরম পরিণতি কোথায়, জৈনদের মধ্যে এখনো তার উদাহরণ বিরল নয়।

অবশ্য 'বুদ্ধদেব' রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিকল্পিত কোনো গ্রন্থ নয়; বুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি যা লিখেছিলেন বা বলেছিলেন, তা-ই সংগ্রহ ক'রে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা হ'লো। তিনটি রচনা ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি, অন্যগুলি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রণ, কয়েকটি খণ্ড-রচনাও স্থান পেয়েছে। অনিবার্য কারণেই, বইটিতে একটা অগোছালোভাব এড়ানো যায়নি; অনেক পুনরুক্তি আছে, কোনো-কোনো প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'য়েই অকস্মাৎ শেষ হ'য়ে গেছে। কোথাও-কোথাও বানান বিষয়েও সন্দিহান হ'তে হয়; ৬২পৃষ্ঠায় 'এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে'; —'শুধু' হ'লে কথা ছিলো না, কিন্তু 'শুদ্ধ মানুষ' লিখলে 'বিশুদ্ধ (পবিত্র) মানব' মনে হ'তে পারে; আমরা যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ (অন্তত উত্তর-জীবনে) 'only' বা 'also' অর্থে 'সুদ্ধ' ব্যবহার করতেন। এই বিভেদ বাংলা ভাষার পক্ষে উপকারী হয়েছে, একে আজকের দিনে প্রত্যাহার করা যায় না। 'আবির্‌ভূত' এবং 'সম্‌প্রদায়' বানান দেখে আমরা মর্মাহত হয়েছি—এবং এতে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি থাকতে পারতো, তাও কল্পনা করা আমাদের পক্ষে

দুঃসাধ্য। এই চক্ষুশূল উন্মূলিত করার জন্য আমরা বিশ্বভারতীকে আবেদন জানাই। 'সংগে', 'গংগা', 'অংগ' প্রভৃতি অশিক্ষিত বানান দেখে-দেখে আমরা এমনিতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, তার উপর রবীন্দ্রনাথের নাম যেন এই বিশৃঙ্খলার সমর্থন না করে।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও তাঁর দ্বারা উদ্ধৃত মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)-এর বৌদ্ধধর্মবিষয়ক রচনাবলী পুস্তিকার আকারে প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী একজন যোগ্য ব্যক্তির স্মৃতিকে যথাসময়ে যথোচিত সম্মান দিয়েছেন। পুস্তিকাটি তিন অংশে বিভক্ত; 'গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত', 'গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি' ও 'নির্বাণতত্ত্ব'। ধর্মশাস্ত্রে শুশ্রূষুর পক্ষে শেষ অংশটি সবচেয়ে মূল্যবান; তাতে উপনিষদ্ ও বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা আছে, যার পরিশেষে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।' এই মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার মতো যোগ্যতা বর্তমান লেখকের নেই; কিন্তু বুদ্ধ যদি শুধু উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি ক'রে থাকেন বা নামান্তরে তার ভিন্ন প্রকরণ প্রণয়ন ক'রে থাকে, তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়। রবীন্দ্রনাথের এ-কথাটা খুবই সত্য যে ধর্মকে জীবনের মধ্যে দেখতে হয়, শুধু শাস্ত্র প'ড়ে তার সত্যকে বোঝা যায় না। তাছাড়া, বৌদ্ধকে একান্তভাবে পালিশাস্ত্রনির্ভর ভারতবর্ষীয় ধর্ম মনে করাও ভুল; আজকের দিনে তা যেখানে সপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল, সেই দূরতর প্রাচ্যের জেন্-এর কথাও ভাবতে হবে। ভারতবর্ষে নয়, আমিষাশী জাপানির প্রবর্তিত জেন্ ধর্মেই বৌদ্ধ ধারণা সত্যিকার নূতন ভাবে বিকশিত হয়েছে, চীন-জাপানের চিত্রে ও কাব্যকলাতেও তার পরিচয় পাই; সেই ধারা বাদ দিয়ে বৌদ্ধধর্মের কোনো যথাযথ আলোচনা হ'তে পারে না। আলোচ্য গ্রন্থ দুটি প'ড়ে বাঙালি পাঠক অনেক শিখবেন, কিন্তু জেন্ বিষয়ে কোনো বাংলা গ্রন্থ এতদিনে রচিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় যে-কোনো বিষয়কে সরস ক'রে তুলতে পারেন, 'হিন্দু আইনে বিবাহ' তার ব্যতিক্রম নয়। পুস্তিকাটি অতীব সুখপাঠ্য, সেই সঙ্গে তথ্য বিষয়ে সারবান। মনু থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৫৪ সালের বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা-সংবলিত স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট: এই সবগুলি

বিধানের বর্ণনা অল্প পরিসরে পরিবেশন করার জন্য আইনের জ্ঞানই যথেষ্ট ছিলো না, লিখতে জানারও প্রয়োজন ছিলো। হিন্দু ধর্মের সনাতনী ব'লে অপবাদ আছে, কিন্তু এই পুস্তিকা তার পরিবর্তনশীলতারই একটি দলিল।

বু. ব.

চিঠিপত্র

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

'কবিতা'র গত চৈত্র সংখ্যায় 'বাংলা সনেট' বিষয়ে শান্তিকুমার ঘোষের পত্রটি আলোচনার অবকাশ রাখে। বুদ্ধদেব বসুর সনেটের অভিনবত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সনেট ও ছন্দ সম্পর্কে তিনি যে-সব উক্তি করেছেন, তা প্রায়ই অস্পষ্ট এবং বাংলা ছন্দের রূপভঙ্গির (pattern) অনুযায়ী নয়।

শান্তিবাবু লিখেছেন, 'তিন-তিন-দুই-মাত্রার বদলে এখানে তিন-দুই-তিন মাত্রার পর্বাঙ্গে নিশ্চয়ই বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে।' বৈচিত্র্য হয়তো প্রকাশ পেয়েছে কবির বাচন-ভঙ্গিতে, কিন্তু শান্তিবাবুর কি জানা আছে যে পর্বাঙ্গে তিন-দুই-তিন, এই অনিয়মিত মাত্রাবিন্যাস বাংলা ছন্দে অচল? বাংলা ছন্দে ক্রমের বিন্যাস নিয়মিত। জোড় মাত্রার পর দুটি বিজোড় মাত্রা, দুটি বিজোড় মাত্রার পরে জোড় মাত্রা, অথবা দুটি বিজোড় বা দুটি জোড় মাত্রা দিয়ে গঠিত হয় পর্বাঙ্গ। দুই-তিন-তিন, তিন-তিন-দুই, তিন-পাঁচ, তিন-দুই-চার ইত্যাদি মাত্রার ক্রমবিন্যাসে বাংলা ছন্দের পর্বাঙ্গ গঠিত। অসম মাত্রার অনিয়মিত বিন্যাস যে অচল, সে-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

'তিন-দুই-তিন' মাত্রার নমুনা হিসাবে শান্তিকুমার যে-পংক্তি উদ্ধার করেছেন, তাতে তাঁর অনভিজ্ঞতাই সুস্পষ্ট ব'লে মনে হয়। 'বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয়' এই পংক্তির 'বাসনা অপরিসীম'কে শান্তিবাবু বোধ হয় তিন-দুই-তিন মাত্রা দিয়ে পড়তে চান। কিন্তু- 'অপিরসীম' দুই-তিন মাত্রায় বিভক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে পাঁচ মাত্রা। আর 'বাসনা অপরিসীম'কে যদি ভেঙেই পড়তে হয় তবে দেখবো 'বাসনা'র সঙ্গে 'অপরিসীম'-এর 'অ' যুক্ত হয়ে চার মাত্রা ক'রে দিয়েছে।

শান্তিবাবু লিখেছেন, 'আঠারো মাত্রার পংক্তিবিশিষ্ট সনেট (যার ফাঁকে-ফাঁকে বাইশ মাত্রার লাইনও চোখে পড়ে) থেকে আরম্ভ ক'রে মাত্র দশ মাত্রার ছোটো নিখুঁত অনন্য সনেট পর্যন্ত প্রায় সব রকম উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে পাওয়া যাবে।' সনেটে আঠারো মাত্রার ফাঁকে-ফাঁকে যদি বাইশমাত্রার পংক্তি থাকে, তবে তাতে সনেটের প্রকরণে অভিনবত্ব এলেও, সনেটের মূল বৈশিষ্ট্য, সংহতি ও গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়। আর, ছন্দবৈচিত্র্য কি সার্থক সনেট রচনার আনুকূল্য করে? বাইশ মাত্রার পংক্তিতে প্রবহমান পয়ারের ঠাট চ'লে আসে, তাতে সৃষ্টি হয় সুরের, এবং বহুলাংশে লিরিকের ভাব এসে সনেটের দৃঢ় ভঙ্গিমা এবং ঋজুতা নষ্ট ক'রে দেয়। আঠারো মাত্রার পংক্তিবিশিষ্ট সনেট বাংলা ভাষায় চলতে পারে, তার বেশি মাত্রা আনতে গেলেই সনেট আর সনেট থাকে না, চতুর্দশাপদী কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ছান্দসিকের বিশ্বাস (অবশ্য লিখিতভাবে অনেকেই তাঁদের মত পেশ করেন নি) বাইশমাত্রাকে এক পংক্তিতে ঠাসা চলে না। বাইশ মাত্রা এলে তা আর একপংক্তিবিশিষ্ট থাকে না, অন্য পংক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গ আলোচনাসাপেক্ষ এবং বর্তমানে বিষয়ের বহির্ভূত।

দশ-মাত্রার পংক্তিবিশিষ্ট সনেটগুলিও অনেক সময় সনেট-মর্যাদা-সম্পন্ন হয় না। তার কারণ সনেটকারের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য দশমাত্রার স্বল্প পরিসরে স্থাপিত হতে পারে না। যে-সনেটে কবির ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত, সে-সনেট সনেট নয়, অন্য আর-কিছু। দশ-মাত্রার পংক্তি নমনীয়, কঠিন নয়। পংক্তি ঋজু না-হলে সনেটরচনা ব্যর্থ। দশ মাত্রায় যে-sonnet-sequence রক্ষিত হয় না, তার প্রমাণ 'আটচল্লিশের শীতের জন্য' কবিতাটির তিন নম্বর কবিতা। সনেটের পক্ষে চোদ্দ ও আঠারো মাত্রার পংক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে ছান্দসিক এবং কবিরা মত দিয়ে থাকেন।

বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক সনেটগুলি আলোচনার অযোগ্য নয়। তাদের প্রকরণ এবং লিপিচাতুর্যে যে-অভিনবত্ব আছে, তা নিঃসন্দেহে মৌলিক, কিন্তু মৌলিক হ'লেই তার সাফল্য সর্বদা সন্দেহাতীত হয় না।

জলপাইগুড়ি

কার্তিক লাহিড়ী

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

আষাঢ় সংখ্যা 'কবিতা'য় পুস্তক-সমালোচনা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি। অধুনা-প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির সমালোচনা-বিভাগে শুধু বিশেষত্ব-বর্জিত 'neither to bury Caesar, nor to praise him'-রীতি অনুসরিত হতে দেখা যায়, কিন্তু শ্রী জ্যোতির্ময় দত্তের দ্ব্যর্থহীন সাধুভাষণ বর্তমানের তরুণ কবিদের অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করবে আশা করলে অন্যায় হয় না। আমরা যারা মধ্যপন্থী সমালোচনার কুসুমিত প্রলেপকেই এতকাল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত, এই লেখকের রূঢ় সত্যবাদিতা তাদের অনেকের কাছে পীড়াদায়ক হলেও প্রেরণামণ্ডিত হবে।

একথা হয়ত ঠিক যে বর্তমানে কবিযশোপ্রার্থী তরুণদের অনেকের মধ্যেই সম্ভাবনা আছে, তবুও সিদ্ধির ক্ষেত্রে বেশির ভাগই তাঁরা খণ্ডিত। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় কিংবা খ্যাতির বিড়ম্বিত বাসনায় অনেকেই স্ব-স্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনোরূপ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন বোধ করেন না। যে নিয়ম, নিষ্ঠা এবং ধৈর্যশীল সংযম থাকলে স্রষ্টা তার সৃষ্টির স্বল্পতার মধ্যেও অর্থময় হয়ে ওঠেন, তা অনেকেরই নেই। যে-সাহিত্য 'বনলতা সেন', 'সংবর্ত' বা 'পালা-বদলের' মতো কাব্যগ্রন্থে ভাস্বর, সেখানে এ-ধরনের ক্রমিক অবনতি দেখে নৈরাশ্য এড়ানো যায় না। কবিতা-লেখা শিক্ষার প্রয়োজন তাই স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

শ্রী দত্তের প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য। বৈপ্লবিক ভাষাচেতনাই যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন আলোকের সন্ধান দিতে সমর্থ, সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। নির্বিকল্প চিত্তে এ-সত্য স্বীকার ক'রে নিলে অনেক কবিই উপকৃত হবেন। বিশেষ ক'রে কবিতার একটি নিজস্ব ম্যাজিক আছে। প্রতিভশালীর হাতে কবিতা শুধুমাত্র শব্দের সুপ্রয়োগ নয়, এক ইন্দ্রজালিক প্রভাব, যার বলে কবিতা এক লোকাতীত সত্যে সিঞ্চিত হয়। "অকবির ধারণা, শিল্পীর দায়িত্ব সাংবাদিকের, শিল্পের অনন্যতা তাই তার বোধগম্য হয় না, বক্তব্য ও প্রকরণের প্রভেদ তার কাছে এতই স্পষ্ট। সৎকবি এর প্রত্যেকটি ধারণাকে অস্বীকার করেন, কারণ শিল্পকে তাঁর মনে হয় অজ্ঞাতপূর্ব চেতনার

ভাষার স্বভাবের সাহায্যে বিকাশ, শিল্পকর্মটি জন্ম নেবার পূর্বে যে-চেতনার স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব ছিল।”

অনেকে ব'লে থাকেন, বর্তমান যুগ শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয়। কী কবিতা, উপন্যাস, নাটক—সব বিষয়েই আমরা এক decadence-এর সম্মুখীন। তাই কালানুগতির দোহাই দিয়ে অনেকে কবিতার অনন্ত সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করতেই অভ্যস্ত। ফলে ‘সুস্থ জীবনবোধে’র প্রেরণা সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্যে ‘সীমার মাঝে অসীম’-এর কোনো চেতনা জেগে উঠছে না। জাগতিক কোনো পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী হওয়া তাই ‘সমস্ত কুকবি ও অকবি’র আত্মরক্ষায় উপায়। “তাঁরা আগে আবিষ্কার করেন যে জগতে পরিবর্তন ঘটছে ও পরে কবিতায় সেই পরিবর্তন বর্ণনা করেন। আর সৎকবি শিল্পের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে পৃথিবীরও পরিবর্তন হয়েছে বলে অনুমান করেন।” সার্থক শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যই সন্দেহাতীতরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত সৎকবিদের কাব্যলক্ষণ বর্ণনান্তে যতি টেনেছেন এই ব'লে যে “অরবিন্দ গুহ কুমারীদের দেহের বা আত্মহত্যার বিষয়ে লিখতে সাহস পান, কিংবা দিলীপ রায় দৈহিক কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এজন্য তাঁরা অনুমোদনযোগ্য’। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এ-ধরনের পক্ষপাতে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। কবিতার আধারনির্বাচনে শুচিবায়ু যেমন হাস্যকর, তেমনি কোনো আধার তার নিজের কারণেই বরণীয় হ'তে পারে কি? বিষয় যা-ই হোক, রচনাটি কবিতা হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত।

কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংশোধন

‘কবিতা’র গত আষাঢ় সংখ্যার ‘আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধে আলোচিত ‘তৃতীয় নয়ন’ গ্রন্থের লেখকের নাম পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কিন্তু ভ্রমক্রমে তা ‘পূর্ণেন্দুবিকাশ’ ছাপা হয়েছিলো। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য নামে অন্য একজন কবি আছেন ব'লে এই ভুল অনেকের পক্ষেই মনক্ষুণ্নকর হয়েছে। আমরা এ-জন্যে দুঃখিত।

অমিয় চক্রবর্তীর ‘আন্তর্জাতিক’ কবিতার অষ্টম পংক্তিতে ‘দাঁড়ালো’র বদলে ‘দাঁড়াই’ পড়তে হবে।

—সম্পাদক

KAVITA

(Poetry)

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50

Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE

Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Swapna Press Ltd., 8/1, Lallbazar Street, Calcutta-1.

KAVITA—Vol. 21, No. 1, September 1956

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত
লিলি বার্লি মিলস্‌ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক : নরেশ গুহ। ৮।১ লালবাজার স্ট্রীট, স্বপ্না প্রেসে মুদ্রিত ও ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

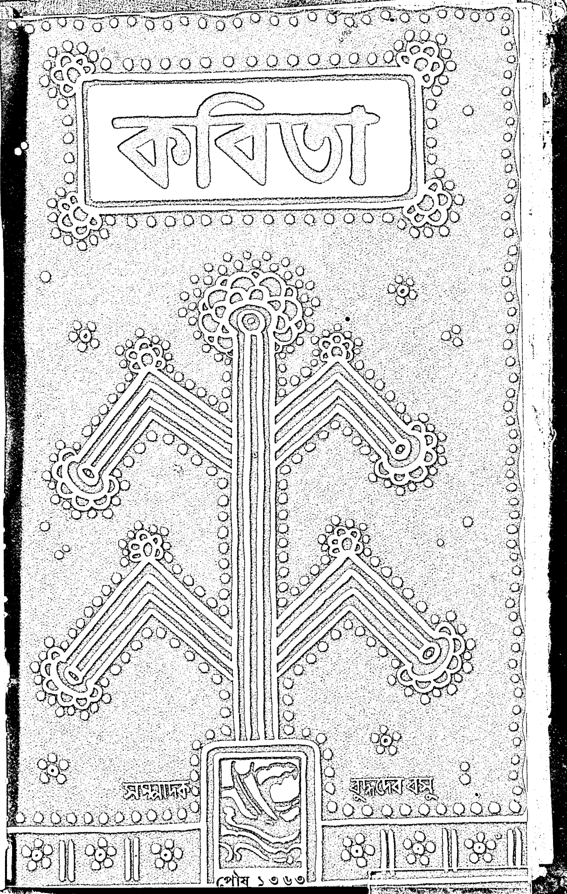

'কবিতা'র গ্রাহকদের প্রতি

সবিনয় নিবেদন,

কবিতাভবনের বার্ষিকী বৈশাখী (১৩৬৪) আগামী নববর্ষের পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় আছে প্রতিভা বসুর সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস ; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, অমরেন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ও মৃণাল চৌধুরীর গল্প ; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্য বিষয়ে, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত বিষয়ে ও নরেশ গুহর যামিনী রায় বিষয়ে প্রবন্ধ ; এবং অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, গোপাল ভৌমিক, বুদ্ধদেব বসু ও আরো অনেকের কবিতা। 'বৈশাখী'র সম্পাদনা করেছেন প্রতিভা বসু।

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা, কিন্তু 'কবিতা'র গ্রাহকদের জন্য এক টাকা। আগামী ২০শে চৈত্রের মধ্যে মূল্য ও মাশুল বাবদ এক টাকা চার আনা পাঠিয়ে দিলে 'বৈশাখী' প্রকাশ হওয়ামাত্র আপনাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আপনার নির্দেশ পেলে ভি. পি.তেও পাঠাতে পারি, কিন্তু তাতে খরচ পড়বে ১৸৵০। অর্ডারের সঙ্গে 'কবিতা'র গ্রাহকনম্বর দয়া ক'রে উল্লেখ করবেন।

প্রসঙ্গত জানাই, একবিংশ বর্ষ থেকে 'কবিতা'র সব গ্রাহকনম্বর বদল করা হয়েছে ; আপনার নূতন গ্রাহকনম্বর লক্ষ্য করলে অনুগৃহীত হবো।

নমস্কারান্তে,

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

কবিতা

পৌষ ১৩৬৩

—এই সংখ্যায়—

কবিতা

বিষ্ণু দে, মৃণালকান্তি, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, শামসুর রাহমান, শান্তিকুমার ঘোষ, অর্চন দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হক, উৎপলা মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিকাশ দাশ, প্রতিমা পাল, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, শোভন সোম, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, তারক সেন, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ গুহ

অনুবাদ

কালিদাসের মেঘদূত (সম্পূর্ণ উত্তরমেঘ), হোল্ডার্লিন ও শার্ল বোদলেয়ার-এর কবিতা : বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধ

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'

চিঠিপত্র

জ্যোতিভূষণ চাকী, তন্ময় দত্ত

কবিতা

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা

পৌষ ১৩৬১

দেড় টাকা

—

বিংশ বর্ষের
প্রথম,
তৃতীয়
ও চতুর্থ সংখ্যা

কবিতা,
অনুবাদ-কবিতা
ও
প্রবন্ধের
মূল্যবান সঞ্চয়ন

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
ভি. পি. ও মাশুল
স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাষিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) উইক্‌লী ওয়েষ্ট বেঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩ টাকা।

(২) কথাবার্তা—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাষিক ১॥০ টাকা।

(৩) বসুন্ধরা—গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) স্বাস্থ্যশ্রী—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টিবিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় মাসিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাষিক ১॥০ টাকা।

(৫) পশ্চিম বংগাল—নেপালী ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ১॥০ টাকা।

(৬) মগবেরী বংগাল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাষিক ১॥০ টাকা

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্‌ডিংস্‌, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার অধিকতার নিকট লিখুন।

'নাভানা'র বই

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু। ২॥০
পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী। ২৲
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ ৪৲
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ ৪৲
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ ৫৲
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ ৫৲
নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো। অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য। ২৲

আগামী মাসে প্রকাশিত হচ্ছে

বুদ্ধদেব বসুর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ

ক ঙ্কা ব তী

নাভানা

॥ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

কবিতাভবনের বার্ষিকী

বৈশাখী

১৩৬৪

প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় নববর্ষের পূর্বে প্রকাশিত হচ্ছে।
গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধের মূল্যবান সংগ্রহ।

মূল্য দেড় টাকা। 'কবিতা'র গ্রাহকদের জন্য এক টাকা।

সর্বত্র এজেণ্ট চাই

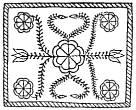

পিঁড়িচিত্র

বাংলার স্ত্রী-আচার

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
-সংকলিত

কালের স্রোতে কত পুরাতন আচার-বিচার ভেসে যায় ও কত নূতন বিচার-আচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু তার মধ্যে কতকগুলি থেকে যায়। সেই চিরন্তন প্রথার মধ্যে বাংলার স্ত্রী-আচার স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে।

এই বইটিতে বাংলাদেশের চারটি অঞ্চলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে— পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ : ঢাকা, ও পূর্ববঙ্গ : শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ময়মনসিংহ।
গ্রন্থশেষে অনেকগুলি বিবাহের গান সংকলিত হয়েছে।

সচিত্র ॥ মূল্য পাঁচ সিকা

বাংলার জাগরণ ॥ কাজী আবদুল ওদুদ

বাংলার নবজাগরণের সূচনাকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত তথ্য-মূলক আলোচনা। দেড় শতাধিক বৎসরকালের বাংলাদেশের সমাজ ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রাঞ্জল ইতিহাস।

মূল্য তিন টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

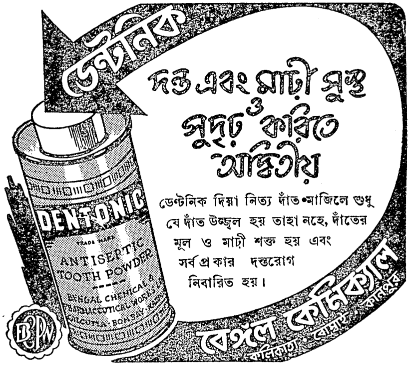

লেখকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'য় প্রকাশের জন্য যাঁরা রচনা পাঠাতে চান, নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

(১) লেখা ফেরৎ পেতে হ'লে যথোপযুক্ত স্ট্যাম্প-সমেত ঠিকানা-লেখা খাম সঙ্গে দেবেন।
(২) যদি লেখা ফেরৎ না চান, কিন্তু সম্পাদকের সিদ্ধান্ত জানতে চান, তাহ'লে ঠিকানা-লেখা পোস্টকার্ড পাঠালেও চলতে পারে। সম্পাদকের 'মতামত' কোনোক্রমেই জানানো সম্ভব নয়।
(৩) লেখকের নাম ও ঠিকানা পাণ্ডুলিপির উপরে বা নিচে স্পষ্টভাবে লেখা থাকা প্রয়োজন।
(৪) রচনার সঙ্গে স্ট্যাম্প না-পাঠিয়ে, পরে তা ফেরৎ চাইলে বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে কোনো ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়।
(৫) বুক-পোস্টে রচনা পাঠালে সঙ্গে কোনো পত্র দেবেন না।
(৬) আমরা ছদ্মনামের পক্ষপাতী নই, কিন্তু কোনো লেখক তা ব্যবহার করলে তাঁর প্রকৃত নাম ও ঠিকানাও জানাবেন।

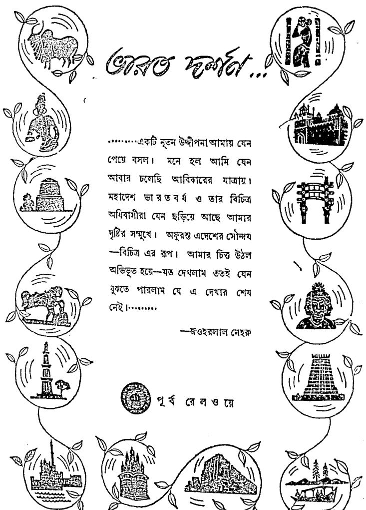

কবিতা

পৌষ ১৩৬৩
একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮৮

মেঘদূত

উত্তরমেঘ

অনুবাদ : **বুদ্ধদেব বসু**

৬৪

রয়েছে বিদ্যুৎ ললিত বনিতায়, ইন্দ্রধনু গৃহচিত্রে,
গানের আয়োজনে প্রহত পাখোয়াজে স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ,
স্বচ্ছ ভূমিতল[১] সজল মনে হয়, লেহন করে মেঘে তুঙ্গ চূড়া—
সৌধাবলী যেথা এ-সব লক্ষণে তোমারই অবিকল তুলনা।

৬৫[২]

হস্তে ধৃত লীলাকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
মুখের মধুরিমা লোধ্রপ্রসবের পরাগে হ'য়ে যায় পাণ্ডুর,
কর্ণে শোভা পায় শিরীষ মনোহর, তরুণ কুরুবকে কবরী,
এবং তুমি যারে ফোটাও, সেই নীপে সিঁথির প্রসাধন বধূদের।

৬৬[৩]

যেথায় তরুগণ নিয়তপুষ্পিত, মুখর উন্মাদ ভোমরায়,
নিত্য পদ্মের বিকাশ নলিনীতে, মরালশ্রেণী তার মেখলা,
ময়ূর নিত্যই কলাপে উজ্জ্বল, এবং কেকারবে উদ্‌গ্রীব,
নিত্য জ্যোৎস্নায় আঁধার কেটে যায়, তাই তো মনোরম সন্ধ্যা।

১। 'মণিময়ভুবঃ,' যার মেঝে মণিময়, এবং এত স্বচ্ছ যে মেঘের মতো 'অন্তস্তোয়ং' (যার ভিতরে জল আছে) ব'লে ভুল হয়।

২। পদ্ম শরতের ফুল, কুন্দকলি হেমন্তের, লোধ্র শীতের, কুরুবক বসন্তের, শিরীষ গ্রীষ্মের ও কদম্ব বর্ষার। অলকায় ছয় ঋতুর ফুল একসঙ্গে ফোটে।

৩। ৬৬ ও ৬৮ নং শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ব'লে ঘোষণা ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন; যেখানে সর্বদাই ফুল ফোটে আর রাত্রি কখনো অন্ধকার হয় না, এমন ভূস্বর্গের

৬৭

তারার ছায়া দেয় ছড়িয়ে ফুলদল[৪], ধবল মণিময় কুট্টিম,
যেথায় যক্ষেরা মিলিত, মনোমতো রূপসী বনিতার সঙ্গে,
সেবন করে ধীরে কল্পবৃক্ষের প্রসূত রতিফলমদ্য
ধ্বনিত হয় যবে উদার পাখোয়াজ তোমারই মতো মৃদু গম্ভীর।

৬৮

যেথায় তরুণীরা, অমরবাঞ্ছিতা, কনকসৈকতে ছুঁড়ে দেয়
হাতের মুঠো ভ'রে রত্নরাজি, পুন খেলাচ্ছলে করে সন্ধান,
এবং সেবা পায় শীতল অনিলের, মন্দাকিনী-বারি-স্পৃষ্ট,
বারণ করে তাপ ছায়ার বিস্তারে তটজ মন্দারবীথিকা।

৬৯

আকুল কামুকেরা আবেগভরে যেথা উচ্ছ্বসিত হাতে সহসা
নীবীর বন্ধন খসিয়ে, টেনে নেয় ক্ষৌম[৫] অংশুক স্খলমান,
বিম্বাধরাগণ, বিমূঢ় লজ্জায়, তখনই কুঙ্কুমচূর্ণ,
যদিও ছুঁড়ে দেয় দীপ্ত মণিদীপে, বিফল হয় সেই চেষ্টা।

৭০[৬]

সততগতিশীল বায়ুর চালনায় তোমারই অনুরূপ মেঘেরা
যখন উপনীত হয় সে-অলকার বিমানসমূহের শিখরে,
স্বজলকণিকার সংক্রমণে তারা দূষিত ক'রে দিয়ে চিত্রাবলী,
সদ্য শঙ্কায় পলায় বাতায়নে, ধোঁয়ার অনুকারে, শীর্ণ।

কল্পনা আমাদের কাছেও অগ্রাহ্য। কিন্তু ৬৫ ও ৬৬ নং শ্লোকে ভাবের সংগতি আছে ; যেখানে বারোমাসের ফুল একসঙ্গে পাওয়া যায়, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চাঁদই বা উঠবে না কেন। মেয়েদের মণিমুক্তো নিয়ে বল্ খেলার ছবিটিও আমার মনে হ'লো রক্ষণের অযোগ্য নয়।

৪। স্ফটিকের মেঝেতে তারার আভা যেন ফুল ছিটিয়ে দিয়েছে— এই হ'লো মল্লিনাথের ব্যাখ্যা। তার মানে, এই বিলাসস্থলটি একটি বারান্দা বা খোলা চত্বর।

৫। ক্ষৌম=linen, ক্ষুমা শব্দের বিশেষণ, যার অর্থ flax বা তিসি। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ক্ষুমা-র ধাতুগত অর্থ, 'যা পক্ক হ'লে শব্দিত হয়'।

৬। মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকের একটি ব্যঙ্গ্যার্থ আছে : দূতের সাহায্যে জার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে, এবং মেয়েদের মধ্যে ব্যভিচারদোষ উৎপাদন ক'রে ছদ্মবেশে কোনো ক্ষুদ্র পথে

৭১

তোমার আবরণ কখনো স'রে গেলে, অমল ইন্দুর কিরণে,
বিতানে লম্বিত চন্দ্রমণিদাম[৭] ক্ষরণ ক'রে জলবিন্দু
নিশীথে মুছে নেয় তাদের তনু থেকে রতির পরিণতি—ক্লান্তি—
পতির ভুজপাশে যে-সব নায়িকার শিথিল হ'য়ে এলো আলিঙ্গন।

৭২

যেথায় অক্ষয়-ধনিক যক্ষেরা নিত্য বৈভ্রাজ-কাননে
বেড়ায়, বারমুখী বিবুধবনিতার সঙ্গে আলাপনে বদ্ধ,
এবং সেখানেই যতেক কিন্নর মোহন রঞ্জিত কণ্ঠে
উচ্চ গান্ধারে গানের উচ্চারে রটায় কুবেরের কীর্তি।

৭৩

গতির কম্পনে কবরী-হ'তে-খসা খিন্ন মন্দারপুষ্প,
কর্ণবিচ্যুত সোনার শতদল, স্তনের উচ্ছ্বাসে ছিন্ন হার,
মুক্তাজাল, আর খণ্ড পত্রিকা[৮] যেথায় সবিতার উদয়ে
সূচনা ক'রে দেয় অনেক লক্ষণে নৈশ অভিসার মেয়েদের।

৭৪

কুবেরসখা শিব স্বয়ং অধিবাসী, এ-কথা জেনে কন্দর্প
ধরে না ভয়ে-ভয়ে প্রায়শ ধনু, যার ছিলায় মধুকরপংক্তি—
করেন তাঁর কাজ চতুর বনিতারা কামুকসন্ধানে নির্ভুল,
অমোঘ বিভ্রমে মিশিয়ে দৃষ্টিতে ভুরুর অপরূপ ভঙ্গি।

পালিয়ে গেলো। 'সততগতিশীল'-এর ব্যঙ্গ্যার্থ : অন্তঃপুরসঞ্চারী। উভয় অর্থেই 'স্বজলকণিকা-দোষম্'-এর সুষ্ঠুতা ভেবে আমরা বিস্মিত হই।

৭। চন্দ্রকান্ত বা চন্দ্রমণি : moonstone, 'বর্ণহীন স্বচ্ছ মণি, নাড়লে ভিতরে আকাশতুল্য আভা দেখা যায়।' (রাজশেখর বসু)। প্রবাদ, এই মণি চন্দ্রকিরণে গঠিত হ'য়ে চাঁদের আলোতেই বিগলিত হয়। শয্যার উপরে চাঁদোয়া আছে, আর তা থেকে বহুসূত্রে চন্দ্রমণি ঝুলছে ; মধ্যরাত্রে চাঁদ যখন উজ্জ্বল, সেই আলোয় মণিসমূহ বিগলিত হ'য়ে বিন্দুরূপে ক্ষরিত হচ্ছে—ব্যাপারটা হ'লো এই।

৮। খণ্ড পত্রিকা, 'পত্রচ্ছেদ' : সাংকেতিক পাতার টুকরো। এই টুকরোগুলো নানা ছাঁদে কাটা হ'তো, তা থেকে নায়িকা নায়কের অভিপ্রায় (বা মিলনস্থল) বুঝে নিতেন।

৭৫

যেথায় ললনার সকল প্রসাধন প্রসব করে এক কল্পতরু—
রঙিন বেশবাস, ভূষণ নানামতো, পুষ্পসহ-ফোটা কিশলয়,
অলক্তকরাগ, চরণকমলের প্রান্তে প্রলেপের যোগ্য,
এমন মধু, যার আদেশে দেখা দেয় নয়নে আবেশের বিভ্রম।

৭৬

কুবের-ভবনের খানিক উত্তরে দেখবে আমাদের নিকেতন,
চিনবে দূর থেকে ইন্দ্রধনুকের তুল্য মনোরম তোরণে,
প্রান্তে আছে তার আমারই কান্তার পালিত কৃত্রিমপুত্র—
তরুণ মন্দার,[৯] স্তবকভারে নত, বাড়ালে হাত তারে ছোঁয়া যায়।

৭৭

রয়েছে দিঘি এক, ঘাটের সারি যার কঠিন পান্নায় বাঁধানো,
হৈম অম্ভোজ কত না ফুটে আছে, মৃণালে জলে বৈদূর্য[১০]
যদিও দূরে নয় মানস, তবু সেই সলিলবাসী সব হংস
তোমার উদয়েও অনুৎকণ্ঠিত, হবে না যাত্রায় তৎপর।[১১]

৯। মন্দার: স্বর্গের পঞ্চপুষ্পের অন্যতম; বাংলায় মাদার ('চলন্তিকা'), অথবা ডেহুফল (ডেফল) গাছ ('বঙ্গীয় শব্দকোষ')। Monier-Williams একাধিক লাটিন নাম দিয়েছেন, তবে কালিদাসের মনে ঠিক কোন গাছ ছিলো, তা নিশ্চিত বলা সম্ভব মনে হয় না। মল্লিনাথ কল্পবৃক্ষ অর্থ করেছেন, কিন্তু নারীর নর্মবাক্যে যে-গাছে ফুল ফোটে (দ্র. ৭৯ নং শ্লোকের টীকা), এ যদি সেই গাছ হয়, তাহ'লে একে পার্থিব গাছ ব'লেই ধরতে হবে (কেননা স্বর্গের গাছে দোহদের প্রয়োজন হ'তে পারে না), এবং পার্থিব হ'লে কবিতার আবেদনও বেড়ে যায়।

১০। বৈদূর্য: বিদূর পর্বতে জাত মণিবিশেষ; lapis lazuli বা নীলকান্ত; যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে chrysoberyl। ১১। বর্ষাজনিত পঙ্কিলতা এড়াবার জন্য হাঁসেরা অন্য জল ছেড়ে মানস-সরোবরে চ'লে যায়, কিন্তু যক্ষের দিঘি চিরনির্মল, তাই মেঘ দেখেও তারা যাত্রার উদ্‌যোগ করে না।

৭৮[১২]

প্রমোদশৈলের ইন্দ্রনীলে গড়া শৃঙ্গ শোভা পায় তীরে তার,
কনককদলীর নিবিড় বেষ্টনে নয়ননন্দন দৃশ্য;
তুমিও পরিবৃত স্ফুরিত বিদ্যুতে, বন্ধু, দেখে তা-ই দুঃখে—
ঘরনী তারে ভালোবাসেন ব'লে, আমি স্মরণ করি সেই শৈলে।

৭৯[১৩]

রেখেছে বেড়ি দিয়ে ফুল্ল কুরুবক সেথায় মাধবীর বিতানে,
অদূরে কমনীয় বকুলতরু, আর কম্প্রকিশলয় রক্তাশোক;
হে মেঘ, সে তোমার সখির বাম পদ আমারই মতো করে অভিলাষ,
অন্য জন তার দোহদ ছল ক'রে চায় যে বদনের মদিরা।

১২। ইন্দ্রনীল: নীলকান্তমণি। কনককদলী: স্বর্ণময় কৃত্রিম কলাগাছ। যক্ষের এই চিন্তাকে মল্লিনাথ বলেন শালগ্রামে হরিভাবনাদর্শন, fetish।

১৩। মল্লিনাথ বলছেন: নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু বিকশিত হয়, মুখমদ্যে বকুল, পদাঘাতে অশোক, দৃষ্টিপাতে তিল আর আলিঙ্গনে কুরুবক। মন্দার ফোটে নর্মবাক্যে, পটু বা মৃদু হাস্যে চাঁপা, মুখের বাতাসে (নিশ্বাসে) আম্রমুকুল, গানে নমেরু (রুদ্রাক্ষ) আর সামনে নৃত্য করলে কর্ণিকার (কনকচাঁপা বা সোঁদাল ফুল)। 'বদনমদিরা' মল্লিনাথের মতে গণ্ডূষমদ্য; অর্থাৎ নায়িকা মুখে মদ নিয়ে কুলি ক'রে গাছের গায়ে দিচ্ছেন, কিন্তু নিষ্ঠীবনও মানে হ'তে পারে, কেননা ঐ বস্তু যক্ষেরও আকাঙ্ক্ষিত। দোহদ: যার প্রয়োগে গাছে অকালে ফুল ফোটে; গর্ভিণীর স্পৃহা। Monier-Williams-এর মতে এই শব্দ 'দৌর্হৃদ'এর প্রাকৃত রূপ, যার অর্থ হার্দ্য বিষাদ, বা বিবমিষা। শব্দটিতে গর্ভিণীদের বমনেচ্ছা আর নানারকম অদ্ভুত স্পৃহা দু-ই সূচিত হচ্ছে, কিন্তু এখানে 'দোহদ' অছিলামাত্র, বকুলের গাছে বমন করার কথা উঠছে না, প্রণয়কালীন মুখমদ্যই কাম্য। উপরন্তু স্মর্তব্য যে যক্ষপ্রিয়া নিঃসন্তান, (দ্বারপ্রান্তে তরুণ মন্দার তার পালিত পুত্র) তাই দোহদের অভিজ্ঞতা তার নেই। অশোক ফুল লাল আর শাদা দু-রকমের হয়; মল্লিনাথ বলেন লাল রং স্মরোদ্দীপক ব'লে রক্তাশোক উল্লিখিত হয়েছে, শাদা বকুলের সঙ্গে অন্য লাল ফুলের বর্ণসমাবেশও হয়তো কবির অভিপ্রেত ছিলো। মাধবী ফুলও লাল হয়; 'মধু' শব্দের এক অর্থ বসন্ত ঋতু, বসন্তে ফুল ফোটে, তাই 'মাধবী' নাম।

উইলিয়ম জোন্স বলেছিলেন, পুষ্পিত অশোকতরুর চেয়ে মনোহর দৃশ্য উদ্ভিদ্‌জগতে কিছু নেই। তাঁকে সম্মান জানিয়ে লাটিনে এর নাম হয়েছে Jonesia asoka।

৮০

সে-দুটি বৃক্ষের মধ্যে লম্বিত দেখবে কাঞ্চনযষ্টি,
ফলক স্ফটিকের, মণিতে বাঁধা মূল, তরুণ বেণু যেন বর্ণে,
দিবস গত হ'লে সেথায় এসে বসে তোমার সখা নীলকণ্ঠ[১৪]—
ক্বণিত বলয়ের ললিত করতালে নাচায় তারে যবে কান্তা।

৮১

স্মরণে অঙ্কিত এ-সব লক্ষণে এবং নিজ নৈপুণ্যে
দ্বারের পাশে আঁকা শঙ্খপদ্মের[১৫] চিত্র দেখে তুমি চিনবে—
অধুনা যে-ভবন আমার বিচ্ছেদে মলিন হ'য়ে আছে নিশ্চয়,
কমল কখনো কি আপন রূপ ধরে সূর্য রয় যদি আড়ালে!

৮২

সহজ প্রবেশের উপায় বলি, শোনো : করভ[১৬]-রূপ নিয়ে সদ্য
পূর্বকথিত যে-প্রমোদগিরি, তার রম্য সানুদেশে বসবে,
স্বল্পবিলসিত আভাসে নেভে, জলে যেমন জোনাকির পুঞ্জ,
তেমনি বিজলীর স্ফুরিত দৃষ্টিতে তাকাবে ভবনের মধ্যে।

১৪। ময়ূর।

১৫। 'শঙ্খ ও পদ্ম কুবেরের নবনিধির অন্তর্গত। এই দুইএর মূর্তি মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে মনুষ্যাকারে চিত্রিত হ'ত।' (রাজশেখর বসু)। এই দুই বস্তুই বিষ্ণু ধারণ করেন; বেদপরবর্তী হিন্দু মানসে পদ্মের পবিত্রতা অসীম, শঙ্খের মর্যাদাও কম নয়। আমরা এ-দুটিকে শুভচিহ্নরূপে গ্রহণ ক'রেই তৃপ্ত ছিলাম, কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাদের গাণিতিক মূল্য উল্লেখ ক'রে আমাদের মনে দুঃখ দিয়েছেন। তাঁর মতে ঐ চিহ্নদ্বয় যক্ষের ধনের বিজ্ঞাপন : এক পদ্ম+এক শঙ্খ= ১১০০০০০০০০০০০০০ 'টাকা' তার আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র' লিখেছিলেন, নিশ্চয়ই এ-অর্থ ভাবেননি?

১৬। হস্তীশাবক।

৮৩[১৭]

তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

৮৪

আমি-যে সহচর গিয়েছি দূরে, তাই একেলা যেন এক চক্রবাকী,
ক্বচিৎ কথা বলে, দীর্ঘ এই দিন কাটায় ঘোর উৎকণ্ঠায়,
তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী, অন্যরূপা তাকে মনে হয়—
জলদ, তুমি তাকে আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রাণ ব'লে জানবে।

৮৫

ব্যাকুল, অবিরল রোদনে রঞ্জিত বিস্ফারিত আঁখি প্রেয়সীর,
অধরশোণিমার বর্ণ অপগত, শীতল নয় ব'লে নিশ্বাস,
স্রস্ত কেশ আর ন্যস্ত কর, তাই যায় না দেখা মুখ অবিকল—
যেথায় মুকুরিত তোমার তাড়নায় পীড়িত ইন্দুর দৈন্য।

১৭। 'শ্যামা' : মল্লিনাথের মতে যুবতী বা মধ্যযৌবনা; রাজশেখর বসু অন্যান্য অর্থ দিয়েছেন, 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী যার গাত্র শীতকালে সুখোষ্ণ, গ্রীষ্মে সুখশীতল, শ্যামাঙ্গী (brunette)।' Monier-Williams-এর মতে 'শ্যামা' অর্থ বিশেষ লক্ষণযুক্ত নারী—(১) যার দেহে ঋতুলক্ষণ প্রকট, (২) যার সন্তান হয়নি, (৩) ক্ষীণাঙ্গী। মনে হয় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা আর নিঃসন্তান এই দুটি অর্থ গ্রহণ করলে প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে সংগত হয়। (তারুণ্য এবং তন্বীতার উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে আছে। সূক্ষ্মদন্তিনী ('শিখরিদশনা') নারী মল্লিনাথের মতে ভাগ্যবতী, তার পতি দীর্ঘায়ু লাভ করে। বিম্ব : তেলাকুচো ফল, পাকলে টুকটুকে লাল হয়, আকারেও অনেকটা ঠোঁটের মতো। 'নিম্ননাভি' : মল্লিনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাভি গভীর হ'লে কামের তীব্রতা ('মদনাতিরেক') বোঝায়। 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা'— পদ্মিনী নারীর চোখের কোণা লাল হয় আর দৃষ্টি চকিতমৃগসদৃশ। নারীর শ্রেণীবিভাগে পদ্মিনীর স্থান সর্বোচ্চে, এবং এই শ্লোকে নারীসৌন্দর্যের যে-আদর্শ বিধৃত হয়েছে, অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

৮৬

বুঝি বা সেক্ষণে পূজায় মনোযোগী[১৮]— দেখতে পাবে তারে অচিরে,
অথবা অনুমানে আঁকছে প্রতিকৃতি বিরহে-ক্ষীণতনু আমারই,
শুধায় নতুবা সে— মঞ্জু বাণী যার, পিঞ্জরিতা সেই সারিকায়,[১৯]
'সোহাগী তুই তাঁর, স্বামীরে কখনো কি পড়ে না মনে, ওলো রসিকা?'

৮৭

মলিন বেশবাসে বুঝি বা ব'সে আছে, অঙ্কে এলায়িত বীণাতার,
আমার নাম-লেখা গানের পদাবলী উচ্চারণে করে চেষ্টা,
অথচ অশ্রুতে আর্দ্র বীণাতার যত না মুছে নেয় আঙুলে,
যতনে বিরচিত আপন মূর্ছনা তবু সে বার-বার ভুলে যায়।

৮৮

রেখেছে প্রতিদিন ভবন-দেহলীতে[২০] একটি ক'রে ফুল সাজিয়ে,
ভূমিতে রেখে তা-ই বিরহ-সময়ের অবধি করে বুঝি গণনা;
কিংবা সে আমার সঙ্গ করে ভোগ, কল্পনায় যার জন্ম—
প্রায়শ এইমতো বিনোদ[২১] খুঁজে নেয় রমণবিরহিণী মেয়েরা।

১৮। পূজায় মনোযোগী, 'বলিব্যাকুলা': পতির প্রত্যাগমনের উদ্দেশে যক্ষপ্রিয়া প্রত্যহ পূজা করে; Wilson লিখেছেন এই পূজার নাম কাকবলি, এটি বর্ষাগমে বিরহিণীদের কৃত্য।

১৯। সারিকা (সারী, শারী) কী পাখি? সত্যচরণ লাহার মতে পাহাড়ি ময়না (শালিখ নয়), ইংরেজিতে grackle, এই পাখি কথা বলায় ওস্তাদ। শুক মানে টিয়াপাখি, জাতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এ-দুয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ লোকপ্রবাদ মাত্র। সংস্কৃতে 'সারিকা' বলতে শালিখও বোঝাতো।

২০। 'দেহলী': চৌকাঠ বা দাওয়া। 'সম্ভবত যক্ষপত্নী গৃহদ্বারের কাছে কোনও পীঠের উপর প্রত্যহ একটি ক'রে ফুল রাখত আর মাঝে মাঝে তা নামিয়ে গুণে দেখত ৩৬৫ দিন পূরণের কত বাকি।' (রাজশেখর বসু)

২১। বিনোদ: যার দ্বারা বিনোদন হয়, অবসরযাপনের উপায়। আধুনিক বাংলায় শব্দটির এই অর্থ প্রচলিত হ'লে কবিরা লাভবান হবেন।

৮৯

ব্যস্ত দিনমানে তোমার সখী নয় বিরহভারে তত খিন্ন,
কিন্তু মানি ভয়, বিনোদব্যতিরেকে দুঃখে ভরা তার যামিনী;
দেখবে সাধ্বীরে ভূতলশয্যায়, নিদ্রালেশ নেই চক্ষে,
মহৎ সুখ দিয়ো, সৌধবাতায়নে আমার সমাচার জানিয়ে।

৯০

বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তবু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত,
যে-নিশি কাটিয়েছি দু-জনে স্বেচ্ছায় রতির উচ্ছ্বাসে ক্ষণিকে,
এখন বিচ্ছেদে দীর্ঘায়িত হ'য়ে অশ্রুজলে হয় অবসান।

৯১

এখনো জানালায় শীতল চন্দ্রমা ছড়ায় অমৃতের স্পর্শ,
পূর্বপ্রীতিবশে দৃষ্টি ছোটে তার, কিন্তু ফিরে আসে তখনই,
অশেষ বেদনায় নয়ন ঢেকে যায় অশ্রুভারাতুর পক্ষ্মে—
মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে[২২]।

৯২

শুদ্ধস্নান[২৩] করে, অলক অতএব রুক্ষ হ'য়ে, বিস্রস্ত,
কপোলে নেমে আসে, তাপিত নিশ্বাসে ক্লিষ্ট অধরের কিশলয়;
ঘুমেরে সাধে কত, যদি বা অন্তত স্বপ্নে বুকে পায় আমাকে,
অথচ কান্নার আক্রমণে তার কোথায় সুপ্তির অবকাশ।

২২। 'তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী' (শ্লোক ৮৪) তুলনীয়। ৮৩ শ্লোকে যক্ষপ্রিয়ার স্বাভাবিক রূপ বর্ণিত হয়েছে; তার অব্যবহিত পরেই বলবার দরকার ছিলো যে তার বর্তমান রূপ অন্য রকম; শীতাহত পদ্মের মতো তারও এখন প্রাকৃত শ্রী অবলুপ্ত। কিন্তু শীতের পদ্ম মুমূর্ষু, যক্ষপ্রিয়ার তবু আশা আছে, তাই কবি আবার পদ্মের উপমাই অন্য ভাবে ব্যবহার করলেন; 'জেগেও নেই ঘুমিয়েও নেই' এই মন্তব্যে অবসাদ আর নবজীবনের সম্ভাবনা দুটোই বোঝা গেলো। মেঘ কেটে গেলে পদ্ম জেগে উঠবে, তেমনি যক্ষ ফিরে এলে, বা মেঘের বাণী শুনে, যক্ষপ্রিয়ার পুনরুজ্জীবন হবে।

২৩। প্রসাধনহীন স্নান। এখানে যক্ষপ্রিয়ার রোদনে লজ্জাত্যাগ সূচিত হচ্ছে, এই হ'লো মল্লিনাথের মত, কিন্তু আমরা একে লজ্জাত্যাগ বলি না।

৯৩

মাল্য ফেলে দিয়ে বেঁধেছে একবেণী বিরহদিবসের প্রথমে,
শাপের অবসানে বিগতশোক আমি ছাড়ায়ে দেবো তার গ্রন্থি,
পরশে কর্কশ কঠিন বেণী সেই গণ্ডদেশ থেকে বার-বার
যে-হাতে ঠেলে দেয়, হেলায় এতকাল কাটে না তার নখপংক্তি।

৯৪[২৪]

অসহ বেদনায় কখনো উঠে বসে, এমনি বার-বার শয্যাতলে
ভূষণবর্জিত পেলব তনু তার ন্যস্ত করে সেই অবলা,
নবীন জলময় অশ্রু নিশ্চয় মোচন করাবে সে তোমাকেও,
অন্তরাত্মায় আর্দ্র যারা, প্রায় করুণাশীল তারা সকলেই।

৯৫

তোমার সখী তার স্নেহের সম্ভার, জেনেছি, আমাকেই দিতে চায়,
তাই তো অনুমান, প্রথম বিচ্ছেদে এমনি শোচনীয় দশা তার ;
এ নয় বাচালতা— 'ভাগ্যবান[২৫] আমি,' তা ভেবে, অভিমানবশত,
আমার বিবরণ অচিরে অবিকল আপন চোখে, ভাই, দেখবে।

২৪। ৮৩ শ্লোকে যে-বিরহাবস্থার বর্ণনা শুরু হয়েছে, এই শ্লোক তার চরম পরিণতি। মল্লিনাথ প্রণয়ের দশ অবস্থার উল্লেখ করেছেন : চক্ষুপ্রীতি, মনঃপ্রীতি, সঙ্গসংকল্প, অনিদ্রা, কৃশতা, অবসাদ, হ্রীত্যাগ, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু। যক্ষপ্রিয়া নবম দশায় পৌঁচেছে, এখন মেঘ যক্ষের বার্তা জানিয়ে শীঘ্র তার প্রাণরক্ষা করুক।

সংস্কৃত সমালোচনা (কবিতার মতোই) কিছুটা আক্ষরিক পথে চলতো : এই অংশে প্রণয়ের প্রথম দশার (চক্ষুপ্রীতি) উল্লেখ নেই, মল্লিনাথ তা লক্ষ্য করতে ভোলেননি, এবং কবির এই অবহেলার সমর্থনে দীর্ঘায়িত যুক্তিও দিয়েছেন। নায়ক-নায়িকা (সম্ভবত বহুকাল ধ'রে) বিবাহিত, অতএব চক্ষুপ্রীতির অবস্থা তারা পেরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আট দশা পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে কিনা, সে-বিষয়েও আমরা সন্দিহান ; কিন্তু যদি কিছু ব্যতিক্রম ঘ'টে থাকে, সেখানেই কালিদাসের কবিত্বগৌরব।

২৫। মূলে 'সুভগ', এক অর্থ ললনাপ্রিয়।

৯৬[২৬]

স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য,
সুরার পরিহারে ভুলেছে ভ্রূবিলাস, এমন বাম আঁখি মৃগাক্ষীর
তোমার আগমনে ঊর্ধ্বকম্পিত আন্দোলনে হবে সুন্দর,
তুলনা সে-রূপের ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয়।

৯৭

গৌর বরনে যে তুলনা আনে মনে সরস কদলীর কাণ্ড,
দৈবে এক্ষণে-আমার চিরচেনা মুক্তাজাল[২৭] যার ত্যাজিত,
আমার নখরের চিহ্ন নেই আর, লভে না সম্ভোগ-অন্তে
আমারই হস্তের সংবাহন-সুখ,[২৮] হবে সে-বাম উরু স্পন্দমান।

৯৮

যদি বা সেক্ষণে নিদ্রাসুখ তার ভাগ্যে জুটে থাকে দৈবাৎ,
জলদ, গরজনে বিরত, সাবধানে প্রহরকাল[২৯] থেকো অপেক্ষায় ;
বুঝি বা কোনোমতে স্বপ্নে অবশেষে প্রেমিক-আমি তার লব্ধ,
কণ্ঠ হ'তে সেই গাঢ় ভুজলতা সহসা বিচ্যুত কোরো না।

২৬। ৮৫ শ্লোক তুলনীয়— 'স্রস্ত কেশ আর ন্যস্ত কর, তাই যায় না দেখা মুখ অবিকল।' বিরহিণী চুলে তেল দেয় না, গালে হাত দিয়ে ভাবে, তাই তার মুখ অংশত আচ্ছাদিত। লুটিয়ে-পড়া চুলের জন্য তার চোখের প্রসারও অবরুদ্ধ, অর্থাৎ সে আড়চোখে তাকাতে পারে না। মেঘ দেখে তার বাঁ চোখ উপর দিকে স্পন্দিত হবে। পরের শ্লোকে বাম উরুর উল্লেখ আছে, মেয়েদের বাম অঙ্গের স্পন্দন শুভ লক্ষণ ব'লে গণ্য ; এবং কোনো প্রকট ভঙ্গির পরিবর্তে শুধু যে চোখ আর উরু স্পন্দিত হ'লো, তাতে এই বিষাদপ্রতিমার ছবিটি আরো স্পষ্ট হ'লো আমাদের মনে।

২৭। মুক্তার মেখলা : তার ঝালর উরু স্পর্শ করতো। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নারীর বেল্টের মতো, মেখলাও বসনের উপরিভাগে কটিতে ধারণ করা হ'তো, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে এই ভূষণ সর্বদাই দেখা যায়।

২৮। সংবাহন : মর্দন, massage। ৭৯ শ্লোক স্মর্তব্য : যক্ষ পত্নীর বাম পদ আকাঙ্ক্ষা করে, অর্থাৎ পা টিপে দিতে চায়। সম্ভোগের পরেও সে তা-ই ক'রে থাকে। বাৎস্যায়নে সংবাহনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা উভয় পক্ষেরই কৃত্য, আর তার কোনো সময়ও নির্দিষ্ট নেই। সম্ভোগান্তিক পদসংবাহন যক্ষের ব্যক্তিগত অভ্যাস কিনা, না কি তার কোনো ঐতিহ্য আছে, আমি তা আবিষ্কার করতে পারিনি।

২৯। 'রতিরহস্যে'র উল্লেখ ক'রে মল্লিনাথ এক প্রহর অপেক্ষার যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে অক্ষম, কেননা স্বপ্নমিলন তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হ'তে পারে না।

৯৯

তোমার জলকণা ব্যাপ্ত যাতে, সেই বাতাসে[৩০] মানিনীরে জাগিয়ে
আননে আশ্বাস আনবে, মালতীর নবীন মুকুলের তুল্য[৩১]
লুকোবে বিদ্যুৎ, যখন সে তোমারে দেখবে অনিমেষে জানালায়,
তোমার ধ্বনিরূপ বচনে ধীরে-ধীরে বলবে এইমতো বার্তা :

১০০

"জানবে, অবিধবা,[৩২] অম্বুবাহ আমি, তোমার দয়িতের বন্ধু,
হৃদয়ে সমাচার বহন ক'রে তার তোমারই কাছে আজ আগত ;
স্নিগ্ধগম্ভীর স্বননে প্রবাসীর ত্বরান্বিত করি যাত্রা,
পথশ্রান্ত যে-পতিরা উৎসুক প্রিয়ার বেণীপাশমোচনে।"

(আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের মতে একটি স্বপ্নের দীর্ঘতম স্থায়িত্বকাল তিন মিনিট।) বরং এ-কথা ভাবা সংগত মনে হয় যে মেঘ রাত্রির শেষ যামে বিরহিণীর বাতায়নে উপস্থিত হবে, এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত (ঘুম ভাঙার স্বাভাবিক সময় পর্যন্ত) নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে।

৩০। এটা যক্ষপ্রিয়ার প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা। মল্লিনাথ ভোজরাজের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'পায়ে মৃদুমর্দন, বুকে শীতল ব্যজন, বা মধুর গীতধ্বনি— এই হ'লো প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙাবার উপায়।'

৩১। মালতী: অভিধানের প্রথম অর্থে যূথীজাতীয় সান্ধ্য ফুল বোঝায়, কিন্তু মল্লিনাথ অর্থ দিয়েছেন জাতী, বা nutmeg (জায়ফল)-এর সমার্থক হ'তে পারে। পংক্তিটির দুই অর্থ সম্ভব: 'জেগে উঠলে প্রিয়াকে মালতীমুকুলের মতো প্রফুল্ল দেখাবে', বা 'মালতীকোরক যখন ফুটবে প্রিয়াও তখন জেগে উঠবে'। এখন মালতী যদি যূথী হয়, তাহ'লে ধ'রে নিতে হয় যক্ষপত্নী অপরাহ্ণে ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় মেঘের ব্যজনে জাগরিত হ'লো ; এই প্রস্তাব মেনে নেবার বাধা আছে, কেননা যক্ষপ্রিয়া নানা কাজে দিন কাটায় আর রাত্রে ঘুমের চেষ্টা করে (দ্র. ৮৯ শ্লোক)। তাছাড়া সুসংবাদ দেবার পক্ষে প্রাতঃকালই প্রশস্ত এবং রাত্রিশেষে আগত ও অপেক্ষমান মেঘের চিত্রই অধিক চিত্তগ্রাহী। আমার ধারণা, মালতীকে কোনো প্রাতঃকালীন ফুলের নামান্তর ব'লে ধরলেই ভাবের দিক থেকে সংগত হয়।

৩২। মেঘ প্রথমেই 'অবিধবা' ব'লে সম্বোধন ক'রে জানিয়ে দেবে যে যক্ষ এখনো বেঁচে আছে।

১০১

যেমন মৈথিলী পবননন্দনে, এ-কথা বলা হ'লে, সৌম্য,
জানিয়ে সম্মান, দেখবে তোমাকে সে আবেগে উন্মুখ হৃদয়ে ;
শুনবে একমনে যা বলা বাকি আছে, কেননা মিলনের তুলনায়
সুহৃৎ-উপহৃত কান্ত-সমাচার অল্প ন্যূন মানে বধূরা।

১০২

আমার অনুনয়ে, নিজেরও লাভহেতু,[৩৩] আয়ুষ্মন্‌, তুমি বলবে :
"তোমার সুহচর, যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে।
অবলা, তোমারে সে কুশল জিজ্ঞাসে, প্রথমকৃত্য এ-প্রশ্ন,
কেননা প্রাণীদের জীবন অস্থির, বিপদ ঘটে অতি সহজে।

১০৩

"বৈরী বিধি আজ, রয়েছে দূরে তাই, নিষ্ক্রমণ অবরুদ্ধ,
কেবল মনোরথে তোমার অঙ্গে সে সঞ্চারিত করে অঙ্গ—
তোমার অতিকৃশ, সাশ্রুনিশ্বাসী, বেদনাতাপময় তনুতে
মিলায় সন্তাপী, দীর্ঘনিশ্বাসী, অশ্রুপ্লুত, ক্ষীণ তনু তার।

১০৪

"যে-কথা বলা যায় সহজে সোচ্চারে তোমার সখীদেরই সমুখে
তাও যে-লোভাতুর বলতো কানে-কানে আননপরশের লালসায়,
সে আজ, দৃষ্টির বহির্ভূত, আর শ্রবণবিষয়ের অগোচর,
আমার মুখ দিয়ে তোমায় বলে বাণী, রচিত ঘোর উৎকণ্ঠায় :

১০৫

" 'দেখি প্রিয়ঙ্গুতে[৩৪] তোমার তনুলতা, বদন বিম্বিত চন্দ্রে,
ময়ূরপুচ্ছের পুঞ্জে কেশভার, চকিত হরিণীতে ঈক্ষণ,
শীর্ণ তটিনীর ঢেউয়ের ভঙ্গিতে ভুরুর বিলসিত পতাকা,[৩৫]
কিন্তু, হায়, নেই তোমার উপমান কোথায় একযোগে, চণ্ডি ![৩৬]

৩৩। পরোপকারে পুণ্য হয়, তাই মেঘেরও লাভ হবে।

৩৪। প্রিয়ঙ্গুলতা, মূলে 'শ্যামা' : রাজশেখর বসুর মতে 'alamanda জাতীয়, হলদে ফুল হয়।' 'যার অঙ্গ প্রিয়দর্শন,' প্রিয়ঙ্গু শব্দের আক্ষরিক অর্থ এই, আর 'শ্যামা'রও এক অর্থ

১০৬

“ ‘অধুনা ধাতুরাগে[৩৭] শিলায় আঁকি আমি প্রণয়কোপবতী-তোমাকে,
সে-পটে আপনাকে লোটাতে চাই যদি তোমার চরণের প্রান্তে,
তখনই অশ্রুর প্লাবনে বার-বার লুপ্ত হ’য়ে যায় দৃষ্টি—
নিয়তি নির্দয়, চিত্রফলকেও মিলন আমাদের সহে না।

১০৭

“ ‘হে গুণবতি, শোনো যে-বায়ু দক্ষিণে তুষারগিরি হ’তে বহমান
সদ্য দেওদারে দীর্ণ কিশলয়ে গন্ধনিঃস্রাব ঝরিয়ে,
তোমার সুকুমার অঙ্গ বুঝি বা সে পরশ করেছিলো পূর্বে—
আমি সে-তনুহীন সুরভি বাতাসেরে আলিঙ্গনে বাঁধি অতএব।[৩৮]

(৮৩ শ্লোক দ্র.) মধ্যযৌবনা নারী। উপরন্তু, প্রিয়ঙ্গু লতায় নারীর স্পর্শে ফুল ফোটে (৭৯ শ্লোকের টীকা দ্র.)। ব্যাকরণ, অনুষঙ্গ ও সৌকুমার্য— তিন দিক থেকেই এই লতা প্রিয়ার দেহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

৩৫। মূলে ‘ভ্রূবিলাস’ আছে, কিন্তু মল্লিনাথের অনুসরণে আমি ‘পতাকা’ লিখলাম— পুনরুক্তি এড়াবার জন্য, আর চিত্ররূপ স্পষ্ট হবে ব’লে।

৩৬। যক্ষ এখানে পত্নীকে ‘ক্রুদ্ধা’ ব’লে সম্বোধন করছে কেন? মল্লিনাথের ব্যাখ্যা উজ্জ্বল: ‘উপমানকথনমাত্রেণ ন কোপিতব্যমিতি ভাবঃ’। তোমার তুলনীয় কিছু আছে, এ-কথা বলামাত্রই রাগ কোরো না, কেননা— শেষ পংক্তিতে বলা হ’লো— তোমার রূপের তুলনীয় সত্যিই আর-কিছু নেই। কিন্তু নেই ব’লে যক্ষ সুখী নয়, ‘হায়’ শব্দে তার আক্ষেপ প্রকাশ পাচ্ছে।

৩৭। ধাতুরাগ: গেরিমাটি, পাহাড়েই তা পাওয়া যায়। পাথরের গায়ে পত্নীকে আঁকার পর যক্ষ নিজেকে তার পদতলে আঁকার চেষ্টা করতো, এই হ’লো মল্লিনাথের ব্যাখ্যা, কিন্তু রাজশেখর বসু একটি সরল অর্থ প্রস্তাব করেছেন, ‘সে নিজেই চিত্রিত প্রিয়ার পায়ে পড়বার চেষ্টা করত।’ মল্লিনাথের অর্থই সংগত, কেননা চোখের জল চিত্রাঙ্কনেরই অন্তরায় হ’তে পারে, পতনের নয়।

৩৮। নিরুক্তকারের টীকা— ‘বায়ু স্পৃশ্য, কিন্তু অমূর্ত, তাই আলিঙ্গনের অযোগ্য। যক্ষের এই কথা উন্মত্তের প্রলাপমাত্র, এই “আলিঙ্গন”ও নির্দোষ। (এতে যক্ষের চরিত্রদোষ ঘটেনি।)’ নিরুক্তকারের নির্বুদ্ধিতায় মল্লিনাথ ক্রুদ্ধ হ’য়ে বলছেন: ‘এই মন্তব্যই উন্মত্তের প্রলাপ, অতএব উপেক্ষণীয়।’ আমরা সর্বান্তঃকরণে মল্লিনাথকে সমর্থন করি। ১০৫-৮ শ্লোকে বিরহ-দশার চার বিনোদ বর্ণিত হয়েছে ; মল্লিনাথ ‘গুণপতাকা’ উদ্ধৃত ক’রে বলছেন যে বিয়োগের কালে

১০৮

“ ‘স্বপ্নে কোনোমতে তোমায় কাছে পেয়ে নিবিড় মিলনের জন্য
আমার প্রসারিত বাহুর উচ্ছ্বাস ব্যর্থ হয় যবে শূন্যে—
তা দেখে নিশ্চয়ই বনের দেবগণ মুহুর্মুহু তরুপত্রে
করেন নিপাতন করুণাপরবশ অশ্রুমুক্তার বিন্দু।

১০৯

“ ‘কেমনে ক্ষণিকের তুল্য ক’রে আনি দীর্ঘযামা এই ত্রিযামায়,[৩৯]
এবং দিনমান সর্বকালে হবে স্বল্পতাপ কোন উপায়ে—
এ-সব ভাবনার দারুণ সন্তাপ পায় না সান্ত্বনা কিছুতেই,
তোমার বিচ্ছেদব্যথায় নেই কোনো শরণ, হে চটুলনয়না!

১১০

“ ‘অনেক ভেবে আমি নিজেরই চেষ্টায় ধারণ ক’রে আছি নিজেকে,[৪০]
তুমিও, কল্যাণি, পরম পরিতাপে কোরো না আপনারে সমর্পণ;
এমন কে বা আছে, নিত্য দুঃখ বা নিয়ত সুখ জোটে ভাগ্যে,
কখনো উত্থান, কখনো অবনতি, মানবদশা যেন চক্রনেমি।

১১১

“ ‘রয়েছে চার মাস, যাপন করো তুমি ধৈর্যে, নিমীলিত নয়নে,
বিষ্ণু উঠবেন শয্যা ছেড়ে তাঁর,[৪১] আমার হবে শাপমুক্তি;
তখন পরিণত শরৎ-জ্যোৎস্নায় মিলনপুলকিত রাত্রে
পূর্ণ হবে সব, বিরহসঞ্চিত যা-কিছু আমাদের অভিলাষ।’

সান্ত্বনার উপায় সদৃশ, প্রতিকৃতি, স্বপ্নদর্শন ও অঙ্গ স্পৃষ্টস্পর্শ। প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদিতে যক্ষ প্রিয়ার সাদৃশ্য ছাখে, পাথরে তার ছবি আঁকার চেষ্টা করে, স্বপ্নে মিলিত হয়, প্রিয়ার অঙ্গস্পৃষ্ট বায়ুকে স্পর্শ করে। প্রতিকৃতি ও স্বপ্নদর্শন, এই দুই বিনোদ যক্ষপ্রিয়ারও ব্যবহৃত।

৩৯। যাম: প্রহর, তিন ঘণ্টা। রাত্রিকাল আসলে চতুর্যামব্যাপী, কিন্তু প্রথম ও শেষ যামার্ধ কার্যত দিনের অন্তর্গত ব’লে রাত্রির এক নাম ত্রিযামা।

৪০। মল্লিনাথ বলেন, পতির দুর্দশার বিবরণে পত্নী পাছে ভীত হয়, যক্ষ তাই ধৈর্যেরও পরিচয় দিলো।

৪১। অনন্ত বা শেষনাগ বিষ্ণুর শয্যা; বর্ষার চার মাস (১১ আষাঢ়-১১ কার্তিক) তিনি নিদ্রিত থাকেন, তাঁর উত্থানের তিথি কার্তিকের শুক্লা একাদশী। মিশরী দেবতা Horus-এর

১১২

"আরেক কথা শোনো, যক্ষ জানিয়েছে ;[৪২] 'একদা ছিলে যবে সুপ্তা
আমারই গলা ধ'রে যুগলশয্যায়, হঠাৎ কেঁদে উঠে জাগলে,
আমার বহুবিধ প্রশ্ন শুনে পরে বললে মৃদু হেসে— ধূর্ত !
স্বপ্নে দেখি তুমি রমণে উপগত অন্য কোন এক নায়িকায় ।

১১৩

" 'দিলাম পরিচয়চিহ্ন, অতএব জানবে আমি আছি কুশলে,
তোমার কালো চোখে লোকের কথা শুনে যেন না দেখা দেয় অবিশ্বাস ;[৪৩]
বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয় নাকি, কিন্তু অভাবের প্রভাবে
আমার মনে হয় স্নেহের উপচয় মহৎ প্রেমে পায় পরিণাম ।' "[৪৪]

বার্ষিক নিদ্রা তুলনীয় ; বিষ্ণুর যেমন বর্ষার, তেমনি তাঁর নিদ্রা নীল নদীর বন্যার প্রতীক, যে-বন্যা, ভারতের বর্ষার মতো, মিশরের সম্পদের নির্ভর ।

মেঘদূত কালের দুই স্তর ; মেঘের ভ্রমণের আর যক্ষের বাচনের কাল। রামগিরি থেকে অলকায় পৌঁছতে মেঘের বহুদিন ব্যয় হবার কথা (পথে-পথে বিশ্রামের ও রাত্রিযাপনের উপদেশ আছে), কিন্তু মেঘের ভ্রমণ কাল্পনিক, এই কাব্যে অধিকৃত প্রকৃত কাল একদিন মাত্র (পয়লা আষাঢ়), যেদিন যক্ষ মেঘকে তার সবিস্তার আবেদন জানালে। অতএব শাপান্তের তারিখ পাঁজির হিশেবে ১লা কার্তিকে পড়ে ; অতিরিক্ত দশ দিন উক্ত হয়নি মল্লিনাথ তা লক্ষ্য করেছেন, কোনো আধুনিক পাঠক তা নিয়ে বিব্রত হবেন না।

৪২। দূতের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ তার মুখে একটি অতি গূঢ় অভিজ্ঞান পাঠাতে হয়— এমন কোনো কথা, যা প্রেরক ও প্রাপক ছাড়া কেউ জানে না। রামও হনুমানের মুখে সীতাকে অভিজ্ঞান পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কালিদাস পূর্বসূরীকে অতিক্রম করেছেন : যক্ষের অভিজ্ঞানে কবিত্বগুণ অনেক বেশি। (বাল্মীকি-রামায়ণ : রা. বসুর অনুবাদ : সুন্দরকাণ্ড দ্র.)

৪৩। 'লোকের কথা' : মূলে কৌলীন : লোকপ্রবাদ, gossip। 'না যেন দেখা দেয় অবিশ্বাস' : আমার মৃত্যু আশঙ্কা কোরো না, বা বিরহে আমার প্রেম নিবৃত্ত হয়েছে ভেবো না। শ্লোকের প্রথম পংক্তি প্রথম অর্থের এবং শেষ দুই পংক্তি দ্বিতীয় অর্থের পরিপোষক। দুই অর্থই ধ্বনিত হবার বাধা নেই। (আমার চরিত্রদোষ আশঙ্কা কোরো না, এই অর্থও বিবেচ্য।)

৪৪। সংস্কৃতে 'স্নেহ' ও 'প্রেম'-এর সমার্থক ব্যবহারে বাধা ছিলো না, পূর্বমেঘ ৪৪-এ 'পুত্রস্নেহ' অর্থে 'পুত্রপ্রেম' আছে। কিন্তু এখানে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট ; অসহ বিচ্ছেদের প্রভাবে স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হ'লো। মল্লিনাথ 'রসাকর' থেকে সংযোগ বা মিলিত প্রেমের সাতটি পর্যায় তুলে দিয়েছেন : আলোকন (চোখে দেখা), অভিলাষ, রাগ (কামনা বা মিলনেচ্ছা) স্নেহ, প্রেম, রতি ও শৃঙ্গার। এই ক্রমানুসারে প্রেমের বিশেষ অর্থ :

১১৪

সখীরে দেবে তুমি এ-মতো আশ্বাস, প্রথম বিরহে সে তাপিতা,
ত্বরায় ফিরে এসো সে-গিরি থেকে, যার শৃঙ্গ হরবৃষখনিত,
পাঠাবে প্রিয়া তার কুশল-সমাচার, এনো অভিজ্ঞান[৪৫] সঙ্গে—
প্রভাতকুন্দের মতোই স্খলমান আমার জীবনেও রক্ষা করো।

১১৫

সৌম্য, হবে তুমি আমার বান্ধব ? আছো কি সম্মত কার্যে ?
নিরুত্তর যদি, তবুও সংশয় করি না আপনার স্বভাবে ;[৪৬]
যাচিত হ'লে পরে চাতকে জলদান, তাও তো করো নিঃশব্দে—
কেননা প্রার্থীর বাঞ্ছাপূরণেই মহৎজন দেন উত্তর।

১১৬

বিধুর আমি, তাই, অথবা করুণায়, কিংবা বন্ধুতাবশত,
জলদ, করো তুমি আমার প্রিয় কাজ, মিটাও অনুচিত[৪৭] যাচনা ;
প্রাবৃটে দেশে-দেশে ঋদ্ধিশালী হ'য়ে বিহার কোরো তুমি তারপর—
কখনো না ঘটুক তোমার বিদ্যুৎ-প্রিয়ার ক্ষণেকের বিচ্ছেদ।[৪৮]

যে-অবস্থায় বিচ্ছেদ অসহনীয়। লক্ষ্যণীয়, ৯৫ শ্লোকে যক্ষপত্নীর প্রসঙ্গে 'স্নেহ' শব্দের ব্যবহার আছে, তার মন পতির প্রতি 'সম্ভৃতস্নেহ'। (সম্ভৃত=বর্ধিত) দুটি শ্লোক পাশাপাশি পড়লে ভাবা যেতে পারে যে, বিরহে উভয়েরই 'স্নেহ' বর্ধিত হ'লেও পত্নীর মনে তা 'প্রেমে' পরিণত হয়নি, যক্ষ বলতে চায় দু-জনের মধ্যে সে বেশি ভালোবাসে।

৪৫। যক্ষের মতো, তার পত্নীও মেঘের মুখে কোনো অভিজ্ঞান পাঠাবে, তাতে যক্ষ বুঝবে মেঘ কর্তব্যে ত্রুটি করেনি।

৪৬। 'স্বভাবে' : অনেক ভেবে এই শব্দটি লিখলাম। মূলে আছে 'ধীরতা' (গম্ভীরতা, নির্ভরযোগ্যতা) ; যক্ষ বলছে, 'প্রত্যুত্তর পেয়েই আপনার ধীরতা অনুমান করবো তা নয়', অর্থাৎ, উত্তর না-পেলেও বুঝে নেবো আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন। (এই পংক্তিতে যক্ষ মেঘকে আবার 'আপনি' বলছে।)

শ্লোকের শেষার্ধ বিষয়ে মল্লিনাথের টীকা : শরতের মেঘ গর্জন করে বর্ষণ করে না, বর্ষার মেঘ বিনা গর্জনেও বর্ষণ করে। নীচজন কথা বলে কাজ করে না, সুজন কথা না-ব'লে কাজ করে। চাতক জল চাইলে বর্ষার মেঘ নিঃশব্দেই জল দেয়, তেমনি যক্ষের প্রার্থনাও সে পূরণ করবে। অর্থাৎ পরোপকার করা মেঘের স্বভাব।

৪৭। যক্ষ জানে তার অনুরোধ অনুচিত ; জড় মেঘ বার্তাবহ হ'তে পারে না। পূর্বমেঘ, ৫ তুলনীয়।

৪৮। মল্লিনাথ 'সারস্বতালংকার' উদ্ধৃত করেছেন : 'কাব্যের অন্তে নায়কের ইচ্ছার অনুরূপ সর্বজনের প্রতি প্রয়োগ্য একটি আশীর্বাদ উচ্চারণীয়।' প্রিয়ার সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ না ঘটুক— কবি এই শুভকামনা পাঠককেও জানাচ্ছেন।

মালার্মে : প্রগতি

বিষ্ণু দে

মালার্মে ! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট্ বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর ;
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে, স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, স্বরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর কষায় ;
তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দ যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য ; খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে
পাস্টেরনাকের দেশে উর্ধ্বশ্বাস কালের বাতাসে
নবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি ॥

সুন্দরের গাথা

শামসুর রাহমান

যেখানে সূর্যের তলে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা
নিসর্গে মধুর মতো, ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে
অথবা যেখানে গাঢ় চন্দ্রবোড়া সঙ্গিনীর শাখায় আকুল,
ঋতুর মধুর রণে পরাক্রান্ত, সেখানে আমার অভিলাষ
অভিসারী। পিছনে থাকুক প'ড়ে অনেক দূরের
অনচ্ছ তারার মতো লোকালয়, তাকাবো না ফিরে।

যে-চেতনা ভ্রমরকে মেখে দেয় ফুলের যৌবনে,
বসন্তের তরুণ গাছকে
দেয় মেলে অনাঘ্রাত নীলের আকাশে,
সমুদ্রের ঢেউয়ে আনে পাখিদের উদ্বেলিত বুক,
নিঃসঙ্গ কবিকে দেয় জীবনের গাঢ় মদ— শব্দের প্রাসাদ,
যে-চেতনা তৃষ্ণার্ত যাত্রীকে আনে ফের
স্মৃতির সৌগন্ধ্যে ভরা শীতল ঝর্নায়,
তারই প্রজ্বলনে
সমস্ত দুপুর ভ'রে জলের আলোর নিচে দেখলাম তাকে :
সঞ্চারিণী জলজ উদ্ভিদ যেন। এবং স্ফুরিত
অধরে রক্তিম মাছ, ফলের পূর্ণতা তার সমস্ত শরীরে।

সহসা উঠলো ভেসে গভীর জলের সেই নারী
এবং সহজে তার করতলগত
নন্দিত ফুলের ঝাড় দিলো সে বাড়িয়ে
আমার চোখের নিচে। দুর্লভ মণির মতো স্তন
ঘন হ'লো বাসনার তাপে, যেমন গ্রীষ্মের ফল
গাঢ় হয় সূর্যের চুম্বনে। দেখলাম জনহীন তীরে সব

উৎকণ্ঠা উজিয়ে এসে প্রবীণ কচ্ছপ অকাতরে
তাপ নিলো খুঁজে তার রৌদ্রের মসৃণ বালাপোষে।

সূর্যের জাহাজডুবি হ'লে সে-নারীকে বললাম,
'আমার জীবনে তুমি খেয়াল-খুশির ঝরনায়
প্রতিদিন যে-কুসুম দিয়েছো ছড়িয়ে,
সুতীব্র আনন্দে তার গড়েছি বাগান, লোকোত্তর।
আমার ত্বকের নিচে অলৌকিক যে-কীট খেলায়
সারাক্ষণ মগ্ন তাকে ভুলে গিয়ে চেয়েছি তোমাকে,
যেমন মৃত্তিকা চায় সজীব গাছের ফল, সুপক্ক-সোনালি।'

ভেবেছি বিঁধবো তাকে সহসা কৌশলে, অথচ সে
নিরুত্তর অধরে রক্তিম মাছ নিয়ে
স্বপ্নের চেয়েও আরো অধিক অতলে
গেলো ডুবে নবতর কেলির তৃষ্ণায়।

তখন রাত্রির পূর্ণ আকাশে হঠাৎ এলো চাঁদ—
অমূল্য, অপ্রাপণীয় মুক্তো। আর একটি শুয়োর
ইতস্তত পথ শুঁকে এসে গেলো জ্যোৎস্নায়, যেখানে
তারার বুদ্বুদে ফোটে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা।

মুছে গেলো দৃশ্যাবলী চারদিকে, অনন্তর একা
আমি আর অকূল শূন্যতা॥

তিনটি কবিতা

মৃণালকান্তি

একটি পাখি

মাটির খাঁচায় বন্দী পাখি
উদাস চেয়ে থাকে,
রোদ বৃষ্টি ক্লান্ত দিন ঝরে—
কে দূর থেকে ডাকে।
সইতে যে হয় অর্থহীন
অনেক দুর্ভাবনা—
কী দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালা
বাঁচার দাহ দেনা।
কালের কশায় জীর্ণ খাঁচা
হঠাৎ ভেঙে পড়ে,
চেনা আলোর আকাশ ছেড়ে
পাখিও যায় উড়ে॥

প্রেমিকের গান

সে এক অলীক স্বপ্ন—তবে তার তরে,
কেন বলো এত কথা, এত গান ঝরে?
দিনের মুখর নীড়ে রৌদ্রের মতন,
সে-মধুর ভাবনায় ভ'রে থাকে মন।
একাকী আঁধার ঘরে দীপশিখা জ্বলে,
দেয়ালে শূন্যতা কাঁপে, চোখ ভরে জলে।
সোনায় সংসার মোড়া তবু নেই সুখ,
কেন একা অন্ধকারে কেঁদে ওঠে বুক।

দিন রাত মনে-মনে চাই যেন কাকে,
ঘুম ভেঙে জেগে উঠি কার দূর ডাকে—
চেনার ভুবনে নয়; মন তাকে জানে,
সে-রূপে জীবন রাঙে, প্রাণ ঝুরে গানে ॥

অন্বেষণ

সেই দীপ আকাশ-অঙ্গনে জলে, ফুরায় না কভু যার আলো।
সে-অনামা পুষ্প থেকে ছড়ায় সুরভি, পাপড়ি ঝরে না এলোমেলো।
সে-চাঁদের নেই বাড়া-কমা, চির রাত্রি ঢালে শুধু পূর্ণিমার সুধা।
সে-জীবন আপন আনন্দে পূর্ণ, নেই তার কোনো তৃষ্ণা ক্ষুধা।
সে-সিন্ধুপাখির কণ্ঠে গান অবিরল, মানুষের বুকে তার বাসা।
সে অদৃশ্য মহানদী নিরবধি বহে, অমৃতের মিটায় পিপাসা।
সে-রামধনুর রং মোছে নাকো মেঘে, রাঙায় আকাশ চিরদিন।
সে-অগ্নির আলো থেকে জলে কোটি প্রাণ,
দীপ্তশিখা জাগে মৃত্যুহীন।—
রৌদ্র বৃষ্টি ধূলি ঝড়ে অনির্ণীত পথহীন দূর দিক-দেশে,
উদয়াস্ত ফিরি আমি স্বপ্নচারী, সেই মহাপ্রাণের উদ্দেশে ॥

জলছবি

রাজলক্ষ্মী দেবী

আলো-ঝলমল প্রজাপতি-বনে আমি।
লাল ভোরে তুমি শাল-গায়ে চলো আগে,
খোয়াইয়ের পথে পায়ে-পায়ে চলি, থামি।
উজ্জ্বল সব জলছবি ভালো লাগে।

যন্ত্রণা নিতে ডাক দেবে যেই,—ফাঁকি
—মন্ত্রে পালাবো আরো দূর, ঢের দূরে।
স্বেদ নেই, আহা, ছেদ নেই, জানো না কি?
—মনের আকাশ লেপে গেছে রোদ্দুরে।

উড়াল হাওয়ায় আলুথালু চুলে আমি।
কৃষ্ণচূড়ায় ফুলের পতাকা ওড়ে।
আল্‌পথে ভারি টাল খেয়ে উঠি নামি,
তবু জোরে চলো, গাড়ি, চলো আরো জোরে।

তেমনি অনেক প্রবল বেগের সুখে
পুতুল-প্রেয়সী বসবো তোমার পাশে,
তাকাবো আবার সেদিনের সেই মুখে,
—কী জানি কী পেয়ে মন তাকে ভালোবাসে।

আবার আষাঢ়ে জল-ঝরা রোদে আমি।
শালের গুঁড়িতে বসেছি একলা, একা।
মুহূর্ত কাটা-হীরের মতন দামি,—
কখনো সহসা পাবোই তোমার দেখা।

ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে পাল-তোলা খুশি বেয়ে
তারপরে আমি ছুঁতে যাবো কোন তীর!
আহ্লাদি রোদে আচমকা মদ খেয়ে
হাসিতে খুশিতে হয়ে যাবো চৌচির!

কানারীয়

[লা পামাস্ দ্বীপ থেকে ফেরার পথে]

শান্তিকুমার ঘোষ

উঁচু-ঢেউ নিচু-ঢেউ পাহাড়ের সারি :
য়ুকালিপ্‌টাস ঘন ছায়া উষ্ণ সুখ কানারীয় গীত।
ওখানে জমাট ফেনা তুঁত-গলা স্বপ্নে স্থির জল,
ঘুমন্ত বিরাট মুখ্ প্রাচীন লাভায় ঘেরা বিন্দু পল্লীখেত ;
অগাধ বিস্তৃত শান্তি ছুঁয়েছে আকাশ-শীর্ষ উপত্যকা ঢেকে।

লতার আড়ালে মুখ রেশম-ওড়না-লঘু রৌদ্র-হাসি দ্রাক্ষানীল চোখ—
হে বিদেশী, থামো থামো…চকিত ইশারা :

পুষ্পিত পথের প্রান্তে অদৃশ্য সমস্ত ধন আরক্ত ব্যথায়।

তিনটি কবিতা

দেয়ালটা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বোবা দেয়ালটা শাদা দেয়ালটা
হঠাৎ লালচে,
রঙ্গনটিনী ভ্রমরার কাছে
আদর কাড়ছে।

বোবা দেয়ালটা শাদা দেয়ালটা
রঙ্গনটীর পায়ে মাথা কোটে,
রঙ্গনটীর পায়ের আলতা
লাগে নীরক্ত মুখে আর ঠোঁটে :

এতদিন পরে ও কিছু বলছে :
'এই যে রক্ত এই অলক্ত
আমার কঠিন পাঁজরে জলছে
তার দাবি বড়ো ভীষণ শক্ত।

এই যে আমার শরীরে অধরে
স্বাক্ষর দিলি, তোর পায়ে প'ড়ে
ভেঙে যাই যদি, তবু বল ওরে
ভ্রমরা, পালিয়ে যেতে পারবি তো ?'

আমি তো পঙ্গু, নিশ্চল বোবা
আমি যদি হই তোর মনোনীত
কোন করবীতে আমি তোর খোঁপা

সাজিয়ে করবো আরো মনোলোভা—
বঁধুয়া, তখন তুই কার মিতা ?
ভ্রমরা তবুও নিশ্চুপ, তবু চিত্রার্পিতা ॥

পান্থশালা : নীলকণ্ঠপুর

এখুনি লণ্ঠন জলবে। নিভবে রোদ্দুর।
ছুই পাহাড়ের মধ্যে একটি আকাশ
বুকে নিয়ে আমি আর নীলকণ্ঠপুর।

এই মুহূর্তের আমি অন্ধ ক্রীতদাস
নিরুপায় নিরালায় দেখে যাবো আমি
ছুই পাহাড়ের খাদে সূর্য মৃত্যুগামী।

অথচ লণ্ঠন জলবে। মৃত্যু কত দামি ?
মৃত্যু, ছাখ প্রদোষের নীলকণ্ঠপুর
একটি জোনাকি, এক ইউক্যালিপ্টাস ॥

নতুন

ও-রকম ক'রে কথা ঘোরাস না পাখি
রাত্রি এখন মূর্ছিত হ'য়ে আছে,
ফিরিয়ে যখন দিয়েছিলি, সেই স্মৃতি
বুকে ক'রে ও যে ম'রে গিয়ে যেন বাঁচে !

বৃথা হ'লো তোর মালতীর ডালে-ডালে
পাতায়-পাতায় কথা ঘোরানোর রীতি।
নতুন প্রণয়ী এলো ঐ মায়াজালে :
শেষরাত্রির আঙুলে রক্তরাখি ॥

প্রথম দেখা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যেন ত্বপুরের ঘুমের পর সন্ধেবেলায় উঠলো নারী, ধীরে-ধীরে,
ফোলা-ফোলা চোখে, শিথিল আলস্তে ; ঈষৎ মুক্ত
রঙিন ঠোঁটের ভিতরে লোনা জিহ্বা যেন
তার অকাতর, অলজ্জ, অসংকোচ আমন্ত্রণ।
পাতলা ধোঁয়ার
কুণ্ডলী ছাপিয়ে ঐ নারীর মতো উঠলো চাঁদ, মগ্ন
করলো নিজেকে সোনালি উন্মীলনের গূঢ়
অন্তঃপুরে, আর তার শাদা, নির্দোষ, অনাবিল
আবির্ভাব আমাকে উন্মুখ করলো আমারই
পাশের দিগন্তছাড়ানো আকাশে ; দেখি,
এক তন্বী রূপসী,— জানতেম না যে তাকে ভালোবাসি,—
কোথায় যাবে যেন, তাই পথ চলছে, আর
তার দোতুল চলমান রূপ তখনই রক্তাক্ত করলো আমার
হৃদয় ;

সারা রাত তার পিছু-পিছু ব'লে বেড়ালাম করুণ গলায়, না,
যেয়ো না, আমাকে ছেড়ে চ'লে যেয়ো না ॥

সনেট

অর্চন দাশগুপ্ত

এ-রাতের আঁকাবাঁকা কবোষ্ণ শিরায়
কালো রক্ত নেমে এলো আদিম কাফ্রির,
আর তুমি নেমে এলে এই কবিতায়
ক্যানা-র মসৃণ গালে শিশিরের মতো।

আমিও ভেবেছি কতো তোমার স্নায়ুর
সোনালি শিকড়ে মিশে ব'য়ে যাবো, আর
এ-রক্তিম বাবেল-এর ভাষার দাঙ্গায়
জন্ম হবে কোনো এক এস্‌পারেন্তো-র।

তা ছাড়াও কোনো এক চতুষ্কোণ ক্ষণে
চোখের এ-জল হবে তারার সংগীত
এবং কখনো তুমি আঙ্কিক শূন্যকে
আশ্চর্য আগুন জেলে সংখ্যা ক'রে দেবে।

কিন্তু কি তোমার বেদ তিনটি চিঠিতে
শেষ হ'লো ? তারপর সব চুপচাপ॥

বস্তুত অরণ্য আমি

সৈয়দ শামসুল হক

"I am indeed as a forest and as a shade of sombre trees......"
—Nietzsche

আমি এক অন্ধকার অরণ্যের মতো
দীর্ঘ, ঋজু, সুপ্রচুর, বিশাল, বিস্তৃত ;
মূল কন্দ দৃঢ় কাণ্ড লতা,
জন্তু, কালো, সবুজের সচ্ছলতা
নিয়ে আছি ; কিন্তু আছে হতভাগ্য শ্বাপদের শব
ইতস্তত অনিবার্য ; এ-অরণ্য অনন্ত অরব—
সর্বোপরি সংগীতের ক্ষীণ মূর্ছনা
এবং সম্পূর্ণ আমি, জানি সান্ত্বনা।

আসতে চাও এসো, কিন্তু মৃত্যুভয়
তীব্র হোক, নষ্ট ক'রে দিক সে-হৃদয়।

গভীর রহস্য কত, জানতে যদি—
তৃষ্ণার সময়ে জলে স্বচ্ছতোয়া নদী
লুপ্ত যার স্রোতাবলী অল্পকাল পরে :
পাতা প'ড়ে কুলো হয় সেই বনে সহস্র বিবরে
দুর্লভ হীরক এক, রত্নমণি, মসৃণ হরিণী
এবং সেখানে কাঁদে লোকশ্রুত শাপভ্রষ্ট মুনি ;
জানতে যদি কিছু তার শ্লোক, হরিণী চীৎকার,
কখনো রত্নের খোঁজে তুচ্ছ কার রমণী, সংসার !

জানতে চাও জেনো, কিন্তু উপবাস
দীর্ঘ হোক, নষ্ট ক'রে দিক সে-উল্লাস।

২

এবং বসন্ত নামে কোনো-কোনো রাত্তিরের ছলে
তখন বিরাট হয়, যাকে বলো চাঁদ—ক্রমে জলে
সারারাত, আর অন্ধকার
যেন তাড়া খেয়ে এক হলদে কিংবা ধূসর চিতার
অসহায় গোঙানিতে—মুগ্ধ বাতাসেরা—অপহৃত ;
ধ্বনির ক্রন্দন শূন্যে ক্রমে নিঃশেষিত
চার প্রহরের দূরে। এবং হরিণী
অকস্মাৎ সুগন্ধ বিস্তৃত করে স্বয়ং, মোহিনী,
বিস্ময়ে বিমূঢ় থাকে।
কিন্তু সে একেলা
সেই অতিমানুষের মন, জানি, ডোবে তার দর্শনের ভেলা
আপনারই ঘূর্ণাবর্তে ; সারাৎসার পান ক'রে নীল-
কণ্ঠ কে কবে হয়েছে বলো ?—কিন্তু ঝিলমিল
পাতা ও জ্যোৎস্নার মানে, অর্থাৎ জীবন,
সহসা প্রমুক্ত হ'য়ে একেক মুহূর্তে করে গাঢ় উচ্চারণ
বিশ্বাসের শান্ত উপচারে।
এবং সে ক্ষুদ্র কত—বিদ্ধ করে তাকে বারে-বারে
এ-যন্ত্রণা—প্রেম, স্বর্গ, বিশ্বাসের দ্বার
অনন্তে প্রোথিত ; সে নিজেই নিজের শিকার।

জানতে চাও তবু, জেনো, কিন্তু প্রেম প্রেমের বিশ্বাস
শুভ্র হোক, নষ্ট ক'রে দিক সে-উল্লাস ॥

লগ্ন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

না, না। তোমাকে তো নয়। জনারণ্যে বিভ্রান্ত বিক্ষেপে
ধুলোয় স্বেদাক্ত স্বাদে শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ সম্পাতে
যে-যাত্রা অন্ধের মতো প্রত্যহের ধাবমান স্রোতে—
সেখানে তোমাকে নয়। হা-হা স্বরে হাওয়ার আক্ষেপে
এ-জগতে প্রত্যাশা স্থবির।

প্রাণভয়ে আনো ক্ষীণ
শাল্মলীর শীর্ণ ছায়া, অশ্বত্থের উদ্দীপনাহীন
দুঃস্থ দীর্ঘশ্বাস। দুঃস্বপ্নে বিদীর্ণ রাত্রি দ্বিধান্বিত,
দিনের রাতের স্নায়ু অন্ধকারে বিদ্বেষকঠিন ;
এইখানে ভুলেও এসো না।

অন্তরালে কঠিন নিশানা।
সময়ের ইন্দ্রজালে প্রান্তর আকাশ
পূর্ণ করে, জাদুদণ্ডে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে জড়ায় চেতনা ;
ছড়ায় ভ্রান্তির বেগে মাঠে, নীলে নিষ্ঠুর সন্ত্রাস
দুই হাতে। এখানে এসো না।

প্রণয়ের আকর্ষণে
প্রহরাপীড়িত চোখ মুক্তি খোঁজে প্রথম চুম্বনে,
বুদ্ধিহীন ক্ষণিক দীপ্তিতে। আজ সে উদ্যম থাক,
জগদ্দল পাষাণের ভার বুকে পৃথিবী নির্বাক ;
সুপ্তিহীন। এখন এসো না।

আজ মনে পড়ে

শ্রাবণমেঘের সেই গুরুগুরু ধ্বনি। দিকে-দিকে
সর্বত্রই ছড়ানো স্মরণ; সর্বত্র নিহিত মর্মমূলে
চ্যুত পল্লবের স্মৃতি,—বিজয়ে বিষাদে অনিমিখে
অমিত বীর্যের অন্বেষণ।

সময়ের জাদুঘরে

কঙ্কালের স্তূপ স্তরে-স্তরে; প্রণয় বিচ্যুত হ'য়ে
জীবনের মায়াপুরে যতো শব কালিমায় ক্ষয়ে
স্তূপায়িত, বিনষ্ট সংহতি। বসন্ত যদিও ঝরে
সে তো শুধু ছদ্মবেশ,— এইখানে এখন এসো না॥

ছত্তিশগড়ের লোক-সংগীত

[ভেরিয়র এলউইন-এর ইংরেজি থেকে]

বিকাশ দাশ

১

ছেলে :

কমলালেবু আনতে যেতাম
হ্রদের পারে,
কিন্তু ভয়, পিছলে পড়ে
ডুববো জলে।

মেয়ে :

আমিও যেতাম আনতে কলা
হ্রদের ধারে,
কেবল ভয়, পিছলে গিয়ে
ডুববো ব'লে!

২

কুকুর যখন ডাকল গাঁয়ে
ছিলাম মশগুল
স্বপ্নে; যখন ভাঙল ঘুম, কিছুই নেই, শুধু
রাত্রি করে ধূ ধূ।
তবুও জানো বাতাসে পাই তোমার গায়ের ঘ্রাণ।

৩

ওরে বন্ধু, তাকে ছাড়া বাঁচব না রে আর—
বাঁচব না রে,— বাঁচব না রে আর!
পরো তোমার কুসুম-রঙা শাড়ি
ঝলমলাক রং-বাহারি পাড়।

ঝুলনে আমি ঝুলব ব'সে-ব'সে,
ফাগুন এলো—ফাগুন এলো আজ!

গাইব গান চলো,
ঢোলকে বোল, মধুর বোল তোলো!
স্বামীর ঘরে অঝোরে কেঁদে-কেঁদে
প্রেয়সী গেল কুশী নদীর ধার।
তাকে ছাড়া বাঁচব না রে আর।
ওরে বন্ধু, বাঁচব না রে আর।

৪

মহুয়া ফুল কুড়োবে নাকি, মেয়ে?
এসো তবে, সঙ্গে আমার এসো।
তেঁতুল কাঁচা, জামগুলো সব কালো,
কলার ঝাড়ে থোকায়-থোকায় কলা।
মহুয়া ফুল কুড়োতে যাবে নাকি?
এসো, আমার সঙ্গে তবে এসো।

৫

আংটি, বালা, রুপোর মল
চাইতে পেলো মেয়ে,
পেলো আরো ঝকঝকে কঙ্কণ।
তুমিও যদি চাইতে, পেতে, রাজা,—
ও-মেয়েটির সোনার যৌবন।

৬

কুড়িয়ে গোবর ঘুঁটে দিতেই গেল
সময় আমার, নামল রাত, রাজা।
রাখো আমায় সঙ্গে তোমার রাখো।

কাঠ কাটতে গিয়েছিলাম বনে,
আঁটি বেঁধে ঘরে ফেরার পথে—
নামল রাত, রাজা।
রাখো আমায়, এবার রাজা, রাখো
পায়ে পড়ি, ক্ষমা করো, রাজা
রাখো আমায়, সঙ্গে তোমার রাখো।

৭

হরিণীর কাছে হরিণ এসেছে একা।
আমার প্রেয়সী খোঁপায় গেঁথেছে ফুল,—
সে-ফুলগন্ধে পথের বাতাস হ'লো আকুল

না মিলুক নাম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

না মিলুক নাম,
তোমার নিমীল চোখে তবু সেই আগুন উদ্দাম
প্রকাশের প্রতীক্ষায় দেখেছি কোরক।
না মিলুক, এ যে সেই চোখ,
চিনেছি। আবিষ্ট ওই নিশির নূপুর
কেন শ্লথ হ'য়ে আসে, কেন ওই তামসী বধূর
চরণে সহসা আসে দ্বিধা!

শুধুই কি সত্য ওই প্রাথমিক দেহের অভিধা?
শুধুই কি মোহদ্যুতি অগ্নিরূপ দেখে
বিকচ নলিনীদলে অলি জোটে ক্ষণেকে ক্ষণেকে?
মর্মরিত নিশিতলে যার
বার্তা রটে, তা কি শুধু সুতন্বী শ্যামার
একান্ত ভঙ্গুর দেহখানি?

মেলেনি পারানি,
অন্ধকার নদীজল তাই আরও রূঢ় অন্ধকারে
নিরুদ্দেশ রেখেছিল আপনার বধির সত্তারে।
সহসা কী সচকিত স্বরে
সম্বিৎ ফিরায়ে দেখি তখনও সুদূরে
বসন্তের ফুলবনে ঘুরে মরে অনঙ্গ নিষাদ!
অমর তূণীরে তার গান্ধর্বের সনাতন স্বাদ,
অব্যর্থ সায়কে
উত্তরঙ্গ সপ্তসিন্ধু আজও ফেরে ধ্রুব স্বপ্নলোকে:
যেখানে আকাশ
আনীল মৃত্যুর মাঝে উজ্জীবিত আজও বারোমাস॥

সেদিন নওল সন্ধ্যা, নভতল উদাস পূরবী;
মন্দগতি হাওয়ার সুরভি
নিদ্রালু পিয়ালকুঞ্জে দিগন্তের প্রিয়বার্তা আনে।
কিসের সন্ধানে
অঙ্গনে দাঁড়ালো এসে শীর্ণতনু চাঁদ,—
কম্পিত অধরে তার মদিরার অবোধ আহ্লাদ
ভেসে এল দুরান্ত ধরায়
দুরন্ত ধারায়,
ভাসালো সে নদীবন অশান্ত আবেশে।
মনের বিস্তৃত মহাদেশে
জানি না কী গূঢ় মন্ত্রে দাঁড়ালো যে উঠে আচম্বিতে
অকম্প্র শিখার স্থৈর্যে আপনার পরিচয় দিতে,
তার পরিচয়
সংকেতের মৌনে তা কি সমুজ্জ্বল নয়?

না মিলুক নাম,
তোমার নিমীল চোখে তবু সেই আগুন উদ্দাম
পতঙ্গের মুক্তি যে আগুনে!
না থাক অর্ঘ্যের ডালি উদ্ভাসিত উজাড় ফাল্গুনে,
না থাক মন্ত্রের ধ্যান উৎকীর্ণ আলোকে,—
আমার বেদনবাণী লেখা আছে দুটি মুগ্ধ শ্লোকে,
রহস্যের বিনীত বন্দনা।
অয়ি স্খলগনা,
যে-লগ্নের লিপি পণ্য ক'রে
এইমাত্র সপ্তডিঙা ভেসেছে সাগরে,
শুধু সেই মুহূর্তে অন্তত
আমাকে ঘুমাতে দাও গহন বিস্ময়ে চন্দ্রাহত!

জলছবি

প্রতিমা পাল

সূর্যের চন্দন-টিপ মেঘের কপালে,
ভোরের আকাশ সাজে সোনালি সবুজে,
শিশিরের স্বচ্ছ রং বাতাসের নীলে
ঝুমকোলতায় ঘেরা চাঁদের গম্বুজে।

ভোরের সমুদ্র যেন স্তব্ধ মায়াবিনী
হিংস্র চিতার মতো লুব্ধ লালসায়
দিনের কঠিন দেহে উচ্ছ্বাস জাগায়
তারার নখরে ছেঁড়ে কামনা-হরিণী।

ভোরের অরণ্যে জাগে সোনালি শকুন
বঞ্চিত রাত্রির পাখি মৃত্যুর তুষারে
হিম হ'য়ে আসে; বিপ্রলব্ধ সকরুণ
ডালিম-রোদের মুখে লাল অশ্রু ঝরে।

জলছবি-রং ভোরে করুণ যন্ত্রণা
সূর্যের একক চোখে মুখর সান্ত্বনা।

কাণ্ডাঘাট স্টেশনে ভোর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

গৌরীবধূ আকাশে যাবে না
আলোকলতা কুণ্ঠাময়ী ভোরে,
ছিন্ন ক'রে ছড়িয়ে দিল তাকে
মহেশ্বর-বাহুর অভিমান।

*　　*　　*

এপাশে বুঝি কুড়চি ফুল ফোটে
ওপারে চাপা কান্না গুরুগুরু,
পৃথিবীময় শান্ত ভোর নামে—
তবুও কারা শুনেছে ডম্বরু।

পুনশ্চ

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুগৃহে পাঠশেষে কেউ গেছে মহুয়া কুড়োতে,
রাখাল পিতৃব্য কারো, তাই তাকে যেতে হ'লো মাঠে
কাঠুরিয়া একজন গেল জলে শরীর জুড়োতে
অন্যান্য অনেকে আজো অকারণ পথে-পথে হাঁটে ;

সেই পথে ছায়ারঙ্গ, অরণ্য কোথাও জেগে আছে,
খরস্রোতা নদী কিংবা উঁচুনিচু উপত্যকা জলা,
অন্ধকার ভয়ংকর হিংস্র কত শ্বাপদের কাছে
সমর্পিত দেহ, প্রাণ মূর্ছাহত কেবল উতলা ;

মন শুধু সঙ্গে আছে, আর তার মৌন জাদুকরী
প্রভাবে বাঁশিতে কেউ হৃদয়ের সব দেয় ডালি,
রুদ্ধদ্বার নগরের পথে-পথে সতর্ক প্রহরী—
শ্রোতৃবৃন্দ ব্যঙ্গভরে দিতে পারে তীব্র করতালি ;
আমি হাঁটি, হাঁটি কেন, জানি আমি বহু পথ বাকি
যার সঙ্গে দেখা হ'লো সে আবার দেখা দেবে নাকি !

নীল চিঠি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ দিয়ে অন্তহীন আকাশের মন
কতোটুকু ভরা যায় ? কতোটুকু স্নায়ুর কম্পন
সওয়া যায়— অনিদ্রায় রাত ভোর পাশের বালিশে।
সাবলীল নীল চিঠি। মুছে ছ্যায় চোখের কালি সে
কতোটুকু ! মা তাকে আড়ালে ডাকে, দিদির চোখের
অপলক আক্রমণ, দাদাটির উদ্ভট শ্লোকের
বিশ্লেষণ— সব তাকে শুনতে হয়, গুনতে হয় দিন—
মাস-বছরের কোঠা। টিকটিকিটা চিন্তাভারহীন
দেয়ালে সাঁতার ছ্যায়, নেই তার পতনের ভয়।

কুমোরে পোকার হাতে আরশোলা কাঁচপোকা হয়।

জারুলের, শিরীষের ডালে ফুল ; গুলমোরের পাতা ;
সব-কিছু ভুলে থাকে, অপঠিত পরীক্ষার খাতা ;
ভরে না মনের শূন্য কলসি, মোছে না ঝুলকালি।
বোন ব'লে, 'এমনি ক'রে কতদিন দিবি জোড়াতালি ?'
নিটোল, কোমল দুটি স্তনের ঘনত্বে লীন তার
নীল চিঠি— গান গায় অনাগত একটি তারার।
সদ্য স্নান-সারা দেহে মুখর আলোরা নেমে আসে ;

ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘগুলো রাঙা হয় সন্ধ্যার আকাশে।

চক্রবৎ

শোভন সোম

বন্ধুরা সবাই দূরে-দূরে ;
বৎসরান্তে দেখা ঘুরে-ঘুরে
কখনো হয় না নিয়মিত।

সবার কাছেই আমন্ত্রিত
আমি, আর প্রত্যেকেই তা-ই —
কেবলই চিঠির পাতা ভ'রে
ভ্রমণের খসড়া বানাই—

—'এখানে মার্বেল রক'— কেউ
—'জ্যোৎস্না রাত্রে সমুদ্রের ঢেউ'—
—'তুমি নাকি দ্যাখোনি কুতুব !'—
—'চাচাই প্রপাত দেখে যাও'—

অথচ, চিঠির জমে স্তূপ
খুঁটি বাঁধা সবার জীবন,
মনে-মনে অচ্ছেদ্য বন্ধন—

যদিও নড়ি না এক পা-ও
বৎসরান্তে একই আমন্ত্রণ ॥

দুটি কবিতা

দুই তীর

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
শেষ-সূর্যের আবীর জড়ানো পাড়ে ;
ঐরাবতেরা শুঁড় তুলে চারধারে
সহসা ছড়ায় উর্ধ্বে ঘন তিমির।

শান্ত বিকেলে এ কী প্রমত্ত ঝড় !
ব্যাকুল আকাশে ত্রস্ত পাখিরা ফেরে—
সাঁওতাল মেয়ে দল বেঁধে কাজ সেরে
দ্রুত পায়ে চলে, পারুলডাঙায় ঘর।

বারে বারে তুমি জীবনে ছড়াও ভয়
তবুও সন্ধ্যা, তবু যে নীড়ের টান—
হৃদয়ের ঝড়ে নেই কি পরিত্রাণ
শেষ-সূর্যের স্তম্ভিত বিস্ময় ?

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
দ্বিধা-কম্পিত হৃদয়ের দুই তীর।

গৌরী

রোদের উচ্ছ্বাস মুছে
শেষ আভা হাসিতে ছড়িয়ে
কাঞ্চন-বরনী তুমি এলে।

রোদের গন্ধের রেশ তোমার শরীরে
চোখে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার প্রদীপ।

ছড়ালে সুরের জাল
ক্লান্তি মুছে ঝরল বকুল,
মনের আকাশ ভ'রে
গন্ধ হয়ে গান এল ভেসে

তারা-ভরা রাতের বাতাসে।

জরাসন্ধ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হল পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, কৃপণ জলে তেচোকো মাছের আঁশ গন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি? আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে গাহনে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।

তবে হয়ত মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার হয়ে আছি, অন্ধকার থাকবো এবং অন্ধকার হব।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে॥

বৃষ্টির সখ্য

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ছুটতে-ছুটতে এসেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

বাইরে সে এতক্ষণ দাউদাউ ক'রে জলছিল
রোদ্দুরে।
মমতায় উদ্বেল দুটি চেনা চোখের কাছে এসে
ধ্ব'সে পড়ল যেন ভাঙাচোরা পোড়ামাটির পুতুল—
জ্যৈষ্ঠের কুঠারে মাঠের মতো চেরা দাগ সারা গায়ে।

তারপর হাড়গোড়-বের-করা আর ছাল-ওঠা
ঝুম্‌ড়োনো পেয়ারা গাছের মতো ঝুঁকে দাঁড়ালো
পাতাশূন্য।
শিকড়গুলো ভিখিরি ছেলেদের মতো খিদেয়
মাটির অন্ধকারে গড়াগড়ি দিয়ে মাটিকেই কামড়ায়।
আর কোনোমতে সে-ও জড়িয়ে ধরলো তার বুক
হিল্লোলিত প্রেমের উদ্বেল ক্ষমতায়।

আর তক্ষুনি কী অপরূপ
শিউলির মতো ফোঁটা-ফোঁটা ফুলের শব্দ!—
বৃষ্টির চেয়েও কোমল শব্দে ভরা তার সুমধুর শরীর
কলসের মতো ঢেলে পড়লো পোড়ামাটির দেহে
মমতায়,
        ক্ষমতায়।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই
বৃষ্টির নদীতে হরিণের মতো মুখ রেখেছে
সব তৃষ্ণার্ত শিকড়।

বুড়ো লোকটা

তপন চট্টোপাধ্যায়

শাদা মাথা নড়ে আর সকৌতুকে চোখ বুজে হাসে।
ঝোলানো দাঁড়ের তোতা, তার সঙ্গে কথা ব'লে-ব'লে
সময় কাটিয়ে দেয়, তামাকের হুঁকো সঙ্গে চলে,
মুহুর্মুহু চাপে বুক, খুকখুক অবিরাম কাশে।

এই বুড়ো বহুদিন চেতনার জালের ভিতরে
অনেক দিনের চেনা অষ্টাদশ শতকের কাল,
গানের কলির মতো অতীতের, বর্তমান স্বরে
সে যেন আশ্চর্য আর বহুমূল্য স্মৃতির প্রবাল।

নির্জীব শরীর তার, কিন্তু যেই হাসে অকারণ,
তোবড়ানো দু-গাল শাদা দাড়ির জঙ্গালে অকৃত্রিম
কেমন করুণা জাগে, মনে হয় এই তো অসীম
কালের সৌন্দর্য আর শুভ্রতম মানব জীবন।

দাঁড়ের পাখিটা ডাকে সারাদিন, সন্ধ্যা যেই নামে
মূক হয়ে ব'সে থাকে ধীরে-ধীরে স্তব্ধতার সুখে,
ডুবে যায় ঠিক ঐ বুড়োটার মতন নাটুকে
বেজায় গম্ভীর মুখে কিছু ভাবে, অথবা আরামে

নতুন স্বপ্নের মুখে আরেক আশার কথা শোনে,
ন'ড়ে-চ'ড়ে ফের সেই স্তব্ধতায় ব'সে কাল গোনে।

দুটি কবিতা

অভিজ্ঞান

তারক সেন

রাত্রির আমডালে কোকিলটি ডেকে-ডেকে
ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে গেলো।
আর তখন সে উড়ে এসে বসলো
তার পাশের ডালে। উষার যৌবন জ্ব'লে
উঠলো নির্জন দিগন্তে। বিষণ্ণ রক্তাভ চোখ নিয়ে
কোকিলটি দেখলো সূর্যোদয়।
ওর রাঙা চোখের মতোই এই ভোর।

আমিও কি ডেকে-ডেকে ক্লান্ত হয়ে যাই নি ?
প্রত্যহের নতুন প্রতীকে আমি ডেকেছি।
জনতার মাঝখানে হেঁটে যেতে-যেতে
হঠাৎ অতিক্রম করেছি আমার স্বপথের সীমান্ত
কখন এসে পড়েছি অন্য এক দিগন্তে। আর
কখনো মৃদু ভাষে ডেকেছি— জনবিরল মধ্যাহ্নের সুরে।
কিন্তু আমার সব ডাকার পিছনে
অমনি এক ক্লান্তি
আমার ডাকার সব সুর, সব ধ্বনি
মুছে নিয়ে যায় তার নিপুণ চাতুর্যে।
আমার হাতের মুঠি থেকে
একটি সোনার হার যেন কেউ ছিনিয়ে নিলো
শহরের অন্ধকার গলিতে।

তবুও কি সে-পথ ছেড়েছি ?
তবু চোখ ভালোবাসে দৃশ্যের ইঙ্গিতে ভুলে যেতে
তবু কণ্ঠ ভালোবাসে প্রাণের গানের সুরে সুর দিতে—
তবু মন ভালোবাসে— শীতের শুকনো বাগানে পায়চারি।

যে-দিন চাইনি— সে-দিনেরও নদী পার হ'তে—
দিতে হোল সাতকড়া কড়ি
যে-রাত্রি চাইনি— তারও হাত ধ'রে
আমাকেই যেতে হ'লো ভোরের কুটিরে
তখনও কোকিল ডাকছিলো ঠিক এই সুরে।
আবার কালও ডাকবে এই কোকিলটি
অবিচ্ছিন্ন। আমি জানি— আকাশের দিকে
না-তাকালেও— চাঁদ উঠবে, তারা ফুটবে— আর
রাতের কোকিল ডাকবে।

তাই যে-রাতই আসুক—বলবো, এসো।
যে-দিনই আসুক— বলবো, এসো।
আমার ভালোবাসার নামাঙ্কিত আংটি
পরিয়ে দেব তাদের আঙুলে। চোখে চোখ রেখে
গল্প শুনতে বসবো জীবনের।

দ্বীপ

সত্যি বলছি— চোখের জল ফেলো না।
আমি তা সইতে পারি না ব'লে নয়,
আমি তা মানতে পারি না।

দ্যাখো, কত কাছাকাছি আমরা,
আর কত কাছাকাছি আমাদের প্রতিবেশী, শত্রু ও বন্ধুরা।

আমাদের পিছনে সজাগ শত্রুর হিংসা,
আমাদের জন্য কাতর বন্ধুর হৃদয়।

তবু যদি চোখের জল ফেলো
শত্রুর হাসিতে ঝনঝন ক'রে উঠবে
এই পুরোনো ঘরের দরজা জানালা,
আমাদের গ্রুপ ফোটোখানা হয়তো ঝনাৎ ক'রে
মাটিতে প'ড়ে চুরমার হয়ে যাবে
আর পাশের বাড়ির মিষ্টি বৌদি—
ঘুম ভেঙে ছুটে আসবে আমাদের খবর নিতে।

এসে দেখবে— চারদিকে চোখের জলের ঢেউ
তুমি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো
পৃথিবীর সুন্দর ভূভাগ থেকে।
বলো, চোখের জল ফেলতে-ফেলতে আমরা কি
জলবেষ্টিত দ্বীপ হয়ে যাবো না ?
তখন তোমার আর আমার
আমার আর মিষ্টি বৌদির মাঝখানে
শুধু লবণাক্ত জলরাশির কলরোল।
তখন আবার আমরা কাঁদবো—
পরস্পর হাতে হাত রাখার জন্য
কানে-কানে কথা বলার জন্য
নারকেল গাছের পাতার আড়ালে
ঝিরঝির চাঁদ দেখার জন্য।
বলো, কাঁদবো না কি ?

তাই বলছি— কেঁদো না।
কান্নার উপকণ্ঠ ছেড়ে— চলো যাই
বৈকালী শহরের ভিড়ে,
অথবা নির্জন মাঠে ব'সে-ব'সে শহরের সন্ধ্যা দেখি, চলো।

আবিষ্কার

উৎপলা মুখোপাধ্যায়

নানান কাজের ভিড়ে দ্বন্দ্বময় সকালে সেদিন
দেখেছি পায়ের কাছে পিঁপড়ের ব্যস্ত চলাফেরা,
সূর্যের বিলাসী আলো এপারে ওপারে উদাসীন,
দিগন্ত সমুদ্র-নীল—পাহাড়-বলয় দিয়ে ঘেরা—
এ-ঘরে ও-ঘরে গান, শিশুর হাসিতে যায় দিন।

খেয়ালি পিঁপড়ে কি জানে এ-পৃথিবী, কিংবা মায়াময়
আকাশ-প্রচ্ছদপট, পৃষ্ঠা যার কখনো খোলে না ;
অথচ অস্থিরমন মানুষের অতৃপ্ত বিস্ময়
এ-রহস্যে মাথা খোঁড়ে ; ব্যর্থ হয়, তবুও ভোলে না
এ-ভাবেই দগ্ধ হ'তে, দুঃখ পায় অনন্ত সময়।

সুখী পিঁপড়ে, ছোটো মন, সার্থকতা পায় চিরকাল,
মেলে দেয় এককণা শান্তি তার সব আয়োজনে ;
অতৃপ্তির চরাচরে অজানার মগ্ন ইন্দ্রজাল
উদ্বিগ্ন করে না তাকে, বিড়ম্বিত হয় না জীবনে ;
তেমনি কি ক্লান্ত মনে আমিও সে-সুখেরই কাঙাল ?

কার লীলায়িত মনে ছুটে যায় এই ছোটো মন,
বিস্ময়ের ব্যাপ্তি ছেড়ে, রহস্যের জ্বালা থেকে দূরে
সামান্যে আশ্রয় চায় পুণ্যতীর্থ পিঁপড়ের মতন !
দৈন্যের দিগন্তে আজ জীবনের বধির দুপুরে
খণ্ডিত মেঘের মায়া জাগালো কি অকালবোধন ?

স্বপ্নভরা রাত

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নভরা রাত— তারারা তন্ময় :
তোমার কালো চোখে আলোর শিখা জলে,
আমার মন চায় সুরের বিনিময় ;
স্বপ্নভরা রাত, তারারা তন্ময়।

সুপ্ত কামনারা শোণিতে কথা বলে,
তোমাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মদির হাওয়া বয়।
স্বপ্নভরা রাত, তারারা তন্ময় ;
তোমার কালো চোখে প্রেমের শিখা জলে।

দুটি কবিতা

পাখি জানে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

পলক পড়ে না, পাতা ঝরে না কোথাও। শুধু পাখি
এগাছে-ওগাছে খেলা করে, স্তব্ধ ছায়ার ভিতর
দুপুরের দুঃখ দেখে ব'সে। আর, এদিকে এ-ঘর
জরের উত্তাপে কাঁপে : এখনি বিকেল হবে নাকি ?

শিয়রে তো কেউ নেই। একমাত্র রোদ্দুরের স্মৃতি
ছায়া হয়ে প'ড়ে আছে। টেবিলে ওষুধ, গ্লাশে জল,
এবং শস্তায় কেনা শুকনো ফুল, কিছু ঠাণ্ডা ফল।
আর এই চারদেয়ালে দুপুরের আশ্চর্য নিভৃতি।

বিকেলে কে এসে বলবে, বেলা গেলো, শোনাবে সন্ধ্যার
স্বরলিপি। কে দেখাবে আকাশে নক্ষত্র, ঘরে আলো ;
ভালোবেসে কে বোঝাবে শুধু— এটা মন্দ, ওটা ভালো।
কার স্পর্শে মনে হবে, এ-রাত্রিও রজনীগন্ধার।

দুপুরের খোলা ঘরে একটি পাখির যাওয়া-আসা ;
যে-অদৃশ্য হাত, বুঝি পাখি জানে, সে-ই ভালোবাসা।

নদীর নায়ক, সূর্যের নায়িকা

দর্পণে কে কাকে দেখে ; এই আলো, এই অন্ধকার।
মেঘলা ভোরের সঙ্গে যেতে-যেতে সূর্যের নায়িকা
দৃশ্যের সবুজে শরীরিণী, যেন লজ্জার লিপিকা
তার সারা অঙ্গে, শ্লথ চরণে ছন্দের উপহার।

যা আছে আমার, এই নাও— ব'লে নদীর নায়ক
ব'সে থাকে অন্ধকারে। আকাশ আলো-কে ডেকে বলে,
এসো, এসো। আলো হেসে যৌবনের গর্বের গরলে
হয় সমুদ্রের নীল।— দৃশ্যান্তরে বিরত নাটক।

দর্পণে যে আছে থাক; যে নেই সে যাক দূরাকাশে,
মেঘে-মেঘে এই ক্ষীণ দিনের শিয়রে স্বপ্নময়
নদী, তার স্নিগ্ধ দেহ; ঐশ্বর্যে সম্পূর্ণ সে তো নয়।
বৃথাই হেনেছো বাণ! কে কাকে ভোলায়, ভালোবাসে?

কেউ না। দর্পণে তাই সকালের শৌখিন ভ্রূকুটি;
যে-হাত হাতের বাইরে, বেলা থাকতে তাকে দাও ছুটি।

দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ

ফ্রীডরিখ হেল্ডারলিন

১

প্রত্যহ যাত্রায় বাধ্য, অবিরাম অন্য কিছু খুঁজে-খুঁজে আমি
ঘুরেছি, করেছি প্রশ্ন, বহু পূর্বে, সব পথ, প্রান্তর, কান্তারে;
ঐ দূরে হিমস্রব শৃঙ্গদল, উৎসমুখ, পুঞ্জিত ছায়ার প্রান্ত,
সর্বত্র গিয়েছি অবিরল; উচলে নিতলে ঘুরে-ঘুরে, আত্মা চায়
ক্ষণিক বিশ্রাম; যেমন ভয়ার্ত মৃগ অরণ্যগহ্বরে
পলায়, যেখানে ছিলো অন্ধকার তন্দ্রা-ভরা দ্বিপ্রহর তার;
কিন্তু সে-শ্যামল নীড়ে আর তার শান্তি নেই, অথবা সান্ত্বনা,
উন্নিদ্র, বিলপমান, কণ্টকে তাড়িত হ'য়ে হারায় সে দিশা,
দেয় না আশ্রয় তারে উষ্ণ আলো, বন্ধু নয় শীতল নিশীথ,
অযথা ডোবায় ক্ষত নির্বিকার নদীর ধারায়।
যেইমতো, অভিশপ্ত হরিণীরে, ধরণী বৃথাই দেয় তৃণদল,
অনর্থক মলয় ব্যজন করে তাপময় ফেনিল শোণিতে,
তেমনি আমারও ভাগ্য, বন্ধুগণ! দুঃখে নত আমার ললাট থেকে
কেউ কি নামাতে পারে এ-স্বপ্নের অতিগুরু ভার?

২

জানি, জানি, মৃত্যুর দেবতা, তুমি একবার অবল মানবে
যদি করো কবলিত, বাঁধো তারে কঠিন শৃঙ্খলে,
নাও তারে, দুর্দম অশিবদল, তমস্বিনী নিশার কন্দরে টেনে,
তাহ'লে আক্ষেপ বৃথা, মিনতির মূল্য নেই, আক্রোশের বর্ষণ অক্ষম,
আর যদি নির্বাসন মেনে নেয়, দুঃস্বপ্নে পরম ধৈর্যে সহ্য করে,
শোনে তব বিষাদকীর্তন হাসিমুখে, তাও ব্যর্থ, তেমনি নিষ্ফল।
যদি তা-ই হয়, তবে কল্যাণেরে নিঃশব্দ নিদ্রায় ভুলে যাও!

কিন্তু শুনি এখনই তোমার রন্ধ্রে উৎসারিত কোন স্বর, আশার নিস্বন,
আত্মা মোর, এখনো পারোনি তুমি মেনে নিতে ; ভবিতব্যে অভ্যস্ত, অথচ
আজও তুমি স্বপ্ন ছাখো অয়স্কান্ত নিদ্রার আধারে।
উৎসবের দিন আজ নেই আর, তবু আমি পুলকিত মাল্য চাই ;
নই কি সম্পূর্ণ একা, সঙ্গহীন ?   কিন্তু কোনো করুণা আসন্ন, জানি,
দূর থেকে আমার অন্তরতম, তাই মোর বিস্ময়ের সীমা নেই,
যেহেতু জেনেছি এই শোকপাশ কী আনন্দময়।

৩

হে প্রেম, সোনার আলো, তবে কি মৃতের তরে উদ্ভাস তোমার ?
দিনের উজ্জ্বলতর ছবি, সে কি দীপাবলী আমার রাত্রির ?
সুন্দর কাননশ্রেণী, শৈলমালা সন্ধ্যার সিন্দূরে লাল,
স্বাগত জানাই সকলেরে !   আর তুমি, মৃদুভাষী বনপথ,
তোমরা, নক্ষত্রদল, চক্ষুষ্মান, পুলকিত স্বর্গের প্রমাণ—
একদা আমাকে যারা প্রীতিময় আশিসে করেছো ধন্য—
তোমরাও, হে প্রেমিক, হে প্রেমিকা, ফাল্গুনের অমল সন্তান,
অবিকল গোলাপ, কহ্লারদাম, আজও আমি তোমাদের স্মরি।
সত্য, জানি, বসন্ত বিলীয়মান, বৎসরের অগ্রজবিনাশে
বিক্ষুব্ধ অনন্তকাল যুযুধান, পরিবর্তমান ;
মরলোকে আমরা অধীন তার, কিন্তু যারা অভিষিক্ত, আর যারা একান্ত প্রেমিক,
অন্য এক জীবনে আদিষ্ট তারা, এ-দারুণ সংগ্রাম ছাখে না।
কেননা যা-কিছু বৃত, নক্ষত্রের সব দিন, সকল বৎসর,
ঘিরেছিলো সেদিন মোদের সত্তা, দিওতিমা, অন্তহীন অন্তরঙ্গতায়।

৪

কিন্তু মোরা, তৃপ্তির আবেশে যুক্ত হ'য়ে, বিচরণ করেছি ধরায়
মরালমিথুন-সম, যবে তারা সাগরে বিশ্রাম করে, অথবা, তরঙ্গে আন্দোলিত,

চেয়ে থাকে জলের গভীরে, যেথা রজতসন্নিভ মেঘদল
ছায়া ফেলে চ'লে যায়, ভেসে যায় নাবিক-যাত্রীর পথে
নীলিমার প্লুত স্রোতে।   আর হিম উত্তর যদিও
লোল ক'রে দিলো ঝঞ্ঝা, প্রেমিকের প্রতন শত্রু সে,
ছড়ালো ক্রন্দন, ত্রাস, শাখা হ'তে পত্রদল, দিগ্বিদিকে উড্ডীন বর্ষণ,
তবু মোরা হেসেছি, শুনেছি স্বর, মিলিত আত্মার ঐকতান,
অন্তরঙ্গ আলাপনে পরিপূর্ণ, নন্দিত শিশুর মতো, প্রশান্ত, একেলা,
পেয়েছি অন্তর-তলে আপনার দেবতার গভীর পরশ।
কিন্তু আজ উচ্ছিন্ন আমার বাস্তু, এমনকি দৃষ্টি অপহৃত,
মনে হয় প্রেয়সীরে হারিয়ে আমার আপনার সত্তা আর নেই।
তাই আমি ভ্রাম্যমাণ, তাই মোর নিয়তি এখন
নিতান্ত ছায়ার মতো বেঁচে থাকা, অন্য সব বহুদিন অর্থহীন হ'য়ে ঝ'রে গেছে।

৫

উৎসবে আকাঙ্ক্ষা মোর, কিন্তু কেন, কিসের উৎসব ?   চাই, আমি গান গাই
অন্যদের সহযোগে, কিন্তু আমি একা আর দেবতুল্য কিছুই আমার নেই।
এ-ই তো আমার ত্রুটি, জানি আমি, এ-ই সে পাতক যার অভিশাপে
বিকল আমার পেশী, ব্যর্থ শ্রম, আরম্ভেই পতন নিশ্চিত,
তাই আমি নিঃসাড় কাটাই ব'সে সারা বেলা, শিশুদের মতো শব্দহীন,
শুধু মাঝে-মাঝে নামে নয়নের প্রান্ত বেয়ে হিম অশ্রু, আর
হানে গাঢ় বিষাদকালিমা প্রাণে বিহঙ্গকূজন আর বনের কুসুম,
কেননা তারাও দূতী আনন্দের, অমর্ত্যবাসীর বার্তাবহ।
কিন্তু সূর্য, যে দেয় জীয়ন-মন্ত্র, আমার বেপথুমান বুকে
সেও আনে, রাত্রির রশ্মির মতো, তুহিন বন্ধ্যতা,
ব্যর্থ, হায়, ব্যর্থ আর শূন্যময় ঝুলে আছে, নিষ্ঠুর, নিশ্বাসরোধী,
আমার মাথার 'পরে কারার প্রাচীর-সম আকাশের পুঞ্জীভূত ভার।

৬

একদা, যৌবন, তুমি কত ছিলে অনুরূপ! পারে না কি তোমাকে ফেরাতে আর
কিছুতেই আমার প্রার্থনা ?   নেই কি একটি পথ প্রত্যাবর্তনের ?
আমিও কি তাহ'লে তাদেরই অন্যতম, দেবতায় বঞ্চিত দুর্ভাগা যারা,
দীপ্ত চোখে অমর্ত্যের পংক্তিভোজে একদা অতীতে বসেছিলো,
তারপর, ভোগক্লান্ত অসংখ্য ইতর জন, অচিরে হারিয়ে কণ্ঠ,
প'ড়ে আছে নিদ্রার গহ্বরে, যেথা অতল পাতালে
শীতল পবন নেই, নেই ফুল্ল, মুঞ্জরিত বসুন্ধরা—
অবরুদ্ধ, আশাহীন, যতদিন অলৌকিক দিব্য ক্ষমতায়
আবার না জেগে ওঠে, নূতন উৎসাহে ভ্রমে তৃণময় শ্যামল প্রান্তরে ।—
পূত বায়ু, ঐশ্বরিক রূপান্তরে, প্রতিমারে করে নিশ্বসিত
যবে প্রেম, উৎসবের পুরোহিত, উদ্বেল বন্যায়
গর্জমান, সপ্রাণ নদীর মতো ধায় বেগে সাক্ষাৎ স্বর্গের
ধারাপুষ্ট, নিম্নলোকে জাগে তার প্রতিধ্বনি, রাত্রি দেয় রত্নের সম্ভারে
পূজা, নদীগর্ভে মাটির গুণ্ঠন ছেঁড়ে জলন্ত কনক ।

৭

কিন্তু তুমি, প্রিয়তমা, যে-তুমি, পথের মোড়ে আমি পড়েছিলাম যখন
তোমার চরণপ্রান্তে, তখনই সান্ত্বনা দিয়ে, শুনিয়ে দীপক-মন্ত্র, হাতে ধ'রে
দেখিয়েছো আমাকে নিগূঢ়তর সুন্দরের পথ, শিখিয়েছো নয়নে, কণ্ঠেরে
মহান দৃষ্টির জ্যোতি, দেবতার হৃষ্টতর গান—
সেই তুমি, অমরসন্তান, সেই মতো শান্ত, মৌন, আবার কি দেখা দেবে মোরে
প্রতন কালের মতো, হ্লাদিনী, শক্তির উৎস, উদ্ধার আমার ?
ত্যাখো, আমি ক্রন্দনে আবদ্ধ আজ ; তুমি আছো, তথাপি বিলাপ
স্মৃতির গৌরবে হানে, লজ্জা দেয় আমার আত্মারে ।
কেননা এ-দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল, পৃথিবীর শ্রান্ত পথে ঘুরে-ঘুরে,
তোমাতে অভ্যস্ত ব'লে, তোমাকেই অরণ্যে খুঁজেছি শুধু,
খুঁজেছি, রক্ষিকা মোর, অনর্থক !   যেহেতু বৎসর, মাস, শূন্যতায়
গ'লে গেছে, যবে থেকে অশুভ সন্ধ্যার আভা গাঢ় হ'তে দেখেছি আমরা ।

৮

কিন্তু তুমি, হে নায়িকা, আছো তব সবিতার দীপ্তির আশ্রয়ে,
তোমার তিতিক্ষা, ক্ষমা, হে কল্যাণী, তোমাকেই প্রেমে করে সঞ্জীবিত ;
এমনকি তুমিও নিঃসঙ্গ নও, কেননা যেখানে তুমি বৎসরের গোলাপের দলভুক্ত
    হ'য়ে
বিশ্রামে বিকাশো, আছে সেখানেও তোমার খেলার সঙ্গী, আর পিতা স্বয়ং
    তোমারে
আর্দ্রমন সরস্বতীর দৌত্যে করেন প্রেরণ
সপ্রেম কোমল গানে নিদ্রার মধুর অভিসার ।
আজও তুমি অবিকল !   আশিরচরণতল আথেনীয়,
শান্ত পায়ে ভ্রাম্যমাণ, চিরন্তনী, আছো তুমি আমার দৃষ্টিতে ।
এবং, পরম বন্ধু, যবে তব ললাটের প্রশান্ত ভাবনা থেকে
ঝ'রে পড়ে মানবের মরতায় প্রমিত, মঙ্গলময় আলো,
তখন আমাকে বলো, দাও তার অমোঘ প্রমাণ,
যে-কথা আমিও পুন ব'লে যাবো অবিশ্বাসী হতভাগ্যদের—
তীব্র হোক রোষানল, দুঃখতাপ, তবু ধ্রুব আনন্দ অন্তিম,
তবু সেই সোনালি প্রত্যুষ জ্বলে পরিশেষে এখনো প্রত্যহ ।

৯

অতএব, দেবগণ, তোমাদেরও দেবো আমি ধন্যবাদ, আর অবশেষে,
কবির অন্তর থেকে মুক্ত হবে প্রার্থনার নির্ঝর আবার ।
একদা, প্রিয়ার পাশে, সূর্যকান্ত চূড়ায় যেমন
দাঁড়িয়েছিলাম আমি, সেইমতো, প্রাণের সঞ্চারে পূর্ণ, দেবতা সরব আজ গভীর
    মন্দিরে ।
আবার আরম্ভ তবে জীবনের !   ঐ জলে এখনই নূতন কুঞ্জ !   ঐ তো সমুখে
হানে যেন স্বর্গীয় বীণার ধ্বনি আপোলোর রুপোলি শিখর ।
ত্যাখো !   সব মিলায় স্বপ্নের মতো !   স্বাস্থ্য, বল পূর্ণ হ'য়ে ফিরে আসে
বিক্ষত পাখায় তব ; তরুণ, নতুন হ'য়ে বাঁচে পুন সব আশা, বাসনা তোমার ।

মহত্ত্বে জেনেছি, তা-ই বহু মানি, তবু আরো বহু থাকে বাকি,
এইমতো যে ভালোবেসেছে তার অনিবার যাত্রা তাই দেবতার পথে।
তবে হও আমাদের সহযাত্রী, হে পবিত্র ঋতুদল, গম্ভীর, তারুণ্যময়,
থাকো সঙ্গে চিরকাল! আর অনুকম্পায় কোমল যারা প্রেমিকের সঙ্গ নিতে
ভালোবাসো, হে পূত স্বজ্জার দল, ঐশ্বরিক অনুনয়, হে অনুপ্রেরণা,
থাকো সবে আমাদের দু-জনের সহচর, থাকো, যতক্ষণ
মানবের সামান্য ভূমিতে, যেথা অভিষিক্ত আত্মা পুন নেমে আসে,
আছে গ্রহ, নক্ষত্র, ঈগল, যারা সাক্ষাৎ প্রিয়ার দূত, এবং যেথায়
বীর আর প্রেমিকেরা জন্ম নেয়, সরস্বতী এখনো আছেন—'
যতক্ষণ সেইখানে, অথবা হয়তো এই গলমান বরফের দ্বীপে,
সমবেত কাননসমূহ যেথা অবশেষে যুগপৎ মুঞ্জরিত হ'লো,
না হয় সার্থক সত্য আমাদের সব কাব্য, ফাল্গুন মধুর থাকে দীর্ঘকাল,
অলক্ষ্যে আরম্ভ হয় আমাদের হৃদয়ের অন্য এক নূতন বৎসর।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

বিকল্পে উটের সার

নরেশ গুহ

বিকল্পে উটের সার, জীবনের গতায়ু বছর।
বালির দুর্গম তাপ, অস্থিসার উপত্যকা, কঙ্কাল করোটি খসা ঝাড়
পায়ে পায়ে সঙ্গ নেয়; জলের উতল গন্ধে
          খেজুরের কৃশ ছায়া খুঁজে
ক্রমশ শুকিয়ে আসে সঞ্চয় যা ছিলো মেদ কুঁজে।
ধ্বসে পড়ে দিনরাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয়;
শান-দেওয়া অন্ধকারে ক্ষ'য়ে যায় নক্ষত্রবলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ;
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয় মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।
অঙ্গার পথের ধুলো, আকাশ মূর্ছায়
ঢ'লে পড়ে ডাইনির গুহায়।
এবং হাওয়ার আগে দিক দেখায় কপট প্রেতেরা।
                    বিকল্পে—উটের সার
                    কখনো ফিরবে না আর,
                              যেহেতু সম্ভব নয় ফেরা,
যদিও অকল্পনীয় রাত্রিশেষে নগরের দ্বার,
বাগানে পাখির গান, ঈশ্বরের ঘুমন্ত সংসার॥

তিনটি কবিতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

পাথর-দিন
(রঁদো)

একলা দিন মৌন বয়
প্রবহমান নিঃসময়
শটিত এক ক্লান্তিবোধ
ইচ্ছা সব করলো রোধ
মনের সাধ হ'লো বিলয়।

কোথা জীবন বর্ণময়!
শিথিল ক্ষণ কুসুম নয়;
পাষাণ-ভার এ-ন্যগ্রোধ
একলা দিন।

এ-দিন হোক ত্বরিতে ক্ষয়
প্রাণে এ-ভার কতো বা সয়?
অধীরতায় ওতপ্রোত
আসুক ঝড়, আসুক স্রোত;
করুক জয় ভার-নিলয়
একলা দিন॥

হৃত-রোমাঞ্চ দিন
(ভিলানেল)

হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে
ওড়ালে কোথায় কী মন্ত্রে ছলোছলো
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

কাশের গুচ্ছে শরতের মেঘ ফিকে
রং নেই তাতে, স্বাদ নেই—কী-যে জোলো;—
হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে

ভরা দিনগুলি সুদূরে না অন্তিকে
খালি ক'রে বুক কোথায় পাঠালে, বলো?
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

কোথা পাই কেলি-চঞ্চল উর্মিকে
মরা-নদী-বুকে জল নয় উচ্ছলও
হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে

নিয়ে গেলে ডেকে কোন আড়ালের চিকে?
কৃকলাস-কাল বর্ণও বদলালো!
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

উধাও হবার কৌশলটুকু শিখে
যতো জালা দাও নিজে আরো বেশি জলো;
হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

মাঝরাতের ডাকবাংলোয়

রাত্রির কিনার ঘেঁষে ট্রেন গেলো দূরে ব্রিজ দিয়ে,
নিঝুম অচেনা রাত উচ্চকিত হ'লো একবার।
মুহূর্তের আলোড়ন তারপর গিয়েছে থিতিয়ে;
গুড্‌স্ ট্রেন নয় তো এ, হবে কোনো আপ্‌ প্যাসেঞ্জার।

ডাকবাংলোর শয্যা চটচটে কালো অন্ধকার
মাখে ; তাতে ধরা পড়ে উড়ো কতো স্মৃতি-স্বর্ণ-মাছি।
খানসামা হেঁপো রুগী কাশে, শুনি ; ঘর রুদ্ধদ্বার।
ফের কাল যাত্রা শুরু, আজকের রাতটুকু আছি।

বাড়ি ছেড়ে এসেছি কোথায় ; যারা ছিলো কাছাকাছি—
প্রত্যহের ব্যবহারে দরকারি যতো চেনা মুখ
ঘিরে ধরে ; 'বাড়ি ফেরা অবধি না, ধরো, যদি বাঁচি
তবে যে হবে না দেখা।—এ-মিনতি জানাতে উৎসুক।
এ-বিচ্ছেদ ভ'রে নিতে ফেলে রেখে আসিনি কি পুঁজি
কোনো কিছু ? ধোঁকা লাগে, অতীতকে পাতি-পাতি খুঁজি।

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

ভাঙা ঘণ্টা

শীতের প্রখর রাত্রি, অগ্নিকুণ্ড ধূমল, চঞ্চল ;
কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া পুরাতন ঘণ্টার নিস্বনে
ভেসে আসে, দূর থেকে, ত্বরাহীন স্মৃতির দঙ্গল ;
মধুর তিক্ততাময় অনুভব ব্যাপ্ত করে মনে।

ধন্য সেই ঘণ্টা, যার কণ্ঠনালী সতেজ, সক্ষম
বার্ধক্যের প্রতিরোধে পুণ্য তানে ভ'রে দেয় দিক,
আশ্বাসের অনুবন্ধে অবিরল করে পরিশ্রম,
যেন এক শিবিরে চকিতচক্ষু প্রাচীন সৈনিক !

বিদীর্ণ আমার আত্মা ; নির্বেদের বাঁধন ছাড়াতে
গানের জনতা দিয়ে হিম হাওয়া চায় সে ভরাতে ;
অথচ, অনেক বার, মনে হয় তার ক্ষীণ স্বর

যেন এক মুমূর্ষুর নাভিশ্বাসে নিঃসৃত ঘর্ঘর,
যে মরে, মৃতের স্তূপে, বিস্মরণে, নিশ্চল নিষ্ঠায়,
রক্তের হ্রদের তীরে, অবিরাম বিরাট চেষ্টায়।

লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা

খিন্ন প্রাণ, একদা ছিলো সংগ্রামে আনন্দ তোর,
দীপ্ত আশা, রেকাব যার আগুন হানে রাত্রিদিন,
সে আর নয় সওয়ার তোর ! ঘুমো রে তবে লজ্জাহীন,
হুঁচট-খাওয়া জীর্ণ ঘোড়া, খন্দ-খানায় ভাঙলো জোর।

হৃদয়, তবে নে মেনে তুই পশুর মতো ঘুমের ঘোর।

বুড়ো ডাকাত! জড়ায় তোরে পরাজয়ের অন্ধকার,
দেয় না দোলা যুদ্ধ, প্রেম; সম্ভোগের সর্বনাশ!
বিদায়, তবে কাংস্য গান, বাঁশির প্রিয় দীর্ঘশ্বাস!
বিষাদময় হৃদয়ে নেই প্রলোভনের অঙ্গীকার।

বিশ্বজয়ী বসন্ত যায়, ফুরালো তার গন্ধভার!

প্রতিক্ষণে আমায় টানে অতল খাদে অসীম কাল,
যেন বিশাল তুষার-পাতে লুপ্ত এক কঠিন শব,
সুগোল এই ভূগোল জুড়ে যা-কিছু আছে দেখেছি সব,
খুঁজি না আর কোথাও বাসা, ক্ষুদ্র কোনো অন্তরাল।

নে, তবে নে আমায় টেনে, আভালাঁশের ধ্বংস-তাল।

ইকারুস-বিলাপ

হৃষ্ট, পুষ্ট, নিটোল তাদের স্বাস্থ্য,
যারা দেয় প্রেম চটুল গণিকাগণে।
—আমার লভ্য, মেঘের আলিঙ্গনে,
ভাঙা ছুটো ডানা, নিষ্ফল উদয়াস্ত।

অতল আকাশে জলে অনুপম সিঁথি,
সেই তারাদল আমার উত্তমর্ণ;
আমার দগ্ধ নয়নে, তাদেরই জন্য,
দৃশ্য কেবল চিত্রভানুর স্মৃতি।

বিরাট শূন্যে বৃথাই দিয়েছি হানা
প্রান্তে, কেন্দ্রে, সবল কৌতূহলে;
জানি না সে কোন আগুন-চোখের তলে
বিচূর্ণ হ'লো আমার মত্ত ডানা।

সুন্দরে ভালোবেসে আমি আজ ভস্ম;
সমাধিফলকে উজ্জ্বল সম্মানে
থাকবে না লিপিচিহ্ন আমার নামে,
আমার কেবল গহ্বর সর্বস্ব।

কোনো ক্রেয়ল মহিলাকে

সৌর সোহাগে মন্থর দেশ, গন্ধে ভরা,
সেখানে দেখেছি, বেগনি গাছের কুঞ্জতলে
ঘন তালবনে আলস্য ঝরে কলস্বরা—
অজ্ঞাত এক ক্রেয়ল রূপসী একলা জলে।

শ্যামল মোহিনী, উষ্ণ, মলিন বর্ণ ধরে;
গৌরবে গড়া গ্রীবার মোহন কান্তি;
প্রচুর তনুতে হেঁটে যায়, যেন মৃগয়া করে;
হাস্যে, নয়নে ঝলকে প্রমার শান্তি।

মাদাম, যদি এ-গরিমার দেশে কখনো আসেন,
যেখানে সবুজ লোয়ার, অথবা ব'য়ে যায় সেন্,
যোগ্য রূপসী, প্রাচীন পুরীর অনুপ্রাস,

ছায়ার বিতানে ঐ কালো চোখ জাগাবে তখন,
মুগ্ধ কবির হৃদয়ে হাজার গানের চরণ,
হবে সে কাফ্রি দাসের চেয়েও দাসানুদাস।

হেমন্তের গান

(১)
বেশি আর দেরি নেই, মগ্ন হবো হিম কালিমায়;
বিদায়, ক্ষণিক গ্রীষ্ম! নামে দিন দ্রুত অধঃপাতে!

কবিতা

পৌষ ১৩৬৩

এই তো এখনই শুনি— শান-বাঁধা চত্বরে নামায়
জ্বালানি কাঠের বোঝা, আর্তিময় ধ্বনির সংঘাতে।

আক্রোশ, আতঙ্ক, ঘৃণা, কয়েদির কঠিন খাটুনি—
সমস্ত প্রকাণ্ড শীত বাসা বাঁধে আমার সত্তায়,
হৃদয়েরে বেঁধে এক ঠাণ্ডা, লাল, দুর্ভর আঁটুনি,
যেমন মরন্ত সূর্য মেরুতটে নরকশয্যায়।

আবার কাঠের শব্দ! নিরন্তর আমি কম্পমান!
ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, তা কি আরো ধ্বংসময়?
হৃদয় আমার দুর্গ, অবিরাম গুরুগর্জমান
কামানের আক্রমণে অবশেষে মানে পরাজয়।

ব'সে-ব'সে মনে হয়— একতাল আঘাতে প্রহত—
কফিনে পেরেক ঠোকে ব্যস্ত এক দ্রুত অভিযান।
কার মৃত্যু?— এই ছিলো গ্রীষ্ম, আজ হেমন্ত আগত!
এ-শব্দ, রহস্যময়, যেন কার অলক্ষ্য প্রস্থান।

(২)

তোমার দীঘল চোখে ভালোবাসি সবুজ উদ্ভাস,
অথচ, লাবণ্যময়ী, আজ তিক্ত সব অভিজ্ঞান,
না তোমার প্রেম, গৃহ, না তোমার আলস্যবিলাস
মনে হয় সিন্ধুনীরে আন্দোলিত রৌদ্রের সমান।

তবু, হে মঞ্জুল প্রাণ, ভালোবেসো আমাকে এখনো,
দয়িতা, ভগিনী, এই কৃতঘ্নের হও তুমি মাতা;
হও সেই ক্ষণিক মাধুরী, যার আবাস কখনো
সূর্যাস্ত, অথবা এক হেমন্তের দীপ্ত ঝরা পাতা।

কবিতা

বর্ষ ২১, সংখ্যা ২

বেলা যায়! কবর অপেক্ষমান; ক্ষুধিত মরণ!
তোমার জানুতে মাথা, অপহৃত ললাটের বলি,
মনে আনি তপ্ত, শাদা নিদাঘের বিষণ্ণ স্মরণ,
এবং হলুদ, নম্র হেমন্তের আলোর অঞ্জলি।

বৃষ্টি ও কুয়াশা

হেমন্তের অবসান, শীত, আর পঙ্কময় বসন্তের দিন,
তোমরা, নিদ্রালু ঋতু, যারা ম্লান কুয়াশার আচ্ছাদনে লীন
ক'রে দাও আমার হৃদয় মন, যেন এক অস্পষ্ট কাফনে
লুপ্ত ক'রে কবরে নামিয়ে দাও—মুগ্ধ আমি তোমাদের গুণে!

এই ব্যাপ্ত প্রান্তর, যেখানে ছোটে রাত্রি ভ'রে তুহিন তুফান
আর দীর্ঘ রাত্রি ভ'রে আবহকুক্কুট তোলে মর্চে-পড়া তান,
ঈষদুষ্ণ বসন্তের চেয়ে বেশি—আরো বেশি গূঢ় আকাঙ্ক্ষায়
উড়ে চলে আকাশে আমার আত্মা, অবারিত কাকের পাখায়।

যে-হৃদয় শবের সম্ভারে পূর্ণ, আর যার অন্ধকার ছেয়ে
বহুকাল ঝরেছে তুষারবৃষ্টি, তার কাছে কিছু নেই প্রিয়,
হে পাংশু ঋতুর দল, আবহের রাজ্ঞীরূপে যারা বরণীয়,

নিরন্তর ধূসর ছায়ায় ম্লান তোমাদের মুখশ্রীর চেয়ে,
—যদি না, যখন চাঁদ অবলুপ্ত, পাশাপাশি, অন্তরঙ্গ রাতে
পারে সে পাড়াতে ঘুম বেদনারে, কোনো-এক দৈবাৎ-শয্যাতে।

De Profundis Clamavi

(পাতাল থেকে আমি ডেকেছি)

দয়া করো, আমার একান্ত কান্তা! পাতালের অন্ধকার থেকে—
যেখানে আমার চিত্ত ডুবে আছে—ভিক্ষা চাই করুণা তোমার।

—কাতর জগৎ, যাকে ঘিরে আছে সীসময় দিগন্তের দ্বার,
আর যেথা আতঙ্ক, পাপিষ্ঠ ভাষা রাত্রি ভ'রে ছোটে এঁকে-বেঁকে।

সূর্য এক উঠে আসে—তাপ নেই; দেখা যায় বৎসরে ছ-মাস;
এবং ছ-মাস ভ'রে ভূমণ্ডলে অবিরল রাত্রি রয় ছেয়ে;
এই এক নগ্ন দেশ, বরফের মেরু নয় শূন্য এর চেয়ে;
—নেই কোনো বনভূমি, নির্ঝরিণী, নেই পশু, এক ফালি ঘাস।

কী আছে কঠিনতর পৃথিবীতে, এর চেয়ে আতঙ্কে অধিক—
এই যে তুহিন সূর্য হিমস্রব হিংস্রতায় ভ'রে দেয় দিক্‌,
আর এক আদিম প্রলয় যেন, এই গাঢ়, ব্যাপ্ত নিশীথিনী;

আমি তাই জন্তুদের ঈর্ষা করি, অন্ধকারে তুচ্ছ যত প্রাণী
মূঢ় এক নিদ্রার বিবরে ডুবে কিছু কাল অনায়াসে ভোলে,
এমন মন্থর লয়ে সময়ের ক্ষমাহীন তন্তুজাল খোলে!

প্রোজ্জ্বল ক্লেদ

নির্বেদে নিষ্ঠুর তুই, পাতকিনী! বিশ্বচরাচরে
বিঁধে নিতে চাস তোর অপ্রসর শয্যার শিয়রে।
দন্তের ব্যায়াম হবে, তাই—তোর কৌতুক দুঃসহ—
চাস তুই একটি শলাকাবিদ্ধ হৃদয় প্রত্যহ।
দীপ্ত দুই চোখ তোর, বিপণীর মতো উচাটন—
অথবা উৎসব যেন, গাছে-গাছে ঝোলানো লণ্ঠন—
স্পর্ধায় নিঃশেষ করে ক্ষমতার যত পায় ঋণ,
কেননা জানে না তারা সুন্দরের তারাও অধীন।

রে অন্ধ, বধির যন্ত্র, যন্ত্রণার প্রসবে প্রচুর!
উপকারী উপলক্ষ্য, জগতের রক্তলোভাতুর,
লজ্জা কি পাস না তুই—বল, কোনো লজ্জার প্লাবনে
পাংশু হ'য়ে ঝরে না কি রূপ তোর কখনো দর্পণে?

তুঙ্গ এই কদাচার, বিদ্যা তোর বেড়ে চলে যাতে,
তা থেকে, আতঙ্কে কেঁপে, চাস না কি কখনো পলাতে,
যেহেতু প্রকৃতি, রয় অন্তরালে অভিসন্ধি যার,
রে নারী, পাপের রানী, তোকেই করে যে ব্যবহার,
তোকেই, জঘন্য জন্তু, ছেনে নিতে ক্বচিৎ প্রতিভা?

হায় রে প্রোজ্জ্বল ক্লেদ, মারাত্মক, হায়, দিব্য বিভা!

পিশাচী

এসেছিলি, আমার বুকের দুঃখ ছিঁড়ে
যে-তুই, এক তীক্ষ্ণ ফলার মতো,
লেলিয়ে দিয়ে দৈত্য-দানোর দামাল ভিড়ে
নেচে, কুঁদে, গ'র্জে অবিরত

পেতেছিলি রাজত্ব আর শয্যা, ওরে
যে-তুই, আমার ক্লান্তিমাখা মনে,
—পাতকিনী, আঁকড়ে আছি আমি তোরে
খুনে যেমন দড়ির আলিঙ্গনে।

—বাঁধা আছি, বোতলটাতে পাঁড় মাতাল
পাশায় যেমন জুয়াড়ি দেয় মতি,
কিংবা যেন পশুর শবে পোকার পাল,
—নরকে, হোক নরকে তোর গতি!

ভাবিনি কি, মুক্তি আমার মিলবে কিসে,
সাধিনি কি তীব্র তলোয়ারে?
জপিয়েছি তো—ভীরু আমি—কপট বিষে,
"রক্ষা করো আমার আপনারে!"

কিন্তু, হায়, আমার 'পরে কী আক্রোশ—
গরল, ছোরা, তারাও বলে হেঁকে :
"মূর্খ! তুই মুক্তি পাবার যোগ্য নোস্
জাহান্নমের এই নাগপাশ থেকে।

পারিস তার রাজ্য থেকে পলাতে
আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
বাঁচবে পুন তোর পিশাচীর মড়া!"

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(জন্ম : জুন ১৯১০। মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬।)

কবিতার দ্বারা উপন্যাসের আক্রমণ আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ;—শুধু আক্রমণ নয়, রীতিমতো জয়, রাজত্ববিস্তার; গত একশো বছরের কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে তার মধ্যে স্পষ্ট দুটো বিভাগ চোখে পড়বে : একদিকে সরল বাস্তবপন্থা, লোকে যাকে জীবন বলে তার নিষ্ঠাবান আলেখ্য, অন্যদিকে নির্বাচন, অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যময় বিকৃতি—এক কথায়, কাব্যধর্ম। কবিতা, ছন্দ-মিলের শুদ্ধ রূপায়ণে বিপন্ন বোধ ক'রে, কেমন ক'রে বহুব্যাপ্ত গদ্যসাহিত্যের বড়ো একটা অংশকে অধিকার ক'রে নিলে, তার ইতিহাস রোমান্টিসিজম-এর পরিণতির সঙ্গে সমান্তর। বলতে লোভ হয়, ফরাশি প্রতীকীবাদের প্রভাব পরবর্তী কথাসাহিত্যেও সংক্রমিত হয়েছে—নয়তো মান্ কেমন ক'রে 'ভেনিসে মৃত্যু' লিখতে পেরেছিলেন বা জয়স তাঁর শিল্পী-যুবকের প্রতিকৃতি?—কিন্তু এও স্মর্তব্য যে ডস্টয়েভস্কি, যিনি কবি-ঔপন্যাসিকের গুরুস্থানীয়, তিনি শার্ল বোদলেয়ার-এর সমকালীন হ'য়েও কখনো 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' পড়েছিলেন ব'লে জানা যায় না। অবশ্য এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তদন্ত নয়, তবে অনায়াস দৃষ্টিতেই এটুকু ধরা পড়ে যে সাহিত্যের চিরকালীন বাস্তববাদ যে-সময়ে জোলার হাতে উগ্র প্রকৃতিবাদে পরিণত হ'লো, সেই একই সময়ে য়োরোপীয় উপন্যাসে একটি বিপরীত ধারা বলীয়ান হ'য়ে উঠছে, যে-ধারা, তথাকথিত বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে, বাস্তবের অন্তরালবর্তী স্বপ্ন বা সত্যের সন্ধানী।

কিন্তু এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিণতির ধারা মেলে না। য়োরোপীয় কবিতায় ও উপন্যাসে যে-বিনিময়জনিত ভ্রাতৃত্ববন্ধন গ'ড়ে উঠেছে, বাংলায় তার লক্ষণ এখনো ক্ষীণ। বাংলা কবিতার কোনো-একটি অংশকে ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বলা যায়, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম অংশ আজ পর্যন্ত উনিশ-শতকী বাস্তববাদে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ, অদম্য কবি হ'য়েও, তাঁর কথাসাহিত্যে বঙ্কিমের অনুগামী হয়েছেন, এবং যেখানে তা হননি, অর্থাৎ যেখানে তাঁর মৌলিক কবিতাকে উপন্যাসের মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়েছেন,

সেখানে তাঁর উপন্যাসের (হয়তো কবিতারও) ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র চাঁদের দিকে তাকিয়ে কখনো কোনো 'মুখ-টুখ' দেখতে পাননি ব'লে গর্ব করেছেন; কবিদের উদ্দেশে তাঁর এই উপহাস নিজের মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে হয়নি তাঁর, কোনো বাঙালি পাঠকেরও রুচিহীন মনে হয়নি। যুক্তিবাদী প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই নিজেকে কমনসেন্স, সাধারণ বুদ্ধি বা 'সুবুদ্ধি'র প্রবক্তারূপে ঘোষণা করেছেন; 'চার ইয়ারী কথা'র রূপসী উন্মাদিনী কোনো মায়াপুরীর আভাস এনে দিলো না—নেহাৎই ডাক্তারি অর্থে পাগল হ'য়ে কল্পনার ডানা কেটে দিলে। এবং, সব ফেনিলতা সত্ত্বেও, 'কল্লোল' পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিলো 'রিয়্যালিজম'; তার তরুণ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে আপত্তি করেছিলো—তাঁরা বাস্তববাদী ব'লে নন, যথেষ্ট বাস্তববাদী নন ব'লে। তত্রাচ, সেই উত্তেজনার অধ্যায়েও, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রত্যেক রচনাই বাস্তব শিল্পের অবিকল উদাহরণ হয়নি—কেননা, কোনো লেখক বা সম্প্রদায়ের ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কখনোই সম্পূর্ণ মেলে না—আর মেলে না ব'লেই বাঁচোয়া—এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন শেষ বয়সে বুঝেছিলেন তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বাস্তবতার গুণেই আদরণীয়, তেমনি, ততদিনে, নব্য লেখকরাও কেউ-কেউ মেনেছিলেন যে নিছক বাস্তববাদে, শেষ পর্যন্ত, তৃপ্তি নেই।

বাংলা সাহিত্যের এই সন্ধিক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ। দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিলো; শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ সে-জমি ততদিনে জেতা হ'য়ে গেছে, এবং, একই কারণে, মণীন্দ্রলাল ও গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাঁকে কখনো হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশের দশকে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলী পড়েছেন, তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ব ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবতই, তাঁর বিষয়ে প্রথম গুণগ্রাহী আলোচনা করেন 'কল্লোলে'রই প্রাক্তন লেখকরা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-গোষ্ঠী— যার আদর্শের উচ্চতা সে-সময়ে কুখ্যাত ছিলো, আর যার সঙ্গে 'কল্লোলে'র কোনো মিল ছিলো না, তারও তরফ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁকে

অভ্যর্থনা জানাতে বেশি দেরি করেননি। মতভেদ ছিলো না সে-সময়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক শক্তিতে অসামান্য।

বর্তমান নিবন্ধকার একবার বলেছিলেন যে বাংলা কথাসাহিত্যে দুটো ধারা লক্ষ্য করা যায়: একটা বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র, অন্যটা রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী থেকে উৎসারিত। এই কথাটাকে এখন মনে হচ্ছে শোধনসাপেক্ষ; সত্যের নিকটতর হয় এ-কথা বললে যে বঙ্কিম, পূর্ব-রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্র একই মূল ধারার অন্তর্গত, এবং উত্তর-রবীন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্য ভাষাকে যতটা বদলেছেন, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারণাবিষয়ে ততটা পরিবর্তন আনতে পারেননি। আনতে পারেননি—এই ব্যর্থতার আংশিক দায়িত্ব পরবর্তী লেখকদেরও নিতে হবে, অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে কোথাও কোনো পরিণতির ইঙ্গিত দেননি তাও নয়। কিন্তু আজকের দিনে যখন বলি যে অন্নদাশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের বিপরীত লেখক, তার অর্থ এই যে অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ আলাদা জাতের গদ্য লেখেন, সামাজিক বিষয়ে তাঁর মতামতও ভিন্ন, কিন্তু উপন্যাস বস্তুটি কী—সে-বিষয়ে এই অসবর্ণ লেখকদ্বয়ের মূল ধারণায় বিশেষ প্রভেদ বোঝা যায় না। বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম ধারাটি আজ পর্যন্ত বাস্তববাদের পরিপোষক; ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ বাস্তবতাই বৃহত্তম ধারাটির মহত্তম উপজীব্য। উপন্যাস বলতে বাঙালি পাঠক বোঝে— তথ্যের সজীব ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিচিত্রণ, যে-সব তথ্য স্বভাবী মানুষের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত: এবং অধিকাংশ বাঙালি লেখকও তা-ই বোঝেন।

বলা যেতে পারে, এই স্থল থেকে সব ঔপন্যাসিকই যাত্রা ক'রে থাকেন। অর্থাৎ, স্বভাবী বা স্বাভাবিকের বর্ণনায় যাঁর কিছুমাত্র দক্ষতা নেই তিনি কখনো ঔপন্যাসিক হবেন না, যদিও কবি হ'তে পারেন। কিন্তু অনেক পশ্চিমী লেখক বাস্তব থেকে যাত্রা ক'রে বাস্তবের পরপারে পৌঁছন; উত্তীর্ণ হন, সারি-সারি আপাতবাস্তব চিত্রকল্পের সাযুজ্যে, প্রতীকের, এমনকি পুরাণের মায়ালোকে। বাস্তব চিহ্নসমূহ 'জীবন্ত' হয় না তা নয়—তা না-হ'লে তাঁদের প্রয়াস নীরক্ত রূপকমাত্রে পরিণত হ'তো—কিন্তু তাঁদের কাছে বাস্তব একটা ছল বা উপায় বা অভিনয়মাত্র, যার ব্যবহারে, সত্যিকার কবির মতো, মানব-মনের গোপন, সনাতন, নামহীন সম্পদকে তাঁরা ছেঁকে তোলেন। লক্ষ্যণীয়, মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এর উল্টো প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে : তাঁর পূর্ব-রচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথমে বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম উপন্যাসের শিরোনামাতেই কবিতা আছে; 'দিবারাত্রির কাব্য' শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্য-কবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম 'পাকা লেখা', সবচেয়ে কম স্পষ্ট, কিন্তু সেইজন্যেই তাতে বার-বার দিগন্ত দেখা যায়, যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে-থেকে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে, এমনকি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়—তাদের নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও—এই অলৌকিকের উদ্ভাস আমরা অনুভব করতে পারি, বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর প্রতিনিধি, এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটি আয়তন পায়—যেটা তথ্যগত নয়, ভাবগত। পরবর্তী, এবং এক দিক থেকে আরো পরাক্রান্ত রচনায়, এই ভাবায়তনের বদলে দেখা দিলো কঠোরতর বস্তুনিষ্ঠা, এবং এক মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা, যা পাঠকের কোনো দুর্বলতাকেই দয়া করে না, ভয় করে না সমাজের নিম্নতম পাঁক থেকে বাস্তবের ছবি উদ্ধার ক'রে আনতে। আস্তে-আস্তে এক দিগন্তহীন চতুষ্কোণ প্রদেশ তিনি দখল ক'রে নিলেন : মানুষের নিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উদ্ভাবনে উর্বর, জীবনসংগ্রামে আরক্তিম—যেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগী, কেরানি এবং কেরানির বৌ জীবন ও প্রজননের মূল সূত্রে অবিরাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য, এবং বাস্তবতাই এর প্রধান গুণ। অর্থাৎ, এর মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই; হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা—এই সব ঘুরে-ফিরে দেখা দেয়, এমনকি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায় না তা নয়, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়। একটি গল্প মনে পড়ছে যার নাম 'বিবেক'; তাতে এক দারিদ্র্যক্লিষ্ট পুরুষ মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টায় প্রথমে এক ধনী বন্ধুর ঘড়ি, পরে তার নিজেরই মতো এক দরিদ্রের টাকা চুরি করলে; তারপর, তার স্ত্রীর বাঁচার আশা নেই, বড়ো ডাক্তারের এই রায় শুনে সন্তপ্তচিত্তে ধনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু গরিব বন্ধুর প্রাপ্য বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রইলো।

মানুষের বিবেক শুদ্ধ ধনীর পক্ষপাতী, এই ব্যঙ্গই এখানে অভিপ্রেত; এবং অনুরূপ আরো অনেক উদাহরণ অনেক পাঠকই মনে আনতে পারবেন। বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্য-বোধের দ্বারা আক্রান্ত হ'তে দেননি; তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন', 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ন' প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপরীতগুলো কোনো ভাবগত আদর্শের চাপে ভেঙে পড়ে। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বভাবীরাও ছায়ামূর্তির মতো হানা দেয় না, রক্তেমাংসে সীমিত হ'য়ে থাকে; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় ঘটনাবিন্যাসও সর্বদাই যথাযথ মনে হয়। মধ্য-বিশ-শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি; যে-সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীর একটা অংশ প্রবল হ'য়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালের জন্য মূর্ত হ'য়ে রইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়; বঙ্কিমের মতো, অথবা কোনো-কোনো উত্তরপুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে দূরে স'রে যেতে হয়নি; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয়নি অতীতের কোনো নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে : বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন, এবং তার যে-অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, তা সাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

চিঠিপত্র

মেঘদূত-এর অনুবাদ

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

সংস্কৃত সাহিত্যিকরা বলেছেন, প্রতিক্ষণেই নতুন লাগা-টা রমণীয়তার স্বরূপ। কালিদাসের মেঘদূত সেই অর্থেই রমণীয়। যে-মেঘমন্দ্র শ্লোকের নিবিড় সংগীতে বিশ্বের বিরহবেদনা পুঞ্জীভূত, তার অনুবাদ অসম্ভব মনে হ'লেও চেষ্টা না-ক'রে উপায় নেই। ওদিকে Wilson, Jones প্রভৃতি, এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরদাচরণ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক দিন আগে এ-কাজে হাত দিয়েছিলেন। তারপর অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে বাংলা দেশে, যদিও সংখ্যার সঙ্গে গুণের অনুপাত তেমন আশাপ্রদ নয়। আমি পদ্যানুবাদের কথাই বলছি।

'কবিতা'য় পূর্বমেঘের অনুবাদ দেখে খুশি হলাম। আরও খুশি হলাম বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ ব'লে। পড়তে বসলাম অনেক আশা নিয়ে। সানন্দে স্বীকার করি নিরাশ হ'তে হয় নি। কয়েকবার পড়বার পর প্রসঙ্গত দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অনুবাদে সাত মাত্রার চতুষ্পর্বিক (অপূর্ণপদী) ছন্দ নির্বাচন খুবই সংগত। লঘুগুরুভেদে যতিবিন্যস্ত মন্দ্রাক্রান্তার রূপটা দাঁড়ায়: — — — — । ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ — । — ‿ — — ‿ — — । ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ গণবিন্যাসকে মাত্রায় বিশ্লিষ্ট করলে দাঁড়ায় ৮।৭।৭।৫। হলন্তকে দ্বিমাত্রিক ধ'রে মন্দাক্রান্তার অনুকরণ করা চলে বটে, কিন্তু প্রথম পর্বটি ৮ মাত্রার আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বটি ৭ মাত্রা হওয়ার দরুণ বাংলা ছন্দের মূল-নীতির বিরোধিতা হয়, তাছাড়া স্বরধ্বনির দীর্ঘীকরণ বাংলায় চলবে না ব'লে গুরু অক্ষরের জন্যে কেবলমাত্র হলন্ত অক্ষর প্রয়োগে মূলের ধ্বনিকল্লোল আনাও সম্ভব হয় না। অতএব বাংলার নিজস্ব ছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্তকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নিলে সপ্তমাত্রিক চতুষ্পর্বিক (অপূর্ণপদী) চরণই এই দীর্ঘায়ত ছন্দের অনুবাদে সবচেয়ে উপযুক্ত : ৭।৭।৭।৫, ৭।৭।৭।৪ ; বা ৭।৭।৭।৩।

এর আগে সপ্তমাত্রিকে পর্বান্তিক যমক এবং চরণান্তিক মিল পেয়েছি, যা বুদ্ধদেব বসু বর্জন করেছেন। এতে অনুবাদ মূলের স্বভাবানুবর্তী হয়েছে।

শেষের পর্বটিতে তিনি অনিয়মিতভাবে কখনো ৫, কখনো ৪ বা ৩ মাত্রা রেখেছেন। এতে বৈচিত্র্য বেড়েছে।

অনুবাদে চলতি ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অব্যয় ইত্যাদি প্রয়োগ তিনি নীতিগত-ভাবেই করেছেন মনে হ'ল। আধুনিক পাঠক এতে খুশি হবেন। কিন্তু 'যবে' 'পুন', 'তায়', 'যতেক', 'যেথা', 'সেথা' দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে', এবং পাদপূরণে 'রে' এ-সবের প্রয়োগ কেন ?

সতর্কতা সত্ত্বেও ১১ শ্লোকের তৃতীয় চরণে, ৪০ শ্লোকের তৃতীয় চরণে, ৪২ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে কিঞ্চিৎ গুরুচণ্ডালী ঘটেছে। তৎসম শব্দবহুল গাঢ়-বন্ধের সঙ্গে এই সব চরণের পর্ববিশেষ খাপ খায়নি ব'লে মনে হল।

> প্রভাবে হয় যার পৃথিবী উর্বর, এবং ভ'রে ওঠে শিলীন্ধ্রে
> শ্রবণরমণীয় তোমার সেই নাদ শুনবে চঞ্চল মরালদল,
> পাথেয় পদ্মের টুকরো কচি ডাঁটা, মানস-উদ্দেশে উৎসুক
> আকাশ-পথে, সখা, আকৈলাস ওরা তোমার হবে সহযাত্রী।

এই শ্লোকে পূর্বাপর পর্ববিন্যাসে 'টুকরো কচি ডাঁটা' একটু প্রাকৃত। ['বিসকিশলয়চ্ছেদ' কথাটির অনুবাদে মৃণাল-কিশলয়ের মতো সুশ্রাব্য শব্দকে হটিয়ে পদ্মের কচি ডাঁটা না-বললেও হ'ত। 'খণ্ড' অর্থে 'ছেদ' কথাটির অনুবাদও ('টুকরো') এখানে অপরিহার্য ছিল না।]

এই রকম 'চটুল পুঁটিমাছ' (৪০)-এর বিশেষণ 'ধবল কুমুদের কান্তি' একটু গুরুভার। তেমনি, 'নাসিকারন্ধ্রের মধুর বৃংহিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল' (৪২) এই চরণে শেষ পর্বটি বড় দুর্বল।

কবিতায় শব্দপ্রয়োগের আধুনিক কলাকৌশলের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল হ'য়েই এ-কথা বলছি।

৯ শ্লোকে 'ভবন্তং' পদের অনুবাদ করা হয়েছে 'আপনাকে'। সেইসঙ্গে পাদটীকায় বলা হয়েছে "যক্ষ মাঝে-মাঝে মেঘকে 'আপনি' বলছে। ৩৮ ও ৫১নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।" অনুবাদের এই অংশটুকু এবং তার সঙ্গে এই মন্তব্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। মেঘকে 'তুমি' সম্বোধনে যে-আবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে আপনি সম্বোধনে ঘটে তার মহতী বিনষ্টিঃ। একবার 'তুমি' আর একবার 'আপনি' সম্বোধন এমনি তো কানে বাজেই, তাছাড়া 'আপনি' সম্বোধন

নিঃসন্দেহে কবিতার রসাপকর্ষক। সংস্কৃতে আভিধানিক অর্থে 'ভবৎ' শব্দ সম্মানার্থক বটে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নিশ্বাসেই যুষ্মদ্ শব্দ আর ভবৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে কাব্যে, নাটকে—সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে। সম্পর্কে বড়কে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও যেমন, সম্পর্কে ছোটর ক্ষেত্রেও তেমনি যুষ্মদ্ আর ভবৎ শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায়। 'ভবতোঽয়ং ব্যাপারঃ। তৎ কিমিতি ত্বম্ উচ্চৈঃ শব্দং কৃত্বা স্বামিনং ন জাগরয়সি' (হিতোপদেশ)। এর অনুবাদ যদি করা যায় 'ব্যাপারটা আপনার, অতএব তুমি কেন উচ্চ শব্দ ক'রে প্রভুকে জাগাচ্ছ না?' তবে কেমন লাগে শুনতে? উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাস থেকে ভারবি-মাঘ পর্যন্ত যে-কোনো কবির কাব্যগ্রন্থের পাতায় আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। অনুবাদের এই আদর্শ মেনে নিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক আবেগমধুর অংশে, যেখানে নায়ক-নায়িকার প্রেম পরিণতি লাভ করেছে (অন্তত 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে অবতরণের রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি কেটে যাবার পর), সেখানেও দুজনের কথোপকথনের অনুবাদে আপনি-তুমির মিশ্রণ ঘটাতে হবে।

অনুবাদে ন্যূনপদতা ও অধিকপদতাও সর্বত্র এড়ানো যায়নি। ২৫ শ্লোকে 'নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেৎ'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'নীচৈ গিরি সেই নগরে আছে…' ইত্যাদি। মূলে 'আখ্যা' কথাটি অপ্রয়োজনীয় নয়। 'নীচৈঃ' শব্দটি সংজ্ঞা না-বুঝিয়ে 'নিম্ন'ও বোঝাতে পারত ব'লেই 'নীচৈরাখ্যং গিরিম্' লেখা হয়েছে। এটা নিছক পাদপূরণ ব'লে মনে হয় না। তাই অনুবাদ 'নীচৈ নামে গিরি' করলে ভালো হত না কি? আর মূলে 'তত্র' শব্দটি যখন 'বিদিশা'কে স্পষ্টত নির্দেশ করছে তখন 'সেই নগরে' না-ক'রে 'সেখানে' পদই চলত। সপ্তমাত্রিকতা বজায় রাখাও মুশকিল হ'ত না। এই শ্লোকেই আবার মূলানুগত 'নাগর' শব্দটি কানে বাধে। 'নাগর' শব্দটি সংস্কৃতে নাগরিকদের বোঝালেও বাংলায় 'প্রেমিক' (অবৈধ অর্থেই বেশি) অর্থে রূঢ়। মূলের অর্থ সাধারণ নাগরিক, প্রেমিক নয়। 'বারাঙ্গনা' শব্দটির সান্নিধ্য আছে ব'লে 'নাগর' শব্দটি 'অবৈধ প্রেমিকে'র অর্থই বহন্ করবে। কিন্তু মূলের অর্থ তো তা নয়। তখনকার সমাজব্যবস্থায় বারাঙ্গনাবিলাস এখনকার অর্থে অবৈধ বা নিন্দনীয় ছিল কি?

এই শ্লোকের দ্বিতীয় দুই চরণের বাক্যগঠনও মূলাতিপাতী। 'রতিপরি-

মলোদ্গারিভিঃ' শব্দটি 'শিলাবেস্মভিঃ' পদের বিশেষণ। রতিপরিমলোদ্গারীর অর্থ 'অঙ্গপরিমলে লিপ্ত' পর্বটিই বহন করছে। 'উদ্দামানি যৌবনানি'র জায়গায় 'রতির উদ্গারে মত্ত যৌবন' করার দরকার কী? শুধু মত্তই তো উদ্দামানির অর্থ দিচ্ছে। 'রতির উদ্গার' কথাটি প্রয়োগ করলে যথাস্থানে, অর্থাৎ শিলাগৃহের বিশেষণ হিসেবে করা উচিত ছিল। তা ছাড়া রতি-পরিমলের উদ্গার আর রতির উদ্গার কি এক? 'রতির উদ্গার' কথাটি প্রায় গ্রাম্যতাদোষের পর্যায়ে প'ড়ে যায়।

৩৫ শ্লোকে শেষের চরণে 'নখর' কথাটি অপ্রয়োজ্য। 'নখ' বিশেষত মানুষের নখ এবং নখর সাধারণত মানবেতর জীবের তীক্ষ্ণধার নখকেই বোঝায়' (বাংলাভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)। 'নখক্ষত' কথাটি রাখতে পারলে ভালো হ'ত। প্রিয়ার দেহে প্রেমিকের নখক্ষতকে 'নখরের আঘাত' বললে সে-আঘাত কি কাব্যদেহেই গিয়ে পড়ে না?

কিন্তু এহো বাহ্য। সমগ্রভাবে কবিতাটি পাঠ করলে এ-সমস্ত খুঁটিনাটি কথা মনেই আসে না। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অনুবাদে মূল কাব্যের আত্মা বিধৃত হয়েছে, এবং সেইটাই বড় কথা। আমরা সাগ্রহে উত্তরমেঘের অপেক্ষায় থাকলাম।

কলকাতা **জ্যোতিভূষণ চাকী**

'কবিতা' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'মেঘদূত' অনুবাদ করবার যে সৎ প্রচেষ্টা করেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাই। যদিচ একথা স্বীকার্য যে সংস্কৃত কাব্যের, বিশেষত 'মেঘদূত'-এর, উর্মিমুখর ঘনগর্জন বাংলাভাষার ললিত কণ্ঠে ফোটানো দুরূহ, এবং সে-জিনিশ ফোটাবার চেষ্টা করতে গেলে বাংলা ভাষাকে প্রায় জাত খোয়াতে হয়, তবুও, আমার মনে হয়, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসে এবং বিশ্বস্তচিত্তে এই অনুবাদ থেকে কালিদাস আস্বাদ করতে পারবেন।

'মেঘদূত' কাব্যে যে ঘনসংবদ্ধ চিত্রকল্পগুলি ছিল, সেগুলি অনুবাদে ঠিকমত রক্ষিত হয়নি (হয়তো করা সম্ভব নয়) ব'লে মনে হ'ল। সংস্কৃতের ঘন

পরমান্নে যেন বাংলার রেনো জল এসে ঢুকেছে, সবটাই কেমন পাৎলা হয়ে গেছে। 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ'— এই শোনা মাত্র আমাদের চোখের সামনে যেন উজ্জয়িনীর আকাশ নেমে আসে, তার ঘনবদ্ধ বিশাল সংস্কৃত মেঘরাশি আমাদের মনের উপর বিরাট বোঝার মতো চেপে বসে! কিন্তু 'দেখলো মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে। বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে'— এ যেন সেই ঘনব্যাপ্ত মেঘকে উপস্থাপিত করতেই পারলো না, একরাশ জলরঙের ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ নিয়ে আমাদের মনের আকাশে হাজির হ'ল।

'পূর্বমেঘ' পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু তেষট্টিটি শ্লোকের অনুবাদ ক'রে আপাতত কর্তব্য সাঙ্গ করেছেন। কিন্তু, আমার যতদূর জানা আছে, 'পূর্বমেঘ'-এর শ্লোকসংখ্যা চৌষট্টি। অপসারিত শ্লোকটি 'পূর্বমেঘ'-এর দ্বাবিংশতম শ্লোক, এবং সেটি প্রক্ষিপ্ত নয় ব'লেই মনে হয়।

> অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
> ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরী সম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥

এত কথা ব'লেও কিছু বলা হবে না, যদি না স্বীকার করি যে, চলিত ক্রিয়া প্রয়োগ ক'রেও সংস্কৃত ঢেউ ধরবার যে চেষ্টা করা হয়েছে (যা বহুস্থানে প্রায় সফল) তা শুধু উপভোগ্যই নয়, "নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য"। ছন্দোজ্ঞানী বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে যে অসামান্য হাত সে-কথা পুনর্বার প্রমাণিত হ'ল, এবং সর্বোপরি, 'মেঘদূত' অনুবাদের ভিতর দিয়ে তাঁর পুরাতনী স্বচ্ছ মনের পুনরাস্বাদ পেয়ে আমি আহ্লাদিত হলাম।

কলকাতা

তন্ময় দত্ত

লেখকের বক্তব্য

পত্রলেখক-দ্বয় আমার অনুবাদে যে-সব ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা ভাষার স্বভাবের জন্যই অনেক ত্রুটি প্রতিকারহীন; যে-সব স্থলে এখনো সংশোধনের অবকাশ আছে, আমি আবার চেষ্টা করবো।

কিন্তু 'আপনি-তুমি' বিষয়ে শ্রীযুক্ত চাকীর সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলুম না। তাঁর নজির অস্বীকার করছি না; সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণভাবে সর্বনাম দুটি বিনিময়ধর্মী হ'তে পারে; কিন্তু 'মেঘদূতে' যক্ষের মুখে 'আপনি'টা প্রত্যেক বারই বিশেষ অর্থ পেয়েছে ব'লে আমার ধারণা: সে-অর্থ চাটুকারিতার। যক্ষ রাজপুরুষ, অতএব চাটুবাক্যে নিপুণ; মেঘকে আবেদন জানাবার প্রাক্কালে সে মেঘের মহৎ বংশের যথারীতি উল্লেখ করেছে, এবং উত্তরমেঘের শেষাংশে মেঘের গুণ গাইতেও ভোলেনি। মনে হয়, আপন দুঃখের বেগে কথা বলতে-বলতে যক্ষের হঠাৎ মাঝে-মাঝে মনে প'ড়ে যাচ্ছে, তার সম্মুখবর্তী মেঘ কত বড়ো অভিজাত ও সজ্জন, আর তার এই প্রার্থনা কত অনুচিত, এবং তখনই 'আপনি' সম্বোধন ক'রে তার অবস্থার উপযোগী বিনয়প্রকাশের চেষ্টা করছে (উত্তরমেঘের উপান্ত্য শ্লোকে এই ভাবটি সুস্পষ্ট)। আমি তাই, অনভ্যাসজনিত আপত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও, 'ভবৎ' স্থলে সর্বত্রই 'আপনি' রেখেছি।

'অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাং…' শ্লোকটি অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত, তাঁদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংশোধন

'কবিতা'র গত আশ্বিন সংখ্যায় 'ডিলান টমাস' প্রবন্ধে টমাস-এর মৃত্যুর তারিখ ১৯৪৩ ছাপা হয়েছিলো। না-বললেও চলে, তারিখটি আসলে ১৯৫৩।

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র কবিতা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে থাকে; বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা কবিতার গঠন বিষয়ে গবেষণা করছেন। * **উৎপলা মুখোপাধ্যায়** নানা পত্রিকার লেখক, থাকেন রাঁচিতে। * **জ্যোতিভূষণ চাকী** দক্ষিণ কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন,

প্রাচীন ও আধুনিক বহু ভাষায় তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। **গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়**-এর জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩১৯-এ; তিনি সংস্কৃত কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ উপাধি নিয়েছেন, 'রাজকন্যা' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কর্ম করেন কলকাতায় রেল-দপ্তরে। * **তন্ময় দত্ত** কলেজের ছাত্র। * **তপন চট্টোপাধ্যায়**-এর বর্তমান বয়ঃক্রম উনিশ, ইনি কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি। * **তারক সেন** বার্নপুরে লোহার কারখানায় চাকরি করেন। **দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়** 'নীলাম্বরী' কাব্যগ্রন্থের লেখক। **বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'অবতামসী : আবার রাত্রি'; ইনি 'কবিতা'য় গত দশ বছর ধ'রে লিখছেন। **বিষ্ণু দে**-র 'হে বিদেশী ফুল' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে; এটি তাঁর কাব্যানুবাদের সংগ্রহ। * **বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত** কলকাতায় কলেজে পড়েন। **বুদ্ধদেব বসু**-র নতুন প্রবন্ধের গ্রন্থ 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' বর্তমানে যন্ত্রস্থ : প্রকাশ করছেন বেঙ্গল পাব্লিশার্স। * **মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র; তাঁর একটি কবিতার বই ও ছোটোদের জন্য বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'আকাশ', 'দিগন্ত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা **মৃণালকান্তি** (দাশ) সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পদবীত্যাগ করেছেন। তাঁর আদি-নিবাস শ্রীহট্ট, 'কবিতা'র সঙ্গে সংস্রব বহুকালের। বর্তমানে তিনি ভারতের নানা তীর্থে ভ্রাম্যমাণ। **মোহিত চট্টোপাধ্যায়** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পড়েছেন, 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' নামে তাঁর একটি কবিতার বই ছাপা হয়েছে। **রাজলক্ষ্মী দেবী** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্তের দিন' 'কবিতা'র আষাঢ় ১৩৬৩ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। **শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়** কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, এখন সরকারি কর্মে নিযুক্ত আছেন। **শান্তিকুমার ঘোষ** বর্তমানে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ গবেষণা করছেন। **শোভন সোম** শান্তিনিকেতনে চিত্রকলা ও রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা করেছেন, এখন মধ্যপ্রদেশে অধ্যাপক। * **সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়**-এর জন্ম ১৯১৩-তে; প্রকাশিত কবিতার বই 'আকাশ-মাটির গান'। ইনি হাওড়াতে সংগীতের শিক্ষকতা করেন। **সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত**-র প্রথম কবিতার বই আশুপ্রকাশ্য।

KAVITA
(*Poetry*)

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy
এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE
Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Navana Printing Works Private Ltd., 47 Ganesh Chunder Avenue, Calcutta-13

KAVITA—Vol. 21, No. 2, December, 1956

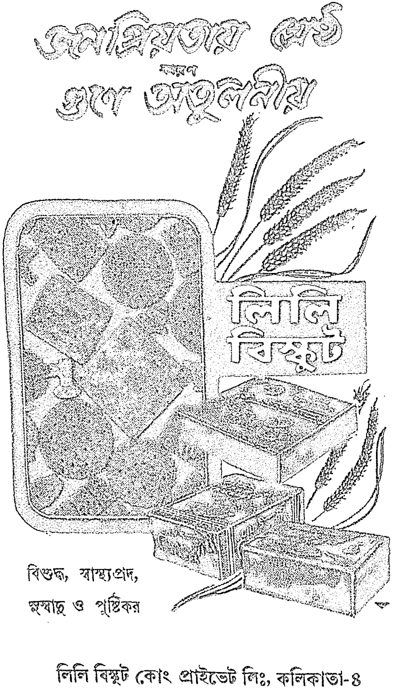

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক : নরেশ গুহ। কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে প্রকাশিত ও ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা-১৩ নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।

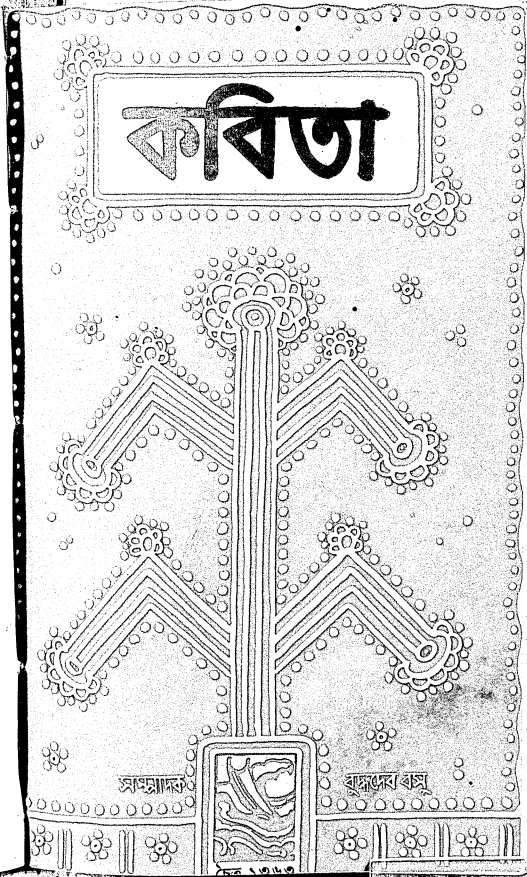

বিজ্ঞপ্তি

'কবিতা'র বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হ'লো ; সেজন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা চাই। আষাঢ় ১৩৬৪ সংখ্যা আগামী জুলাই মাসের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

দ্রুত মুদ্রণের চেষ্টায় এই সংখ্যার 'সংস্কৃত কবিতা ও "মেঘদূত"' প্রবন্ধে কিছু ছাপার ভুল প্রবেশ করেছে ; কোনো-কোনো উদ্ধৃতি সঠিক হয়নি। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এগুলো সংশোধন করা হবে।

—সম্পাদক

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৩

—এই সংখ্যায়—

বুদ্ধদেব বসু-র

প্রবন্ধ

সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত'

কবিতা

পরমেশ ধর, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, আবুল কাশেম রহিমউদ্দিন, ইমামুর রশীদ ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অনুবাদ

শার্ল বোদলেয়ার থেকে···বুদ্ধদেব বসু

কবিতাভবনের বার্ষিকী

বৈশাখী

প্রতিভা বসু-র সম্পাদনায় ১৩৬৪ সংখ্যা প্রকাশিত হ'লো।

দাম দেড় টাকা

সর্বত্র এজেণ্ট চাই

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) উইকলী ওয়েষ্ট বেঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র—বার্ষিক ৬ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩ টাকা।

(২) কথাবার্তা—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

(৩) বসুন্ধরা—গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) স্বাস্থ্যশ্রী—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টিবিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

(৫) পশ্চিম বংগাল—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

(৬) মগবেরী বংগাল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার-অধিকর্তার নিকট লিখুন।

প্র কা শি ত হ ল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড

জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত চিঠিপত্র।

বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও চিত্র সম্বলিত। মূল্য টা 4·00, বোর্ড টা 5·00

শ্রীরানী চন্দ

হিমাদ্রি

কেদারবদরী-ভ্রমণকাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের ন্যায়ই সুখপাঠ্য। মূল্য কাগজের মলাট টা 3·50, বোর্ড বাঁধাই টা 4·50

॥ দেবনাগরী লিপিতে রবীন্দ্রসাহিত্য ॥

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য সত্ত্বেও লিপির বাধার ফলে মূল রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়লাভের সুযোগ থেকে অনেকে বঞ্চিত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দেবনাগরী লিপিতে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগ।—

গীতাঞ্জলি

বাংলা গীতাঞ্জলির মূল পাঠ দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত। মূল্য টা 2·50, বোর্ড বাঁধাই টা 3·50

স্বরবিতান

গীতাঞ্জলি গীতালি ও গীতিমাল্য থেকে নির্বাচিত পঁচিশটি গানের স্বরলিপি সংকলন। মূল্য টা 3·00

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

ফরাশি সঙ্গ, কলকাতা

ALLIANCE FRANCAISE DE CALCUTTA

২৪ পার্ক ম্যানশন্স

কলকাতা ১৬

- ফরাশি আবহাওয়ায় ফরাশি ভাষা শিখুন।
- যাঁরা সবেমাত্র আরম্ভ করেছেন ও যাঁরা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ উপায়ে শিক্ষা দেয়া হয়।
- ১লা জুলাই ১৯৫৭ নতুন সেশন আরম্ভ হবে।
- বিস্তারিত বিবরণের জন্য ২৩-২৯৫৯-এ টেলিফোন করুন বা উপরোক্ত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন (সাক্ষাতের সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯—বিকেল ১টার মধ্যে বা বিকেল ৪—৬ টার মধ্যে।)

কবিতা

১৩৬৩

আশ্বিন

ও

পৌষ

সংখ্যায়

বুদ্ধদেব বসু-র

‘মেঘদূত’

অনুবাদ

এখনো পাওয়া যাচ্ছে

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাষিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ২৯

তরুণ সমাজের কাছে দাবী...

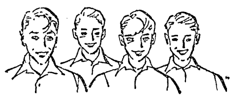

তরুণ সমাজের ওপর দেশের ভরসা অনেক। যে কোন প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের পুরোগামী তাঁরাই, রেলওয়ে আজ তাই আর এক সমাজ কল্যাণের দাবী নিয়ে তাঁদের দ্বারস্থ—অন্যায়ভাবে কেউ ট্রেনের শিকল টানতে গেলে তাকে যেন তাঁরা বাধা দেন।

তাঁদের এই সামান্য কাজের ফলে রেলপথে যাত্রী ও মাল পরিবহণ নির্বিঘ্ন হ'বে, দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হ'বে। অযথা শিকল টানলে শুধু সময়েরই অপচয় হয়না, বহু হতাশা এবং কখনও বা শোচনীয় পরিণতির কারণও ঘটে।

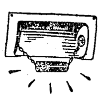

অপরিহার্য
না হ'লে ট্রেনের
শিকল টানবেন না

পূর্ব রেলওয়ে • দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৩
একবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮৯

সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত'

সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে আজকের দিনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেই বিচ্ছেদ দুস্তর না হোক, সুস্পষ্ট। আর তার কারণ শুধু এই নয় যে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা আমরা করি না। চর্চা করি না—এ-কথা সত্য কিনা তাও সন্দেহ করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদাহ্রাস, আধুনিক যন্ত্রযুগে সংস্কৃত বিদ্যার আর্থিক মূল্যের অবনতি, কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতের ক্ষীয়মাণ প্রয়োজন—এই সব নৈরাশ্যকর তথ্য সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক'রে থাকেন; যাঁরা নামত এবং প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত, তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। এমন নয় যে দেশসুদ্ধ সবাই সংস্কৃত ভুলে গেছে, স্কুলে-কলেজে তা পড়ানো হয় না, কিংবা আধুনিক বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কোনো যোগ নেই। বরং, আধুনিক বাংলা ভাষায় দেশজ শব্দের বদলে তৎসম ও তৎভবের প্রচার বেড়েছে (তথাকথিত বীরবলী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়), এবং রবীন্দ্রনাথ, যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর বিরাট মূলধনের বড়ো একটি অংশের নামও সংস্কৃত। অথচ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়েন, তাঁদের মধ্যে হাজারে একজনও কোনো সংস্কৃত কাব্যের পাতা ওল্টান কিনা সন্দেহ। যে-সব শিক্ষাপ্রাপ্ত বা শিক্ষালাভেচ্ছু বাঙালি 'হ্যামলেট' প'ড়ে থাকেন, বা গ্যেটের 'ফাউস্ট', বা—এমনকি—'ঈডিপস রেক্স' অথবা 'ইনফার্নো', তাঁদের মধ্যে ক-জন আছেন যাঁদের 'মেঘদূত' বা 'শকুন্তলা' পড়ার কৌতূহল জাগে, কিংবা যাঁরা ভাবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় না-থাকলে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লো না? মানতেই হয়, তাঁদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর।

এই অবস্থার জন্য আমাদের অত্যধিক পশ্চিমপ্রীতিকে দোষ দেয়া সহজ, কিন্তু পশ্চিমের প্রতি এই আসক্তি কেন ঘটলো তাও ভেবে দেখা দরকার।

আমি এ-উত্তর দেবো না যে সৃষ্টিশীল জীবিত ভাষায় রচিত পশ্চিমী সাহিত্যের আকর্ষণ এত প্রবল যে তার প্রতিযোগে সংস্কৃত দাঁড়াতে পারে না। পশ্চিমের আকর্ষণ নিশ্চয়ই দুর্বার, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে আমাদের যা পাবার আছে তাও মূল্যবান, এবং অন্য কোথাও তা পাওয়া যাবে না। এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য, কিন্তু বিশেষভাবে প্রয়োজ্য ভারতীয়ের পক্ষে; যিনি কোনো ভারতীয় ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁর পক্ষে সংস্কৃতের অভাবের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। এই কথাটা তর্কস্থলে মেনে নেবার তেমন বাধা হয় না, কিন্তু কথাটাকে কাজে খাটাতে গেলেই বিপদ বাধে। আসল কথা, আমরা সংস্কৃতের সম্মুখীন হ'লেই ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করি, তার সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ জেগে উঠলেও উপযোগী খাদ্য পাই না;—যা পাই, তা শুধু তথ্য (তাও তর্কমুখর), নয়তো উচ্ছ্বাস, নয়তো হিন্দু-নামাঙ্কিত এক তুষারীভূত মনোভাব, যা কালের গতিকে অস্বীকার ক'রে নিজের মর্যাদায় স্থবির হ'য়ে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের, সাহিত্য হিশেবে, চর্চার পথ তৈরি হয়নি; চলতে গেলেই হুঁচট খেতে হয় ইতিহাসে, ঘুরতে হয় দর্শনের গোলকধাঁধায়, নয়তো ব্যাকরণের গর্তে প'ড়ে হাঁপাতে হয়। আসল কথা, আমাদের সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ এখনো স্থাপিত হয়নি।

প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম একই জগতের অন্তর্ভূত ছিলো, কিন্তু য়োরোপ ও ভারতের মানস-বাণিজ্যে সারা মধ্যযুগ ভ'রে যে-অবরোধ বিস্তার লাভ করে, তার অবসান ঘটলো বলতে গেলে মাত্র সেদিন, যখন বের্নিয়ে উপনিষদসমূহের একটি ফার্শি অনুবাদ য়োরোপে নিয়ে যান। অনুবাদটির সম্পাদনা করেছিলেন শাজাহান-পুত্র দারা শুকো; তা থেকে দুপের্ঁ নামক আর-একজন ফরাশি লাটিন, গ্রীক আর ফার্শি মেশানো এক অদ্ভুত ভাষায় যে-অনুবাদ রচনা করেন, তারই সাহায্যে আধুনিক য়োরোপ প্রথম ভারতীয় চিত্তের সংস্পর্শ পায়। দুপের্ঁর অনুবাদের তারিখ ১৮০১; শোপেনহাওয়ার এই পুঁথি প'ড়েই বলেছিলেন যে 'উপনিষদ' তাঁর জীবনব্যাপী সান্ত্বনা এবং মৃত্যুকালীন শান্তি। কিন্তু তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য সমাজে সংশয় জেগেছিলো, সংস্কৃত নামে কোনো ভাষা সত্যি আছে কিনা, না কি সেটা ব্রাহ্মণদের জালিয়াতি।

ক্রমশ যখন প্রমাণ হ'লো যে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আছে, এবং সে-ভাষায় একটি বিরাট সাহিত্যও বিদ্যমান, তখন সারা য়োরোপে—জর্মানি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ইটালিতে—দেখা দিতে লাগলেন প্রাচীতত্ত্বজ্ঞের দল, বহু পুস্তক প্রণীত হ'লো, বহু সংস্কৃত পুঁথি ছাপা হ'লো, এবং আমরা, য়োরোপের হাত থেকে, আমাদেরই সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেলাম।

অর্থাৎ, আধুনিক ভারতে সংস্কৃত চর্চা একটি বিলেত-ফেরৎ সামগ্রী। ভারতের তুলো বা পাট নিয়ে গিয়ে শ্বেতাঙ্গরা যেমন বস্তুটিকে বিবিধ প্রস্তুত পণ্যের আকারে ভারতের হাটেই প্রচার করেছে, তেমনি তাদের বুদ্ধির প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত বিদ্যাও রূপান্তরিত হ'লো নানা রকম ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞানে। সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কারের ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করলেন পশ্চিমী পণ্ডিতেরা; 'আর্য' বা 'ইন্দো-য়োরোপীয়' বংশাবলীর সন্ধান পেয়ে ইতিহাসের মূল ধারণা বদলে দিলেন; প্রত্নতত্ত্বের নতুন দ্বার খুলে গেলো, এবং ধর্মতত্ত্বে গবেষণার ক্ষেত্র তিব্বত, বর্মা, মহাচীন অতিক্রম ক'রে জাপানের দিগন্তসীমায় প্রসারিত হ'লো। এই আকারেই য়োরোপের হাতে সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেয়েছি আমরা—ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্বের আকারে; এবং নিজেরা যেটুকু কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছি তাও এই সব ক্ষেত্রে—ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বে।

এমন কেউ নেই, যিনি এ-সব বিষয়ে গবেষণা বা আলোচনার মূল্য স্বীকার না-করবেন। কিন্তু যে-কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি, এবং মাঝে-মাঝে যা নিজেদের এবং অন্যদের স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়, তা এই যে এ-সব বিষয় সাহিত্য নয়, এবং সাহিত্যের আত্মা বিষয়ে উদাস বা নিঃসাড় হ'য়েও এ-সব ক্ষেত্রে কৃতী হওয়া যায়। বস্তুত, সংস্কৃত বিষয়ে য়োরোপীয় ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা যেমন বিপুল, ঠিক তেমনি বিরল তার মধ্যে কোনো সপ্রাণ সাহিত্যিক মন্তব্য, কবিতা বিষয়ে কোনো অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় সংস্কৃতের কোনো মূল্যায়নের প্রয়াস। গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তি, এমার্সনের 'ব্রহ্ম', হুইটম্যানের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'—এগুলো বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিক উদাহরণমাত্র: সমগ্রভাবে এই কথাই সত্য যে সংস্কৃত ভাষার রচনাবলীর মধ্যে শ্বেতাঙ্গরা দেখেছেন—গ্রীক বা লাটিনের মতো কোনো

সাহিত্য নয়, রসসৃষ্টি নয়, সৃষ্টিকর্ম নয়—দেখেছেন ইতিহাস ইত্যাদির উপাদান, আর ভারতীয় মনের পরিচয় পেয়ে ভারতবাসীকে বশীভূত রাখার একটি সম্ভাব্য উপায়। শেষের কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। স্বনামধন্য উইলসন 'মেঘদূতে'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন; সেই অনুবাদ বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো, কিন্তু তাঁর সুখপাঠ্য টীকা প'ড়ে বোঝা যায়, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের ভূগোল, জলবায়ু, পশুপাখি ও উদ্ভিদবিষয়ে জ্ঞানদান, এবং এ-বিষয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে অবহিত করা যে ভারতীয় মানুষ বর্বর নয়, এমনকি কৃতজ্ঞতার মূল্য বোঝে ('ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়। প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥')। অক্সফোর্ডের বডেন-অধ্যাপকের পদ যাঁর দানের ফলে সম্ভব হয়, সেই লেফটেনান্ট-কর্নেল বডেন স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে এই পদ-স্থাপনে তাঁর লক্ষ্য সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল-অনুবাদের উন্নয়ন, 'যাতে তাঁর স্বদেশীয়রা ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাবার কর্মে অগ্রসর হ'তে পারে।' এই পদের প্রথম দুই অধিকারী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন ও সশ্রদ্ধ ছিলেন: উইলসন-এর নিয়োগের সপক্ষে প্রধান অনুমোদন ছিলো বাইবেলের কতিপয় শব্দের তৎকৃত সংস্কৃত অনুবাদ; এবং মনিয়র-উইলিয়মস তাঁর বৃহৎ ও মহৎ অভিধানের ভূমিকায় জানাতে ভোলেননি যে তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে বাইবেলের জনৈক অনুবাদক প্রচুর সাহায্য পান। অবশ্য খৃষ্টধর্মের প্রচার বিষয়ে সব লেখক সরব নন, কিন্তু ভারতীয় বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইংরেজ মাথা ঘাটাননি—হোক তা ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, কৃষি বা ব্যাকরণ—যিনি মনে-মনে না-জানতেন যে তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও-বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বলতে উনিশ শতকে যা বোঝাতো, সেই বিরাট দায়িত্বের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাও গ্রথিত ছিলো। এ-কথা ব'লে পথিকৃৎ ইংরেজ লেখকদের সাধুতায় আমি সন্দেহপাত করছি না—সাম্রাজ্যশাসন ও সাধুতায় কোনো বিরোধ ছিলো না তাঁদের মনে—এবং তাঁদের কাছে সারা ভারতের ঋণ কত গভীর সে-বিষয়েও আমি সম্পূর্ণরূপে সচেতন। আমি শুধু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাচ্ছি। রেনেসাঁসের সময় গ্রীসের অভিঘাতে য়োরোপীয় চিত্তের যে-বৃত্তি জেগে উঠলো তার নাম সৌন্দর্যবোধ, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য

গবেষণাকে তারই শাখা-প্রশাখা বললে ভুল হয় না। কিন্তু ভারতের আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার ঘটলো একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের প্রাক্কালে, সেইজন্য প্রথম থেকেই মনোযোগ পড়লো তথ্যের দিকে, রসের দিকে নয়, বিশ্লেষধর্মী বিজ্ঞানের দিকে, সংশ্লেষধর্মী উপলব্ধির দিকে নয়। সারা য়োরোপের প্রাচ্য বিদ্যার এ-ই হ'লো সামান্য লক্ষণ। সেইজন্য, সাহিত্য যেখানে কেবল সাহিত্য, সেই ক্ষেত্রে য়োরোপীয় ভারতজ্ঞের কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই। এই একটা দিকে, আমাদের মনকে তাঁরা জাগাতে পারেননি; আর দুঃখের বিষয় আমাদের উনিশ-শতকী জাগরণও এ-বিষয়ে নিষ্ফল হয়েছে।

ইংরেজি ভাষায় যে-সব গ্রন্থ নামত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সকলেই জানেন তাদের মধ্যে ইতিহাসের অংশই মুখ্য, সাহিত্য সেই সত্তার সাজাবার উপলক্ষ্য মাত্র। পুস্তকের বড়ো অংশ ব্যয় হচ্ছে কালনির্ণয়ে ও তথ্যবিচারে, তারপরে আছে গ্রন্থাদির তালিকা ও চুম্বক। সমালোচনা বা গুণগ্রহণের চেষ্টা বা ইচ্ছা নেই তা নয়, কিন্তু প্রায়শই তা ভীরু ও অর্ধমনস্ক, লেখক নিজেই তাঁর কথায় বিশ্বাসী কিনা সে-বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ থেকে যায়। যেখানে হয়তো নিন্দা তাঁর মনোগত ভাব, সেখানে তিনি শিষ্টতার আড়ালে আত্মগোপন করেন; আর তাঁর প্রশংসার মধ্যেও সে-ধরনের উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না, যাতে আলোচ্য কবি বা কবিতার কোনো নতুন অর্থ ধরা পড়ে। ফলত, পুরো ব্যাপারটা এক মৃদু, মোলায়েম ও পাণ্ডুবর্ণ বিবরণের আকার নেয়, যা পাঠ ক'রে কবির আনুমানিক কাল, কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য আমরা জানতে পারি, কিন্তু কাব্যটি কেমন, ভালো যদি হয় তো কোন ধরনের ভালো, বিদেশী কাব্যের এবং আধুনিক পাঠকের সঙ্গে সেটি কোন রকমের সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই সব জরুরি বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। উইলসন তাঁর 'মেঘদূতে'র টীকায় পশ্চিমী কাব্য থেকে বহু সদৃশ অংশ তুলে দিয়েছেন; কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে অংশগুলি জ্ব'লে ওঠেনি, কোনো ভাবনার প্রভাবে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়নি, জড় বস্তুর মতো শুধু পাশপাশি প'ড়ে আছে। 'পরস্পরে প্রবিষ্ট' বলতে কী বোঝায়, তার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় এলিয়টের কবিতা ও প্রবন্ধ, বা আঁদ্রে মালরো-র শিল্পবিষয়ক রচনাবলী, যেখানে দেশকালের দূরত্বদ্বারা আপাতবিচ্ছিন্ন ছবি বা কবিতা উদ্দেশ্যময় প্রতিবেশিতার

ফলে একই বিশ্ব-ভাবনার অঙ্গ হ'য়ে পরস্পরকে বর্ধিত ও রঞ্জিত করে। এই সংশ্লেষ ঘটাবার জন্য কিছুটা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন, এবং পণ্ডিতের কাছেও সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু য়োরোপীয় প্রাচীতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণত এই গুণে বঞ্চিত, এবং আমরা সম্প্রতি তাঁদেরই কাছে সংস্কৃত শিখেছি। ফলত, স্বদেশীয়দের রচনাও একই পথ নিয়েছে; এ-দেশেও সংস্কৃত বিদ্যার অর্থ দাঁড়িয়েছে শাল-তারিখ নিয়ে সংগ্রাম, তথ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা, এবং বিবরণ। আমরা যারা সাধারণ পাঠক আমাদের প্রায় ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে সংস্কৃত 'মৃত' ভাষা হ'লেও তার সাহিত্য জীবন্ত; প্রায় বিশ্বাস করানো হয়েছে যে গ্রীক, চীন, লাটিন, এবং সব দেশের আধুনিক সাহিত্যে যে-সহজ প্রাণস্পন্দন আমরা অনুভব করি, তা থেকে বঞ্চিত শুধু সংস্কৃত, পৃথিবীর মধ্যে শুধু সংস্কৃতই এক বিশাল ও শ্রদ্ধেয় শবে পরিণত হয়েছে, ব্যবচ্ছেদের প্রকরণ না-শিখে যার সম্মুখীন হওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে সংস্কৃত কবিতার যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে এই তার অন্যতর কারণ।

২

দ্বিতীয় কারণ—সংস্কৃত ভাষার ও ব্যাকরণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতে শব্দসংখ্যা বিপুল, প্রতিশব্দ অসংখ্য। তার কিছু অংশ বাংলাতেও চ'লে এসেছে; আমরা যারা সংস্কৃতে শিক্ষিত নই আমরাও খুব সহজে যে-কোনো বহুব্যবহৃত বিশেষ্যপদের একাধিক নামান্তর ভাবতে পারি: গৃহ, ভবন, নিকেতন; তরু, বৃক্ষ, দ্রুম—এমনি সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু বাংলার সঙ্গে—বা যে-কোনো জীবিত ভাষার সঙ্গে—সংস্কৃতের একটি ব্যবহারগত মৌল প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলায় আমরা 'প্রিয়ার ভবন' বা 'রাজভবন' বলবো, কিন্তু 'যদু ঘোষের ভবন' বলবো না, 'যদু ঘোষের গৃহ' বললেও বেসুরো ঠেকতে পারে। অর্থাৎ, 'ভবন' বা 'নিকেতন' শব্দকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে প্রেমের, সম্মানের বা প্রতিষ্ঠানিক একটি ইঙ্গিত জড়িত হয়েছে। তেমনি 'বটবৃক্ষ', 'তরুলতা', 'বোধিদ্রুম'—এই প্রয়োগসমূহে শব্দগুলোর অর্থ ঠিক এক থাকছে না, আকারে-প্রকারে গাছেদের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়ে দিচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে যখন লেখেন, 'বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছেন',

তখন এই শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে গাছের বৃক্ষত্ব আমাদের মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতে প্রতিশব্দসমূহ বিনিময়ধর্মী, তাদের মধ্যে অনায়াসে অদল-বদল চলে, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনাও প্রায় অফুরন্ত। এবং এই প্রতিশব্দ-প্রয়োগ সংস্কৃত কবিতার প্রকরণের একটি প্রধান নির্ভর; এমন পুঁথিও পাওয়া গেছে যা প্রতিশব্দের তালিকা, যা থেকে লেখকরা, ছন্দের প্রয়োজন বুঝে, যথোচিত মাত্রাযুক্ত শব্দ বেছে নিতে পারেন। এ-ধরনের কোনো পুঁথি কালিদাসের হাতের কাছে ছিলো কিনা জানা যায় না, তবে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে বহু প্রতিশব্দ ব্যবহার না-ক'রে সংস্কৃত ছন্দ রচনা অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক আধুনিক ভাষা উত্তরোত্তর প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলেছে—তাদের ধর্মই তা-ই; এবং এ-কাজে যে-ভাষা যত বেশি অগ্রসর তাকেই আমরা তত বেশি পরিণত বলি, তত বেশি সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। স্ত্রীজাতি—যাকে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রধান উপাদান বললে ভুল হয় না—তার কতিপয় প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর অভিধান থেকে উদ্ধৃত করি:

নারী:	a woman, a wife ; a female or any object regarded as feminine.
স্ত্রী:	'bearer of children', a woman, female, wife, the female of any animal.
রমণী:	a beautiful young woman, mistress.
ললনা:	(লল=ক্রীড়াশীল) a wanton woman, any woman, wife.
অঙ্গনা:	a woman with well-rounded limbs, any woman or female.
কামিনী:	a loving or affectionate woman ; a timid woman, a woman in general.
বনিতা:	(বনিত=প্রার্থিত, ঈপ্সিত, প্রণয়যোগ্য) a loved wife, mistress, any woman (also applied to the female of an animal or bird)
বধূ:	a bride or newly-married woman, young wife,

spouse, any wife or woman, a daughter-in-law, any young female relation ; the female of any animal, (esp.) a cow or mare.

মহিলা : a woman, female, a woman literally or figuratively intoxicated.

যোষিৎ (যোষণা) : a girl, maiden, young woman, wife.

দেখা যাচ্ছে, 'নারী' ও 'স্ত্রী' সাধারণ শব্দ, সমগ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রয়োজ্য, কিন্তু অন্য প্রত্যেকটির অভিপ্রায় ছিলো স্ত্রীজাতির মধ্যে বয়স, রূপ বা স্বভাবের প্রভেদ বোঝানো। অথচ একই সঙ্গে প্রত্যেকটির একটি সাধারণ অর্থও উল্লিখিত হয়েছে—পশু-পাখির স্ত্রীজাতিও বাদ পড়েনি—এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যা গৃহীত হয়েছে তা এই শব্দসমূহের বিশেষ-বিশেষ অর্থ নয়, অর্থের অতিব্যাপ্তি। কিংবা —এটাই বেশি সম্ভব ব'লে মনে হয়—কবিদের ব্যবহার থেকেই অভিধানকার সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ, এই শব্দগুলোর মূল অর্থ উপেক্ষা ক'রে কবিরা তাদের নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন, ভিন্ন-ভিন্ন ধারণাকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিরভিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে। কালিদাস যখন বলেন—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং

আর যখন বলেন—

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্

আর—

স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু

আর—

নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্

তখন 'স্ত্রী', 'বধূ', 'কামিনী' ও 'যোষিৎ'-এ বিন্দুমাত্র অর্থভেদ সূচিত হয় না ; বিবাহিত কি কুমারী, গৃহস্থ কি গণিকা, তরুণী কি প্রৌঢ়া—কোনো দিকেই কোনো ইঙ্গিত নেই, প্রতি ক্ষেত্রে শুধু নিছক নারীকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় 'বধূ' বলতে নববধূ বা পুত্রবধূকেই বোঝায়, 'স্ত্রী' বলতে বিবাহিত পত্নী —আর 'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ আমরা ব্যবহারই করবো না, যদি না রূপের

রমণীয়তা বা কামের প্রবণতা বোঝাতে চাই। একজন জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন—

তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

তখন 'মহিলা' শব্দ 'নারী'র নামান্তরমাত্র থাকে না, তাতে সমকালীন বিভাব জেগে ওঠে, আমরা অনুভব করি এই শ্লোকের উদ্দিষ্টা সেই আধুনিকাদের একজন, বক্তারা যাঁদের 'ভদ্রমহিলাগণ' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। আমাদের মনে এই মহিলার স্পষ্ট ছবি জেগে ওঠে : তিনি অত্যন্ত তরুণী নন, আমাদেরই মতো নগরে বাস করেন, এবং এই শব্দের প্রয়োগে 'কিন্নরকণ্ঠ' ও 'অমৃতসূর্যে'র সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রতিতুলনার বেদনাও প্রতিভাত হয়। এক-একটি শব্দের এই বিশেষ অভিঘাত, আমরা যাকে কবিতার প্রাণ ব'লে ধারণা করি, তা সংস্কৃতে সম্ভব হয় না। সেখানে, কোনো-একটি ধারণার জন্য, একের বদলে অন্য শব্দের ব্যবহার হয় শুধু ছন্দের তাগিদে, সন্ধি-সমাসের প্রয়োজনে, বা ধ্বনি-মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে ব'লে। কোনো শব্দই অসংগত নয়, কোনো শব্দই অনিবার্য বা অনন্য নয়।

তাছাড়া, বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করবার যে-ক্ষমতা সংস্কৃত ব্যাকরণের আছে, তার ফলে—আমি যাকে অর্থের অতিব্যাপ্তি বলছি, তার প্রায় সীমা থাকে না। উপরোক্ত শব্দসমূহ কবির পক্ষে যখন যথেষ্ট হয় না, তখন আছে বিবিধ বর্ণনামূলক শব্দরাজি : বিম্বাধরা, নিতম্বিনী, ভামিনী, মানিনী—এই তালিকা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। অধরের বর্ণ, নিতম্বের গুরুত্ব, কোপ অথবা অভিমানের অনুষঙ্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে এরাও পরিণত বা অবনত হ'তে পারে শুধুই 'নারী'তে—এমনকি 'মৃগাক্ষী', 'চারুহাসিনী' বা 'ক্ষীণমধ্যমা'র পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। সংস্কৃতে 'জলে'র যত প্রতিশব্দ আছে, তার যে-কোনোটির সঙ্গে 'দ', 'ধর', বা 'বাহ' যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়াবে 'মেঘ'। ভাষার এই রকম স্বাধীনতা থাকলে শব্দের প্রাণশক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য।

আমি ভুলে যাচ্ছি না যে প্রত্যেক শব্দেরই উৎপত্তিস্থল বর্ণনা ; আমি বলতে

চাচ্ছি, শব্দ যখন বর্ণনার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে তখন তার বিকল্পের অভাবেই ভাষার পরিণতি সূচিত হয়। 'স্তন' শব্দের অর্থ—যে শব্দ করে (অর্থাৎ জানিয়ে দেয় যৌবন আগত), এ-কথা আভিধানিক ছাড়া আর কেউ না-জানলেও ক্ষতি নেই, বস্তুবিশেষের নাম হিশেবেই তা আমাদের কাছে গ্রাহ্য। এবং এই নামের মধ্যে একটা ছবিও বিধৃত হ'য়ে আছে, যা তার উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই ছবিটা স্পষ্ট হবার জন্যই এটা দরকার যে প্রত্যেকটি নামশব্দ একটিমাত্র উল্লেখের মধ্যে সীমিত থাকবে। 'বহ্নি' শব্দের আদি অর্থ বাহক (যে যজ্ঞের হবি দেবতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়) ; সেই অর্থ আমরা ভুলেছি ব'লেই এই যজ্ঞহীন যুগেও তাতে আগুন বোঝায়, নয়তো বাতাস, মেঘ বা নদীও বোঝাতে পারতো—কেননা তারাও বাহকের কাজ করে। 'জল' শব্দের একটি সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর মতে 'any liquid', কিন্তু যদি তা দুধ, মদ বা রক্তের বদলেও ব্যবহৃত হ'তো, তাহ'লে তার ব্যবহারই এতদিনে আর থাকতো না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেই সব সংস্কৃত শব্দকেই আধুনিক ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে অনুপযোগী মনে হয়, যারা একাধিক অসম্পৃক্ত অর্থের লোভ ছাড়তে পারেনি। 'পয়োধর' মানে মেঘ বা নারীর স্তন হ'তে পারে ; এতে বোঝা যায় তা সম্পূর্ণ নাম-শব্দ হয়ে উঠতে পারেনি, বৈশেষণিক পরাধীনতায় কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। 'রত্নাকর'-এর চলিত অর্থ সমুদ্র, কিন্তু লিঙ্গভেদহীন বাংলা ভাষায় পৃথিবীকেও রত্নাকর বলা সম্ভব, আর সেইজন্যই আধুনিক কবি শব্দটিকেই বর্জন ক'রে চলেন। 'বিম্বাধরা', 'নিতম্বিনী', 'ভামিনী' ইত্যাদিতেও সেই আপত্তি : তারা কোনো বস্তুর নাম নয়, বর্ণনা মাত্র। যেখানে একই অর্থ বহন ক'রে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে শব্দের বর্ণনার অংশ ভোলা যায় না। আর সংস্কৃতে নিত্য ঠিক তা-ই ঘটে থাকে ; 'নৃপ', 'ভূপ', 'ক্ষিতীশ', 'পৃথ্বীশ' প্রভৃতি শব্দের সংখ্যা এত বেশি যে তার কোনোটিকেই 'মানুষ' বা 'পৃথিবী' থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না (যদিও সে-ভাবে দেখানোই কবিদের উদ্দেশ্য), আর তা যায় না ব'লেই সেগুলোকে সন্দেহ হয় স্তুতিবাক্য ব'লে, রাজার রাজকীয় চিত্ররূপ—অন্তত আমাদের মনে—প্রকাশ পায় একমাত্র 'রাজা' শব্দে। এর মানে—সংস্কৃতে অনেক সময় শব্দসংখ্যা বেড়েছে অর্থের নতুনতর দ্যোতনার জন্য নয়, নেহাৎই বৈচিত্র্যের খাতিরে। এবং যে-শব্দ শুধুই বৈচিত্র্য

দেয়, তা কবিতায় কিছু দিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষাকে, তার বিপুল শক্তির জন্য, এই একটি দুর্বলতার মূল্য দিতে হয়েছে।

শুধু প্রতিশব্দের স্তূপীকরণদ্বারা সংস্কৃত মাঝে-মাঝে যে-সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারে, তার মূল্য অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মহাভারতে দ্রৌপদী যখন অর্জুনকে একই উক্তির মধ্যে কখনো 'পার্থ', কখনো 'কৌন্তেয়', কখনো 'গাণ্ডীবধন্বা' ব'লে সম্বোধন করেন, বা কোনো কামাতুর মুনি কোনো মানবী বা অপ্সরাকে আহ্বান করেন একবার 'মদিরেক্ষণা', একবার 'পদ্মগন্ধা', আর তার পরেই 'পীনস্তনী' ব'লে, সেই শব্দযোজনা আমরা মুগ্ধের মতো শুনতে বাধ্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এগুলো সত্যিকার প্রতিশব্দ নয়, শুধু বৈচিত্র্যের জন্য বসানো হয়নি, প্রত্যেকটি নাম বা বিশেষণ বক্তার আবেগসঞ্চারে আন্দোলিত। উত্তরমেঘে এর একটি সুন্দর উদাহরণ আছে : মেঘের মুখে যক্ষ তার প্রিয়াকে যে-বার্তা পাঠাচ্ছে, তার মধ্যে সম্বোধনরূপে যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে 'অবলা', 'চণ্ডী', 'গুণবতী', 'চটুলনয়না', 'কল্যাণী' ও 'অসিতনয়না'। এর মধ্যে 'চটুলনয়না' ও অসিত-নয়না'কে আভরণমাত্র মনে হ'তে পারে, কিন্তু অন্য তিনটি যক্ষের আবেগস্পন্দনে বিশেষ অর্থ পেয়েছে। এই ধরনের ব্যবহার এখানে আমার আলোচনার লক্ষ্য নয়, আমি শুধু সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করছি। আধুনিক ভাষা এক-একটি শব্দের প্রতিশব্দ বা প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়ে দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দের শক্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে ; আধুনিক কবির কাছে শব্দগুলো নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন বস্তু, বা শূন্য ও অস্বচ্ছ ছোটো-ছোটো আধার, যাকে তিনি ভ'রে তুলবেন, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে, তাঁরই ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ অর্থে, বিশেষ ব্যঞ্জনায়। শব্দ নিজেই তার নিজের বিষয়ে কোনো খবর দেবে, তা তিনি চান না ; তিনি চান শব্দ হবে উপায় কিন্তু বার্তা তাঁর নিজের। 'মেঘে'র বদলে 'জলদ' বা 'অম্বুবাহ' লিখলে, তাঁর মতে, কবিতার বেগটাকে শ্লথ ক'রে দেয়া হয়, কেননা মেঘের যে-সজলতা তাঁর রচনারই মধ্যে মূর্ত হবার কথা, ঐ শব্দ সেটাকে আগেই ফাঁশ ক'রে দিচ্ছে। 'জলে'র নামান্তররূপে 'বারি', 'নীর', 'অম্বু', প্রভৃতি গ্রহণ ক'রে তিনি প্রত্যক্ষতার ক্ষতি করতে চান না ; তিনি চান, সব সময় শুধু 'জল'ই ব্যবহার করবেন, আর তারই মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলবেন অভিজ্ঞতার ভিন্ন-ভিন্ন স্তর—প্রলয়ের কল্লোল থেকে অশ্রুবিন্দু পর্যন্ত বাদ যাবে না। এক-

একটি শব্দ থেকে কত বেশি কাজ আদায় ক'রে নেয়া যায়, আধুনিক কবির লক্ষ্য সেই দিকে ; আর সংস্কৃত কবির চেষ্টা যাতে প্রতিটি শব্দই স্বতন্ত্রভাবে সবর্ণ হয়। আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্য সমান নয়, মাঝে-মাঝে কোনো-কোনোটি চাবির মতো কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়, হঠাৎ তার আঘাতে চারদিক আলো হ'য়ে ওঠে, চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায়। 'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে'—এই প্রথম পংক্তিতেই পুরো কবিতার মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে : 'মনের মাটি', তার মানে, এটা শুধু আষাঢ়ে বর্ষার বর্ণনা নয়, এ-বর্ষা আমাদের মনের সৃষ্টিপ্রেরণার চিত্রকল্প, কবির কবিতার অনুপ্রেরণা, 'মরুময় দীর্ঘ তিয়াষা'য় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার কথাই বলা হ'লো এবং শেষের দিকে 'সৃজনের অন্ধকার' আর 'রচিত বৃষ্টি'ও সেই তৃষ্ণারই তৃপ্তির আভাস দিচ্ছে। সংস্কৃতে এ-ধরনের শব্দব্যবহার হয় না, প্রতিটি শব্দ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং নিজগুণে সম্ভোগ্য, তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনুরণন বা অনুরঞ্জন নেই। সেইজন্য সংস্কৃত কবিতা কোনো বিস্ফোরকের মতো পাঠকের মনের মধ্যে ফেটে পড়ে না ; কবিরা বহুবিধ ইঙ্গিতে-বলার কৌশল জানেন, কিন্তু একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার একাধিক স্তর প্রকাশ করেন না।

ব্যাকরণের আর-একটি নিয়মের উল্লেখ করবো, যাকে আমরা বাধা ব'লে অনুভব করি, সেটি এই যে সংস্কৃত বাক্যগঠনে কর্তার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। কিংবা, সত্যি বলতে, আমাদের অর্থে বাক্য বা পংক্তির অস্তিত্ব নেই সেখানে। শুধু একটি কর্তা, ও একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে, সমাসবদ্ধ বিশেষণের সাহায্যে, সুদীর্ঘ বাক্যরচনা তাতে সম্ভব ; কর্তা ও কর্মের মধ্যে মস্ত বড়ো ছেদ থাকলেও এসে যায় না, পাঠক বিভক্তির দ্বারা চিনে নেবেন। 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোকের আসল কথাটা হ'লো, 'কশ্চিৎ যক্ষ বসতিং চক্রে'—'এক যক্ষ বাস করলে'—বাকিটা যক্ষের ও তার বাসস্থানের বিশেষণ। শ্লোকটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

> এক স্বকর্মে-অমনোযোগী যক্ষ, প্রভুর (দত্ত) প্রিয়াবিরহ-(হেতু)-দুঃসহ একবর্ষভোগ্য শাপের-দ্বারা-বিগতমহিমা (হ'য়ে), সীতার-স্নানহেতু-পবিত্র, স্নিগ্ধছায়াতরু (ময়) রামগিরি-আশ্রমে বাস করলে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে মূলের একটি পদও এই বার্তার

কোনো-একটি অংশকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ করছে না ; শ্লোকটির শেষ পর্যন্ত না-পৌঁছলে ধারণা হবে না, ব্যাপারটা কী। লেখক যখন কালিদাস, তখন ধ্বনিমাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ধীরে ও সাবধানে শ্লোকের অন্বয় ক'রে তবে আমরা বুঝতে পারি, কথাটা কী বলা হ'লো। অর্থাৎ, কবিতা ও পাঠকের মধ্যে একটি বুদ্ধির ব্যবধান নিত্য উপস্থিত, পড়ামাত্র কোনো অভিঘাত হবার উপায় নেই—এবং আমরা যাকে পংক্তি বলি, তার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। 'আমাকে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'—এটা সংস্কৃতে অনায়াসে লেখা হ'তে পারে—'নাটোরের দিয়েছিলো দু-দণ্ড আমাকে শান্তি সেন বনলতা'—উপরন্তু কথাটা একাধিক পদে বিচ্ছিন্ন হবারও বাধা নেই, 'দিয়েছিলো' বদলি হ'তে পারে প্রথম পদে 'আমাকে' চ'লে আসতে পারে চতুর্থে। অর্থাৎ, সংস্কৃত কবিতার চলন ঠিক ক'রে দেয় পুরো স্তবক বা শ্লোক, আর আধুনিক কবিতা পদের বা পংক্তির চালে চলে। দুয়ের মূলমাত্রা বা unit স্বতন্ত্র। এবং এই প্রভেদ গুরুতর।

৩

আমি মনে-মনে যে-কথাটা ভাবছি এবারে তা বলা যেতে পারে : সংস্কৃত কবিতা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম, আদর্শ ও তত্ত্বের দিক থেকে তা-ই, অভ্যাসের দিক থেকেও তা-ই। সন্দেহ নেই, শিল্পমাত্রই রচিত, এবং সেই অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু আধুনিক কবিতা অন্তত পক্ষে স্বাভাবিকের অভিনয় করে, আর সংস্কৃত কবিতা সদম্ভে ও নির্লজ্জভাবে কৃত্রিমতাকে অঙ্গীকার ক'রে নেয়।

কোনো কবিতা যে-ভাষায় লেখা হচ্ছে সেই ভাষার চরিত্র তাকে বহুদূর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যায়, আর সংস্কৃত ভাষার চরিত্র এমন যে তা সর্বতোভাবে কৃত্রিমতার পরিপোষণ করে। তার জটিল ও আশ্চর্য ব্যাকরণ সহজ কথাও সোজাসুজি বলতে দেয় না, শব্দের বিনিময়ধর্মিতা ও সন্ধি-সমাসের কৌশল এক উক্তিতে বহু অর্থ সম্ভব ক'রে তোলে। এই ভাষা শ্বেতাঙ্গ ককেশীয়গণ ভারতে নিয়ে আসেন ; ভারতের প্রাগার্য সভ্যতা—আধুনিক পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন—অনেক বিষয়ে বেশি উন্নত ছিলো, তবু যে দেশ জুড়ে নবাগতের ধর্ম ও সংস্কৃতির জয় হ'লো তার একটি প্রধান কারণ এই ভাষার তর্কাতীত শ্রেষ্ঠতা। তবু

এ-বিষয়ে সন্দেহ ঘোচে না যে সংস্কৃতের প্রধান কাব্যসমূহ যে-সময়ে লেখা হয়, সে-সময়ে সংস্কৃত সত্যিকার অর্থে কথিত ছিলো কিনা : অন্তত মেয়েরা, শিশুরা আর প্রাকৃতজনেরা যে তাতে কথা বলতো না, তার প্রমাণ নাট্যসাহিত্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং যে-ভাষায় শিশুর মুখে বোল ফোটে না, স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমালাপ বা কলহ চলে না, যাতে ঘরকন্না বেচাকেনা ইত্যাদি নিত্যকার কাজ সম্পন্ন হবার উপায় নেই, সে-ভাষায় কেমন ক'রে কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে তা ভেবে আজকের দিনে আমরা অবাক হ'তে পারি। আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু একটি শর্তে : কবিতাকে 'জীবন' বা 'স্বাভাবিক' থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, তাতে অপণ্ডিতের অধিকার থাকবে না, প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্তি বর্জন করা হবে, হার্দ্য আবেদনের বদলে প্রাধান্য পাবে কৌশল, নৈপুণ্য, বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া।

প্রধান উপনিষদসমূহ এই অর্থে কৃত্রিম নয়, বরং তার বিপরীত প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ; ভাষা সেখানে প্রাণের তাপে জলন্ত, কবিতার উৎস মানুষের সমগ্র সত্তা, শুধু বুদ্ধি ও দক্ষতার শক্তি নয়। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলা হ'তো তার বহু লক্ষণ মহাভারত ও রামায়ণে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তাদের কাব্যগত প্রভাব কোনো মল্লিনাথের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে না, তৎক্ষণাৎ পাঠকের মনে আঘাত করে। বাল্মীকি-রামায়ণের ঋতুবর্ণনায় আমরা যেন সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই, আর 'কুমারসম্ভবে'র অকালবসন্ত যেন রঙ্গমঞ্চে বহু যত্নে সাজানো হয়েছে, আমরা যার দর্শকের বেশি হ'তে পারি না। মহাভারতের মৌষলপর্বের দ্বারা আমরা যে-কেউ যে-কোনো সময়ে অভিভূত হ'তে পারি ; আর গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনের অধ্যায় প'ড়ে গায়ে কাঁটা দেবে না শুধু সেই ব্যক্তির, যে স্বভাবতই কবিতার ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। কবিতার সঙ্গে পাঠকের এই-যে অব্যবহিত সম্বন্ধ, তারই কথা মনে রেখে এলিয়ট গীতাকে বলেছিলেন পৃথিবীর 'দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য', শ্রেষ্ঠ এই জন্যে যে তার কবিতার গুণগ্রহণের জন্য তার দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হবার প্রয়োজন হয় না*।

'The *Bhagvad*-*Gita* is the second greatest philosophical poem in my experience'—এলিয়টের মতে প্রথমটি অবশ্য 'ডিভাইন কমেডি'। লক্ষ্যণীয়, সাহিত্যিক কারণে যাঁরা বাইবেল পড়েন বা তার প্রশংসা করেন এলিয়ট তাঁদের পক্ষপাতী নন, কিন্তু

হয়তো এমন বললেও ভুল হয় না যে সংস্কৃত কবিতার মহত্তম মুহূর্তগুলি সে-সব গ্রন্থেই বিধৃত আছে, যাদের সাধারণত ধর্মশাস্ত্র বলা হয়।

কিন্তু পরবর্তী কাব্যসাহিত্য, আমরা দেখছি, ক্রমশই স্বাভাবিক থেকে দূরে স'রে আসছে, তার মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠছে সজ্জা, প্রসাধন, প্রকরণবিদ্যা। এই আদর্শের অবনতির দিনে সম্পূর্ণ অকবির পক্ষেও 'কাব্য' রচনা সম্ভব হয়েছে : কেউ যমকের সাহায্যে একই রচনার মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প সংশ্লিষ্ট করেছেন, কেউ বা কোনো অক্ষর বর্জন ক'রে কসরৎ দেখিয়েছেন, কেউ বা রচনা করেছেন ব্যাকরণের নিয়মাবলীর ছন্দোবদ্ধ উদাহরণ। এবং যাঁকে সংস্কৃতের শেষ ভালো কবি বলা যায়, সেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তার অনুপ্রাস ও আদিরসের একঘেয়েমিতে আজকের দিনে অচিরেই আমাদের ক্লান্ত করে।

শিলার বলেছিলেন কবিরা দুই জাতের : 'নাঈভ' ও 'সেন্টিমেণ্টাল' ; হয় তাঁরা নিজেরাই প্রকৃতি, নয় তাঁদের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির জন্য। গ্যেটে এই শব্দ দুটিকে 'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিক'-এর নামান্তররূপে চিহ্নিত ক'রে দেন ; একদিকে তাঁরা, যাঁরা আপন মানবিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে নিবিষ্ট ও দ্বন্দ্বহীন ; অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীর দল, আধুনিক অর্থে ব্যক্তি, যাঁদের কবিসত্তা ও সামাজিক সত্তায় প্রতিকারহীন বিরোধ ঘটেছে। আধুনিক কালের সব কবিকেই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভূত করা যায় ; যাঁরা তথাকথিত 'ক্লাসিসিস্ট' (যেমন এলিয়ট বা বাংলাদেশে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁরাও এই বিচ্ছেদের মধ্যে গৃহীত, এবং সেই অর্থে রোমান্টিক। যে-কবিরা বেদ, উপনিষদ ও পুরাণসমূহ রচনা করেছিলেন, তাঁদের আমরা নিঃসংশয়ে 'নাঈভ' বলতে পারি, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যাকে সংস্কৃত সাহিত্যের 'ক্লাসিকাল' যুগ ব'লে থাকেন, তার অন্তর্ভূত কবিরা প্রকৃতির মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছেন অথচ সত্যিকার ব্যক্তিগত উক্তির জন্যও প্রস্তুত হননি। আমাদের কাছে তাঁদের ক্লাসিসিজম-এর অর্থ—প্রথার সুমিতি, নিয়মের দার্ঢ্য, বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা, পরবর্তী কালে যার অর্থ দাঁড়ালো—নেহাৎ গতানুগতি। জয়দেবের স্বভাব ছিলো

ঐশ্বরিক মহিমা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে গীতাকে তিনি কবিতা হিশেবেই দেখেছেন ব'লে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

রোমান্টিকের, কিন্তু তাঁর কাব্যে এমন বিশেষণ বা উৎপ্রেক্ষা বিরল যাকে কবিপ্রসিদ্ধির সন্দেহ থেকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। এমনকি, ক্ষুদ্রাকার সুভাষিতাবলী—যেখানে আমরা হার্দ্য উচ্চারণ আশা করতে পারতাম—তারাও আশ্চর্যরকম কৃত্রিম, নির্মিত ও পারম্পরিক পুনরুক্তিপ্রবণ। কবি স্বাধীনভাবে তাঁর একান্ত নিজের গলায় কথা বলছেন—যা রোমান্টিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—তার উদাহরণ (ধর্মগ্রন্থের বাইরে) সারা সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। 'যঃ কৌমারহরঃ' ব'লে যে-বিখ্যাত কবিতার আরম্ভ, সেটি বিরলতার গুণেই বিখ্যাত ও আদৃত হয়েছে। তার লেখকের মতো খাপছাড়া মহিলা-কবি আরো দু-একজন থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথা সত্য যে আমরা যাকে লিরিক বলি, তার প্রকাশ, সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলতার তুলনায়, অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল।

এটা কেন হ'লো যে রসতত্ত্বের সংস্কৃত নাম অলংকারশাস্ত্র? 'অলম্' কথাটার অর্থ হ'লো যথেষ্ট; 'অলংকার' মানে—যথেষ্টীকরণ, যার দ্বারা কোনো জিনিশ যথেষ্ট হ'য়ে ওঠে। যা অলংকৃত নয় তা পর্যাপ্ত নয় (বা প্রকাশ্য নয়), এই মৌল ধারণা নিয়ে সংস্কৃত কাব্যবিচারের আরম্ভ। এই কাজে যাঁরা হাত দেন তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন কবিতা কী-কী উপায়ে 'যথেষ্ট' হ'য়ে ওঠে; অর্থাৎ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো প্রকরণের বিশ্লেষণ। অলংকারের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ করেছেন তাঁরা; বহু তর্ক করেছেন, যা আমাদের কানে অনেক সময় ব্যাকরণ বা আইনঘটিত বিতর্কের মতো শোনায়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি যা-কিছু উপায় কবিরা ব্যবহার করেন, আমরা সেগুলোকে অলংকার ব'লে ভাবি না, কিংবা এ-কথাও ভাবি না যে তাদের অভাব মানেই কবিতার মৃত্যু। আমরা জেনেছি, এই তথাকথিত অলংকারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রেও মহৎ কবিতা সম্ভব হ'তে পারে, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা 'অলংকার'মাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা ব'লে ধারণা করি; তাতে, আদর্শ-অনুসারে, এমন-কিছুই থাকবে না যা তার হ'য়ে-ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিলো না, শুধু শোভা-বৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে। শোভিত বা শোভমান হওয়া কবিতার কাজ, এ-কথা স্বীকার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতের গরীয়ান ভাস্কর্য-শালায় মিথুনমূর্তি অনেক আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নগ্নমূর্তি—জৈন তীর্থংকরের বিগ্রহ ছাড়া—একটিও দেখা যায় না। নগ্ন ব'লে যাদের মনে হয় তাদের নিম্নাঙ্গে থাকে বসনের আভাস, আর থাকে—স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে—বহু প্রথাসিদ্ধ, মর্যাদাবান অলংকার। বলা বাহুল্য, এর কারণ দেহ বিষয়ে কোনো কুণ্ঠা নয়—ভারতীয় চিত্ত বিষয়ে আর যে-কথাই বলা যাক, তাকে কেউ কখনো শুচিবায়ুগ্রস্ত বলবে না—এর পিছনেও এই ধারণা কাজ করছে যে ভূষণহীন সৌন্দর্য অসম্ভব। কিন্তু খাজুরাহোর অপ্সরা বা অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তুলনীয় যে-সব মূর্তি বা ছবি য়োরোপীয় মহাদেশে রচিত হয়েছে তারা সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ। গ্রীক শিল্প চেয়েছে বিশুদ্ধ দেহকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে, কিন্তু পরবর্তীরা সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতি আর আঁকেননি, সুন্দরকেই মূর্ত ক'রে তুলেছেন। বতিচেলির ভেনাসকে কোনো সুন্দরী নারী আর বলা যাবে না, কেননা ছবিটা নিজেই সুন্দর হ'য়ে উঠলো। এই শুদ্ধ নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য তার স্বারাজ্য লাভ করলে, উচ্চারিত হ'লো শিল্পকলার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

সকলেই জানেন, এই ছবির জন্মক্ষণেই য়োরোপীয় চিত্তের নবজন্ম ঘটে যার প্রভাব, আজ পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ভারতের নিজভূমিতে কোনো রেনেসাঁস ঘটেনি, কিন্তু ঘটলে যা হ'তে পারতো আমাদের ধ্যান-ধারণা আজকাল বহুলাংশে তা-ই; হয়তো সেটাই মূল কারণ, যেজন্যে সংস্কৃত কাব্যাদর্শের সম্মুখীন হ'লে আমরা অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করি। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথাটা পরিষ্কার হ'তে পারে। সংস্কৃত 'শিল্প' বা 'কলা', আর য়োরোপীয় 'আর্ট'—এই শব্দ দুটির যাত্রাস্থল একই: দুয়েরই আদি অর্থ 'ক্রাফ্‌ট', কারিগরি, যে-কোনো প্রকার হাতের কাজে দক্ষতা। 'কলা'র সংখ্যা যে-চৌষট্টি হ'তে পারে এ-কথা শুনেই আমরা বুঝি এর অর্থ কত ব্যাপক এবং আমাদের পক্ষে অবান্তর। ঐ তালিকা যাঁরা রচনা করেন তাঁদের কাছে ভাস্কর্য আর মাল্যরচনায় প্রভেদ ছিলো ব্যবহারগত, কিংবা হয়তো শ্রমের পরিমাণে—জাতের কোনো তফাৎ ছিলো না। যে-মহাশিল্পীরা কোনারক বা এলুরার মন্দির গড়েছিলেন তাঁরা, আমাদের অর্থে, নিজেদের শিল্পী ব'লে ভাবতেই পারতেন না। তেমনি মধ্যযুগের য়োরোপেও

চিত্রকরের সচেতন লক্ষ্য ছিলো—কোনো 'শিল্পকর্মে'র সৃষ্টি নয়, মন্দিরের প্রয়োজনমতো যীশুজীবনীর দৃশ্যরচনা, যাতে ভক্তের আত্মনিবেদনের পাত্র চোখের সামনে মূর্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু রেনেসাঁসের পরে 'আর্ট'-এর অর্থ একই সঙ্গে সংকুচিত ও বহুগুণে বর্ধিত হ'লো—এবং তা-ই থেকে অন্য সব পরিবর্তন ঘটেছে। আর্ট : তা বিচ্ছিন্ন হ'লো মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে, দেবার্চনার সেবাদাসী আর থাকলো না, সিংহাসনের চামরধারিণীও নয়, সগর্বে বলতে পারলে, 'আমি কোনো কাজে লাগি না। আমি আছি।' আর্ট : তার মানে মুক্তি, শুদ্ধতা, এক ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা, যার সামনে এসে জগৎবাসীরা বলতে বাধ্য হয়—'তোমার কাছে আর-কিছু চাই না, তুমি যে আছো, হ'তে পেরেছো, তারই জন্যে তুমি মূল্যবান।'

আধুনিক য়োরোপীয় চিত্তে কৃত্রিমের দিকে উন্মুখতা দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু তার অর্থ একেবারেই আলাদা। বোদলেয়ার-এর একটি কবিতা আছে, যার নাম 'অলংকার,' বিষয় এক বিবসনা ও সালংকারা নারী। এই কবিতা পড়ার পরে সংস্কৃত কবিতার অলংকার বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু দুই ধারণার মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের কল্পনা থেকে নিজেকে সাবধানে বিরত করেছি। য়োরোপের যে-কবিরা, সদ্য-আগত যন্ত্রযুগে, সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদবিষয়ে প্রথম সুতীব্রভাবে সচেতন হন, তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষ বোদলেয়ার; তাঁর কবিতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলো আর্টের আধুনিক ধারণা, রূপায়িত হ'লো প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সেই দ্বন্দ্ব, শিলার যার তত্ত্বের দিক প্রকাশ করেছিলেন। আর তাই বোদলেয়ার-এর কবিতা কৃত্রিমের বন্দনায় মুখর: ভূষণের ধাতু ও রত্নদাম, বসনের রেশম ও সাটিন, সুরা, সুগন্ধ, আর স্বপ্নে-দেখা সেই প্যারিস, যেখানে সব উদ্ভিদ লুপ্ত হয়েছে, কোথাও আর তরুপল্লব নেই, চারদিকে শুধু ধাতু, পাথর ও লেলিহান রত্নমণির কারুকার্য, জল পর্যন্ত তরলিত সোনা, আর কালোর মধ্যেও বহু বর্ণ বিচ্ছুরিত—এই সব চিত্রকল্পের সাহায্যে সবলে প্রত্যাখ্যাত হ'লো প্রকৃতি, ঘোষিত হ'লো প্রতিভার পীড়া, নিঃসঙ্গতা ও মহিমা। তাঁর শৌখিনতা—dandyism—তাও এমন এক জগতের আলেখ্য, যা সম্পূর্ণরূপে রচিত, স্ব-তন্ত্র ও অস্বাভাবিক : নারী সেখানে ঘৃণ্য কেননা মূর্তিমতী প্রকৃতির নামই নারী, আর ঘৃণ্য সমাজসংস্কারক, যেহেতু তিনি ঘনিষ্ঠভাবে

'জীবনে'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই 'জীবনে' (বা সমাজে) কবির আর স্থান নেই—একা সে, উদ্বাস্তু, দেশ, জাতি ও স্থিতিহীন—এখন সে সার্থক হ'তে পারে শুধু নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'য়ে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিভার শক্তিকে দাঁড় করিয়ে। তাই বোদলেয়ার বেশ্যা, জুয়াড়ি, ভিখিরি প্রভৃতি অন্ত্যজদের মধ্যে কবির প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন, আর সমকালীন ফরাশি চিত্রকলায় সার্কাসের শস্তা নটনটী যে প্রিয় হ'য়ে উঠলো, তাও এইজন্যে। সামাজিক জীবনে, শিল্পী কি তাদেরই ভাগ্যের অংশিদার নয়?

এর সঙ্গে সংস্কৃত কবিদের অবস্থার অবশ্য কিছুই মিল নেই। তাঁদের পরিবেশের মধ্যে গৃহীত ছিলেন তাঁরা—শুধু গৃহীত নন, সম্মানিত। অনেকেই রাজার অনুগ্রহ পেয়েছেন, আর প্রচুর অবসর, সাংসারিক নিশ্চিতি। দশম শতকের অলংকারিক রাজশেখর কবির দৈনন্দিন জীবনের যে-বিবরণ রেখে গেছেন, তার সঙ্গে আরো অনেক পুরোনো 'কামসূত্রে' বর্ণিত নাগর বা নাগরিকের জীবন অনেক বিষয়ে মিলে যায়।

'কবি ছ-ঘণ্টা ঘুমোন, ভোরবেলা ওঠেন, প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিকাদি সেরে তিন ঘণ্টা পড়েন, আরো তিন ঘণ্টা লেখেন বা পূর্বদিনের রচনা সংশোধন করেন; অপরাহ্ণে সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগে স্বীয় রচনার সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারপর আবার বসেন পরিশোধন করতে।' সারত তাঁর দিনগুলি রচনা, অধ্যয়ন ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ হ'য়ে থাকে এবং তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে থাকেন 'রাজকন্যা, বারাঙ্গনা, এবং রাজপুরুষ ও নাগরদের বনিতাগণ।' শেষোক্ত ব্যক্তিরা—রাজশেখর জানাতে ভোলেননি—অনেক সময় বিদুষী হতেন, কবিতাও লিখতেন। আর কবিদের সম্মেলনের আয়োজন করা রাজকৃত্যের অন্যতম ছিলো। আমরা অনুমান করতে পারি, এই সমাজস্বীকৃত মসৃণ জীবন বহু শতক ধ'রে একই 'মন্দাক্রান্তা তালে' প্রবাহিত হয়েছে, কেননা ভারতে যদিও যুদ্ধ ও রাজ্য-বদল বহুবার ঘটেছে, সেই সব আন্দোলন সুদৃঢ় ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের গঠনকে স্পর্শ করতে পারেনি; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যুগ-যুগ ধ'রে হুবহু এক থেকে গেছে। বাৎস্যায়নের সঙ্গে রাজশেখরের কালের ব্যবধান অতি দীর্ঘ, অথচ দু-জনে একই রকম আরাম ও নিশ্চিতির কথা লিখেছেন।

মনিয়র-উইলিয়মস 'কবি' শব্দের যে-সব অর্থ দিয়েছেন তার মধ্যে 'প্রাজ্ঞ' থেকে 'চতুর' ও 'ঋষি' থেকে 'মনীষী' পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সব স্তরই পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, এর ভাগ্য 'শিল্পী' শব্দের উল্টো। 'শিল্পে'র আরম্ভ কারুকর্মের নিম্নভূমিতে; আমরা আজকের দিনে তাকে 'art'-এর পদবীতে উন্নীত করেছি, যদিও এখনো সে 'craft'-এর সংসর্গ ছাড়তে পারেনি, এমনকি আর্টের জাতশত্রু 'industry'-র মহলেও সে মাঝে-মাঝে মুজরো খাটে। আর 'কবি'র যাত্রাস্থল ঋষিপদ, সেই উচ্চাসন থেকে তার পতন হ'লো যখন তার অর্থ দাঁড়ালো 'কবিতার লেখক'। কিংবা এটাকে পতন না-ব'লে বিবর্তনও বলা যায়; কবির আদিপিতা যে পুরোহিত এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য; সংস্কৃতে যাজ্ঞিক পুরোহিতের নামান্তর ছিলো 'কব্য,' এতে সম্বন্ধটি আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

অন্ততপক্ষে কবিতা লেখা 'হাতের কাজ' নয়; এবং এই কর্মের উপায় যখন সংস্কৃত ভাষা, তখন প্রকৃষ্ট হ'তে হ'লে শুধু সাধারণ অর্থে শিক্ষিত হ'লে চলে না, রীতিমতো পণ্ডিত হ'তে হয়, এবং সে-যুগে পণ্ডিত হবার মতো অবস্থা শুধু তাঁদেরই ছিলো যাঁদের জাতিগত পেশা পৌরোহিত্য। যে-সব ব্রাহ্মণ চিত্র বা মূর্তিরচনার কাজ নিতেন তাঁদের যাজনকর্মে আর অধিকার থাকতো না, বিশেষজ্ঞরা এই রকম ব'লে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যাঁরা কবিতা লিখেছেন—আর, অন্তত খ্যাতনামাদের মধ্যে অব্রাহ্মণ কেউ আছেন ব'লে ভাবা যায় না—তাঁদের কাউকে কখনো ব্রাত্য হ'তে হয়েছে এমন কথা কোনো ঐতিহাসিক বলেননি। বরং, কাব্য ও কাব্যের আলোচনা থেকে, এর উল্টোটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে পারি। স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের উন্নত, দর্পিত ও ঈর্ষা-পরায়ণ ব্রাহ্মণসমাজ যুগ-যুগ ধরে বংশপরম্পরায় যে-সংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রচার করেছেন, সংস্কৃত ভাষার মুখ্য কবিরা তারই অন্তরঙ্গ ছিলেন—কাব্যের প্রকরণের দিক থেকে, বৌদ্ধ অশ্বঘোষকেও এর ব্যতিক্রম বলা যায় না। শুধু যে তাঁরা সমাজ থেকে চ্যুত হননি তা নয়, স্বপ্রতিষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে কবিতা যদি কৃত্রিমতার পথ নেয়, তাহ'লে তার বিকাশ হ'তে পারে শুধু এক ধনবান, সুখী ও ভঙ্গিপ্রধান শোভনশিল্পে—যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে ডেকরেটিভ।

'ক-বোতল টানিলে মদ রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?' অধ্যাপক বিনয়কুমার

সরকারের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউ জানি না, তবে প্রশ্নটিকে সংগত ব'লে মানতে পারি। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ সরিয়ে দিলে যা বাকি থাকে, সেই অভিজাত, বিধিবদ্ধ ও পরিশীলিত কাব্যসাহিত্যে কোথায় সেই প্রেরণার স্থান, যাকে মানুষ চিরকাল প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ ব'লে মেনেছে, একমাত্র যার প্রভাবে ভাষা হ'য়ে ওঠে দৈববাণী, সার্থক হয় বিদ্যা, প্রযত্ন, পরিশ্রম? এর উত্তর প্রাচীনেরা অমোঘভাবে দিয়ে গেছেন—শাস্ত্র লিখে নয়, প্রবচন রচনা ক'রে। হোমর যেমন অন্ধ, তেমনি বাল্মীকিও দস্যু ছিলেন; এমনকি কালিদাস—যাঁর ছত্রে-ছত্রে আত্মচেতনা ও উত্তরাধিকারবোধ পরিকীর্ণ—সেই বিদগ্ধ উত্তরসূরীকেও বরপ্রাপ্ত জড়বুদ্ধি ব'লে রটনা করা হ'লো। কবিপ্রতিভার গভীরতম অন্তর্দেশ এই প্রবাদসমূহের লক্ষ্য। কবি—তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী মানুষ হ'তে পারেন না—তাঁকে হ'তে হবে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অভাবগ্রস্ত, যে-অভাবের ক্ষতিপূরণ করে 'দৈব' অথবা অবচেতনের ক্ষমতা। এই কথাটা আধুনিক মানুষের, আর এই কথাই চিরকালীন।

তবু ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এমন অধ্যায় দেখা যায়, যখন, কোনো আলোক-প্রাপ্ত রাজার বা কোনো নিশ্চল সমাজব্যবস্থার প্রভাবে, কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সামঞ্জস্য ঘটে, তিনি তাঁর শাশ্বত অশান্তি ভুলে যান, রাজসভার পার্শ্ববর্তী একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হ'য়ে রচনাদ্বারা সেই গোষ্ঠীরই প্রীতি-সাধন করেন। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলে, সন্দেহ নেই তার প্রধান অংশ এমনি একটি অধ্যায়ের মধ্যে উদ্গত হয়েছিলো। তাই তার অলংকারবিলাসে কোনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ নেই, তার সুবিস্তৃত প্রসাধনশিল্প ব্যবহৃত হয় শুধু একটি ভঙ্গির সেবায়—যে-ভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ ক'রে তোলাই সমগ্র 'অলংকার'-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ফলত, যাকে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ বলা যায় সংস্কৃত কবিতায় তার সম্ভাবনা ছিলো ন্যূনতম। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কৃত্রিমতার সঙ্গে বোদলেয়ার-এর ব্যবধান বিরাট: দুয়ের মধ্যে যুগান্তর ছড়িয়ে আছে। বোদলেয়ার কৃত্রিমের বন্দনা করেছিলেন স্বাভাবিক ভাষায়, অর্থাৎ তাঁর যেটা স্টাইল সেটা তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি, কোনো সামাজিক ও সাধারণ ভঙ্গি নয়; যে-আবেগে তাঁর কবিতা সংরক্ত সেটাও সম্প্রদায়গত নয়; তাঁরই নিজস্ব। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত কবিরা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির স্তব করেছেন; স্বাভাবিককেই

ভালো ব'লে জানতেন তাঁরা, অথচ ভূষণহীন স্বাভাবিকে তাঁদের সভাসদ-রুচির তৃপ্তি ছিলো না। নববধূ সালংকারা না-হ'লে 'যথেষ্ট' হয় না, এ-কথাটা বিবাহসভায় মানা যেতে পারে, কিন্তু দম্পতীর মিলনের কালে সেই ভূষণদাম যে আবর্জনামাত্র, তা মানুষ চিরকাল ধ'রে জেনেছে—যদিও ভারতসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের আগে কেউ মুখ ফুটে বলেননি। একই রকম নিবিড় ও সম্পূর্ণ মিলন কবিতার সঙ্গে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু সংস্কৃত কবিতায় অলংকারের ব্যবধান ঘোচে না।

কবিতা কোন গুণে ভালো হয়? বা কবিতা হয়? 'নীরস তরুবর সম্মুখে ভাতি'—এটা, ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছে, 'রসাত্মক বাক্যে'র উদাহরণ। কেউ বলেনি যে এটা রাংতার মতোই চকচকে ও তুচ্ছ; শুকনো গাছকে 'তরুবর' বলা যায় না, তার প্রসঙ্গে কোনো 'আভা'র উল্লেখ হাস্যকর। তথ্যের সঙ্গে ভাষার এখানে শোচনীয় বিসংগতি ঘটেছে। কিন্তু 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'—এর শব্দযোজনায় ও অনুপ্রাসে তথ্যটির যথাযথ ছবি পাওয়া যায়: 'কাষ্ঠ' শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে গাছটা কতদূর মৃত, নেহাৎ গন্ডভাবাপন্ন 'তিষ্ঠতি' ক্রিয়াপদেও রুক্ষতা প্রতিফলিত। এটা কবিতা কিনা জানি না, কিন্তু এর সফলতার প্রমাণ এই যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' আমাদের জীবিত ভাষার অংশ হ'য়ে গেছে। রুচি দূষিত না-হ'লে এই বাক্য নিন্দনীয়ের দৃষ্টান্ত হ'তে পারতো না।

বাংলাদেশের ঘুম-পাড়ানি ছড়ার একাধিক পাঠান্তর প্রচলিত আছে। যিনি লিখেছিলেন—

ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি যেয়ো,
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল পুরে খেয়ো—

তাঁর ছিলো র‍্যাশনাল বা ন্যায়সম্মত মন, নিদ্রাদেবীকে তিনি ধারণা করেছেন একজন মাননীয়া প্রতিবেশিনী-রূপে, যাঁকে পান খাইয়ে খুশি করলে শিশুর নিদ্রারূপ বরলাভ সম্ভব হবে। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধস্থাপনেই বোঝা যায় যে এর লেখক সুগৃহিণী ও সুমাতা—কিন্তু কবি নন, বড়ো জোর পদ্যকার। কিন্তু—

ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো,
খাট নেই, পালঙ্ক নেই, চোখ পেতে বোসো—

এই পদ্যে সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় নেই, কিন্তু কবিত্ব আছে। 'চোখ পেতে বোসো'—মাসিপিসি-নাম্নী অতিথির কাছে এ-রকম একটা অসম্ভব প্রস্তাব তিনি করতে পারতেন না যদি-না তাঁর কল্পনার সাহস থাকতো। এই সেই যুক্তিহীনতা, যার সংক্রামে ভাষা হ'য়ে ওঠে ভাবনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, কবিতা মুক্তি পায়। কিন্তু কোনো সংস্কৃত কবি কোনো মাতৃস্বসাকে শিশুর চোখের মতো অপারিসর ও বিপজ্জনক স্থানে বসতে বলতেন কিনা, আমি সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দিহান।

আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করেন যে ভাষা দুই ভাবে কাজ করে: একদিকে সে খবর দেয়, অন্যদিকে সে জাগিয়ে তোলে। তথ্য বা জ্ঞানের জগতে আমরা চাই স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাষা, যার আয়তন তার সংবাদের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। কিন্তু কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট 'অর্থ'কে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙে যায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি অনবরত প্রহত হ'তে থাকে। অলংকার-শাস্ত্রে—বিশেষত 'ধ্বনি'বাদে—তুলনীয় পরিভাষার অভাব নেই; কিন্তু যাঁরা বলেন, কবিতায় ভাষা কী-ভাবে কাজ করে, সে-বিষয়ে আধুনিক ধারণার পূর্বাভাস সেখানে পাওয়া যায়, তাঁদের কথায় আমার মন কোনোরকমেই সায় দেয় না। তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈয়ায়িক অভ্যাস কাটাতে পারেননি। পারেননি, তার কারণ তাঁদের সামনে উপযোগী উদাহরণ ছিলো না, রোমান্টিক মানস বৈষ্ণব কবিদের আগে জন্ম দেয়নি, সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এক আচারনিষ্ঠ, অনুষ্ঠানধর্মী, জাতিভেদবিভক্ত কঠিন কৌলীন্যের দুর্গে বাস করেছে। আমরা তাই অবাক হ'তে পারি না, যখন বামন বলেন—'কাব্যং গ্রাহ্যং অলংকারাৎ' বা 'সৌন্দর্যং অলংকারম্'—আমরা শুধু মর্মাহত হ'তে পারি।

ভামহ, যিনি ঐতিহাসিকের পরিচিত প্রথম আলংকারিক, তিনি স্বভাবোক্তিকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন এই ব'লে যে তা শুধু খবর দিতে পারে, আর কিছু পারে না। তাঁর মতে বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তি নিয়েই কবিতার বাণিজ্য। ব্যঙ্গ্যার্থ বিষয়েও বলা হয়েছে যে হয় সেটি কবিতাস্ব

একমাত্র অর্থ হবে, নয়তো বাচ্যার্থের চেয়ে তার উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। আবার, ব্যঙ্গ্যার্থ থেকেও 'ধ্বনি' বা রসের ব্যঞ্জনাকে আলাদা করা হ'লো। এই শেষোক্ত মতই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণযোগ্য, কিন্তু 'ধ্বনি'র বিখ্যাত উদাহরণ—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'—এতে আমরা দেখতে পাই, মহৎ কবিতার নমুনা নয়, এক চারু ও সুকুমার বক্রোক্তি, যা তার ছন্দোবদ্ধতার গুণে উদ্ধৃতিযোগ্য হয়েছে। তেমনি, আমরা যখন ভামহ বা বামনের বিরোধী মত শুনতে পাই যে অলংকার থাকলেই কবিতা হয় না আর না-থাকলেও কবিতা হ'তে পারে—তখন এই তত্ত্বে আমরা উৎসাহ বোধ না-ক'রে পারি না, কিন্তু দৃষ্টান্ত দেখলেই নিরাশ হ'তে হয়। 'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে...' 'কুমারসম্ভবে'র এই বিখ্যাত শ্লোকটিকে আমরা নিশ্চয়ই হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম বলবো, কিন্তু তার বেশি বলবো না; এটি স্বভাবোক্তি হ'তে পারে, কিন্তু এর অভিপ্রায় বর্ণনামাত্র, যার আড়ালে অন্য কিছু নেই, আর যার চিহ্নসমূহ বর্ণিত বিষয়েরই তথ্য থেকে সংগৃহীত। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র একটি গান—

শুনি ক্ষণে-ক্ষণে মনে-মনে
অতল জলের আহ্বান,
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে
চঞ্চল প্রাণ—

এরও বিষয় বসন্ত, বা যৌবন, বা কামোন্মাদনা, কিন্তু এতে 'বর্ণনা' নেই, বসন্ত, যৌবন বা তার সম্পৃক্ত কোনো তথ্য উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু যৌবনের বেগ অনেক বেশি তীব্রতার সঙ্গে সঞ্চালিত হয়েছে। এখানে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা যে-ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির ব্যাখ্যাতার তা ধারণার মধ্যে ছিলো না।

আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু তাঁদের প্রশংসিত শ্লোকাবলীতে, আমরা দেখতে পাই, হয় কোনো অলংকার আছে, নয় ব্যঙ্গ্যার্থ, নয় তো কোনো বর্ণনার বিস্তার। এদিকে আধুনিক কালে এমন অনেক পংক্তি বা কবিতা আমরা জেনেছি, যা নিতান্তই নিরলংকার, সরল একটি স্বভাবোক্তি মাত্র, এবং যেখানে বাচ্যার্থই অনন্য, পরম ও মহাশক্তিমান। এর অনেক উদাহরণ মনে পড়ছে, কিন্তু আমি আপাতত ইচ্ছে ক'রেই বৈদেশিক উদ্ধৃতি থেকে বিরত হলাম।

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে।

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে!

তোরা কেউ পারবি নে রে পারবি নে ফুল ফোটাতে।

উদ্ধৃত পংক্তিগুলির প্রত্যেকটিতে ব্যঙ্গ্যার্থ বা অলংকারের বদলে যা পাওয়া যাচ্ছে তা একটি দূরস্পর্শী ও বিকীর্যমান প্রভার। 'ফুল' থেকে অন্য কোনো আভিধানিক অর্থ কিছুতেই বের করা যাবে না, তার সরল অর্থ বাতিল হচ্ছে না কোনোখানেই, অথচ একটি থেকে অন্যটিতে পৌঁছনোমাত্র আমরা অনুভব করি যে শব্দটির ইঙ্গিত বদলে-বদলে যাচ্ছে: কখনো তাতে মরত্বের ভাব পাচ্ছি, কখনো ব্যর্থতার, কখনো বা সৌন্দর্যের। এই ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ, যাকে বিভিন্ন পাঠক (বা একই পাঠক বিভিন্ন সময়ে) ভিন্ন-ভিন্ন ভাবনায় রঞ্জিত ক'রে দেখবেন, কবিতার কাছে এটাই আমাদের প্রধান প্রার্থনা। সম্ভবত অলংকারবাদীরা এদের মধ্যেও কোনো-না-কোনো 'অলংকার' আবিষ্কার করতেন (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংজ্ঞার্থরচনার ক্ষমতা তাঁদের অসীম ছিলো), কিন্তু যে-তত্ত্ব অলংকারহীন কবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' বিষয়ে নিঃসাড় এবং নীরব থাকতে বাধ্য। আর সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে, এই কৃশ, নগ্ন ও একান্ত বাণীর তুলনা কোথায়?

তত্ত্বের পরিচয় তার প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথের 'ফুল'—বা 'পথ' বা 'প্রদীপ'কে—আমরা বলতে পারি চিত্রকল্প (বা হয়তো প্রতীক), এবং এই দুই আধুনিক পরিভাষার সঙ্গে কোনো-কোনো অলংকার-সূত্রের সাদৃশ্য অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবহারগত পরীক্ষা করলেই নির্ভুলভাবে প্রভেদ ধরা পড়ে। 'চিত্রকল্প' ও 'প্রতীকে'র ব্যাখ্যা যা-ই হোক না, কার্যত তাদের এক দিকে থাকে চিত্ররচনা, আর অন্য দিকে এক গভীর রহস্য, যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি—হয়তো শূন্যতা, হয়তো শামুক, মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কখনো যার স্তরে-স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার ক'রে আনি। কিন্তু রহস্য—বা যে-কোনো প্রকার অস্পষ্টতা—সংস্কৃত কবিতার ধর্মবিরোধী; তার 'লক্ষণা' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থে'ও নিশ্চয়তা চাই। এক শ্লোকের একাধিক অর্থ আদৃত হ'তো, কিন্তু এই গুণের উদাহরণস্বরূপ অনেক সময় যা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা শুধু কথা নিয়ে খেলা, যমক বা শ্লেষের চাতুর্য।

প্রসন্না কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষবিচক্ষণাঃ। ভবন্তি কস্যচিৎ পুণ্যৈর্মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়া॥

মুখে বাক্ ও গৃহে স্ত্রী কোন শর্তে পুণ্যমণ্ডিত হয়, একই শ্লোকের মধ্যে তা বলা হচ্ছে। 'প্রসন্ন' : 'যার অর্থ নির্মল' অথবা 'যার মেজাজ ভালো' ; 'কান্তিহারিণী': 'মধুর রসমণ্ডিত' বা 'যার কণ্ঠহার মনোহর' ; 'নানাশ্লেষবিচক্ষণা' : নানা শ্লেষ (pun) বা আশ্লেষে (আলিঙ্গন) নিপুণ। প্রত্যেকটি বিশেষণে দুটি ক'রে অর্থ পোরা আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি বের করামাত্র সমস্তটাই ফুরিয়ে গেলো—তার বেশি আর-কিছু নেই।

আমি জানি, অনামা লেখকের এই রচনা সংস্কৃত কবিতার প্রতিভূ নয় ; যদি ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতার নাম দাবি করতে পারে তাহ'লেও এটি জাতে ছোটো থেকে যাবে, এবং অলংকারিকদের মধ্যেও অন্তত ধ্বনিবাদীরা এর নিকৃষ্টতা স্বীকার করতেন। যদি এটি সংস্কৃত সাহিত্যে আকস্মিক হ'তো তাহ'লে এটি উল্লেখ্য হ'তো না। কিন্তু এর সধর্মী রচনা সুভাষিতাবলীতে অপর্যাপ্ত এবং মহাকবিরাও শব্দব্যসনের মোহ থেকে মুক্ত নন। এর বীজ লক্ষ্য করা যায় এমনকি বাল্মীকিতেই, যিনি যথার্থ শিলারীয় অর্থে 'নাঈভ,' প্রকৃতির দুলাল, যাঁর কাব্যের সহজ শ্রী আধুনিক কবির প্রার্থিত হ'লেও অপ্রাপণীয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে শরৎবর্ণনার একটি শ্লোক :

চঞ্চচন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্ ॥

এখানেও এক ঢিলে দুই পাখি মরেছে—'চন্দ্রকর' : চাঁদের কিরণ বা হাত ; 'তারকা' : আকাশের বা চোখের তারা ; রাগবতী ; অস্তরাগবতী বা অনুরাগবতী ; অম্বর ; আকাশ বা বসন। 'সন্ধ্যা, চাঁদের আলোয় হৃষ্ট হ'য়ে তারা ফুটিয়ে তুলেছে, এখন সে নিজেই আকাশ ছেড়ে চ'লে যাক'—এই সরল অর্থের সংলগ্ন হ'য়ে আছে নায়িকারূপিনী সন্ধ্যার ছবি, চাঁদের হস্তস্পর্শে যার চোখ পুলকে উন্মীল, এবং এখন যে নিজেই বসন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই যুগ-চিত্রের রমণীয়তা আমরা মানতে বাধ্য, তবু এই সুখ ক্ষণকাল পরেই ভেঙে যায়, যখন দেখি দুয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, তাদের জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু যান্ত্রিক কৌশলে, একটি অপরটিকে কিছু দান করছে না, দুই অপরিচিতের মতো দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের পদ রচনা না-করলে বাল্মীকির কোনো ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, তার সন্ধি সমাস প্রতিশব্দ নিয়ে, এই দিকে বিরাট ফাঁদ পেতে রেখেছে।

তবু, বাল্মীকি নিজে অন্তত জানতেন না যে 'রাগবতী সন্ধ্যা'য় তিনি 'সমাসোক্তি অলংকার' ব্যবহার করছেন, আর 'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গ্যার্থে'রও তিনি নাম শোনেননি। কিন্তু একই কথা কালিদাস বিষয়ে বলা যায় কি ? তিনি যে ভামহর পূর্ববর্তী এ-বিষয়ে ইতিহাসিকেরা একমত ; কোনো লুপ্ত, প্রাচীনতর অলংকারশাস্ত্র তাঁর কালে চলিত ছিলো কিনা, সে-বিষয়ে জল্পনা ক'রে লাভ নেই। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলী আমাদের আছে, আর আছে এই সাধারণ জ্ঞান যে ব্যাকরণ যেমন ভাষার, তেমনি কবিতার অনুগামী রসতত্ত্ব। উদাহরণ জ'মে না-উঠলে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ঘটে না। এ-কথাও সত্য যে দ্বাদশ শতকের মল্লিনাথ কালিদাসের কাব্যে যত বিচিত্র অলংকার খুঁজে পেয়েছেন তার অনেকগুলোই আমাদের মনে হয় কবিতার সাধারণ ভাষা, যা তার প্রকাশের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু তবু কালিদাসের উপর জ্ঞানের বা চাতুর্যের সন্দেহপাত অনিবার্য ; তাঁর রচনা পড়ামাত্র বোঝা যায় বাল্মীকির চেয়ে—এমনকি অশ্বঘোষের চেয়ে—তিনি কত বেশি আত্মসচেতন, বিদগ্ধ, এবং বিনষ্ট। 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মল্লিনাথ যত অভিধান ও শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তার সবই কালিদাসের পরবর্তী ব'লে ধ'রে নেবার কারণ নেই ; যদি তার কিয়দংশের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘ'টে থাকে, তাহ'লে, আলংকারিকের ভাষায়, তাঁকে 'শাস্ত্রকবি' ব'লে মানতে হয়। অর্থাৎ, শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ দু-মুখো ; যেমন আলংকারিকেরা সম্ভবত তাঁরই কাব্য থেকে তাঁদের কোনো-কোনো ধারণা আহরণ করেছিলেন, তেমনি তিনিও মাঝে-মাঝে শ্লোক লিখেছিলেন কোনো নীতি- বা কামশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুসরণে।

হ'তে পারে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এখনো নিশ্চিত নয়, কিন্তু নিশ্চিত হ'লেও আমি শুধু কালক্রমের উপর নির্ভর ক'রে কিছু বলতে চাই না। রচনার মধ্যে যা পাওয়া যায়, আমার আলোচনার পক্ষে তারই সাক্ষ্য জরুরি। অলংকার বিষয়ে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন উক্তি পাশাপাশি চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, কবিতার বিষয়ে আধুনিক ধারণা কত ভিন্ন। মনস্তত্ত্বের হিশেবে, বনিতার ও কবিতার অলংকারে তফাৎ নেই ; প্রথমটির বিষয়ে আমাদের যা আদর্শ, তা-ই দ্বিতীয়টিতে প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে। এখন কালিদাস সর্বান্তঃকরণে অলংকারে বিশ্বাসী ; তাঁর কাব্যের মেয়েরা দেখতে কেমন তা তিনি কোনো-

কোনো সময়ে না-জানাতে পারেন, কিন্তু বসনভূষণের উল্লেখ করতে কখনো ভোলেন না। 'মেঘদূতে' যক্ষনারীদের তিনি যে পুষ্পাভরণে সাজিয়েছেন সেটাও তাঁর উচ্চতর বৈদগ্ধ্যেরই প্রমাণ দেয়। অলকায় সোনা ও মণিরত্নের প্রাচুর্য এত বিপুল যে তার মেয়েদের মোহিনী ক'রে দেখাতে হ'লে ফুলের গয়নাই পরানো দরকার—যে-সব ফুল, ছয় ঋতুর সংকলন ব'লে, আমরা কখনো একসঙ্গে দেখবো না।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

এই শ্লোক শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন, এবং সেই কারণেই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই এতে, নেই মূর্ত ও অমূর্তের কোনো সম্বন্ধস্থাপন, যার ফলে কবিতা শুধু অধিকৃত হবার বিষয় থাকে না আর, আবিষ্কৃত হবার দাবি জানায়।

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে,
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কণ্ঠে দুলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণবিন্দুর,
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।

এই পর্যন্ত কালিদাস লিখতে পারতেন, যোগ করতে পারতেন আরো কয়েকটি ললিত উপকরণ, কিন্তু তাঁর রচনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটতো, যা দৃশ্য ও স্পৃশ্য বস্তু নয় তার দ্বারা সখীকে সাজাবার কল্পনা কখনোই তাঁর মনে আসতো না। 'সখীরে সাজাবো সখার প্রেমে অলক্ষ্য হৃদয়ের অমূল্য হেমে'—এই সব কথা, যা না-থাকলে বাংলায় এটিকে কবিতা ব'লেই ভাবতুম না আমরা, কালিদাসে তার লেশমাত্র আভাস নেই। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী/হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্'—এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য চাটুকারিতা মাত্র, কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের স্বর আমরা

শুনতে পেলাম, যখন, আদিরসের মরচে-পড়া মুখস্থ-করা বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'ত্বমসি মম ভূষণম্'।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্—

সারা 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষা হ'য়ে উঠলো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত—আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চ'লে গেলো যুক্তিনির্ভর কার্পণ্যকে ছাড়িয়ে। 'তুমিই আমার ভূষণ'—এই একটি কথাই ব'লে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন: ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে একবার বেরোতে পারলে, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্বতা ও আবিষ্কারধর্ম; মানুষের প্রত্যাশার যা অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার যা বহির্ভূত, সেই অনির্বচনীয়কে বাঁধতে গিয়ে ভাষা সব লজ্জাভয় ত্যাগ করলে।

আমার অঙ্গের কাঁচুলি কৃষ্ণকরাঙ্গুলি, করের ভূষণ সেবা,
আর কটির অলংকার কৃষ্ণচন্দ্রহার, সে-ভূষা বুঝিবে কেবা?

'কে বুঝবে?' কালিদাস নিশ্চয়ই বুঝতেন না, তিনি এটাতে দেখতেন তাঁর চেনা কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বর্বরের যুদ্ধঘোষণা, সভ্যতার অবক্ষয়ের লক্ষণ। 'মেঘদূতে'র যক্ষ ভুলতে পারে না, আর বার-বার আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে তার বিরহিণী প্রিয়া সব ভূষণ ত্যাগ করেছে; এত বড়ো দুঃখের মধ্যেও এ-কষ্ট তার কম নয়। কিন্তু মেঘ যেন ভুল না বোঝে; যদিও বিরহদশায় তার পত্নী এখন 'অন্যরূপা', স্বভাবত সে অতিরূপবতী, 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ইত্যাদি। এই শ্লোক অঙ্গে-অঙ্গে যে-তিলোত্তমাকে রচনা করেছে, আমরা সেই প্রতিমাকে দূর থেকে মুগ্ধ হ'য়ে দেখি, কিন্তু—

সেদিন বাতাসে ছিল, তুমি জানো,
আমার মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার রূপের তুলনা—

এটি পড়ামাত্র, একই মুহূর্তে এবং বিনা চেষ্টায়, নায়িকার মায়াময় রূপ ও বক্তার বিরহবেদনা আমাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, আমরা হ'য়ে উঠি কবির অভিজ্ঞতার

অংশভাগী, তাঁর সঙ্গে একীভূত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার বদলে এখানে যা আছে তাকে বলতে পারি ভাবনা—সব বস্তু ও তথ্যের আড়ালে নিত্য যা বিরাজমান, যার সংক্রাম থেকে মানুষের মন জড় প্রকৃতিকেও মুক্তি দেয় না। কবিতা যখন এখানে পৌঁছয় কবি তখনই বলতে পারেন—না-ব'লে তখন উপায় থাকে না—'আমার এ-গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।'

৪

এক ঋদ্ধ, বিধিবদ্ধ জগৎ; পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল, প্রচলনির্ভর; ভঙ্গিপ্রধান ও বর্ণনাপ্রধান; সাবধানী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন; সদ্ব্যয়ী, সতর্ক, সৌষম্যযুক্ত, আচারনিষ্ঠ ও প্রতিমাপূজক; অমত্ত, শিষ্টভাষী, সামাজিক ও দূরবর্তী; বিস্তারধর্মী, অলংকার-মণ্ডিত, শোভমান; কল্লোলিত, প্রোজ্জ্বল ও নিস্তাপ—এমনি আমাদের মনে হ'তে পারে সংস্কৃত কবিতাকে, তার মধ্যে প্রথম যখন প্রবেশের চেষ্টা করি। কবিতার আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, যা যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরোধী, বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ফল ব'লেই বুদ্ধির অতীত, যাকে আর তৌল করা যায় না শুধু ধ্যান করা যায়—সেই গুণটি খুঁজে পাই না যেন তার মধ্যে, সব তার আক্ষরিক, ব্যাকরণিক ও নির্ভুল, বোধগম্য ও বিশ্লেষণযোগ্য। তার প্রসাধন দেখে চোখ ঝলসে যায়, কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হই আমরা, শ্রদ্ধা করি তার বিদ্যাবত্তাকে, আর সারাক্ষণ মনে-মনে বলি: 'ভালো—সবই ভালো, কিন্তু কবিতা কোথায়?' ঐ নিস্বনিত পদাবলীর মধ্যে 'কবিতা'কে আবিষ্কার করতে সময় লাগে আমাদের, বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এবং সে-আবিষ্কার সবচেয়ে কম শ্রমে যে-কবির মধ্যে সম্ভবপর হয়, তাঁরই নাম কালিদাস; যে-কাব্যে, তা 'মেঘদূত'। কালিদাস সেই কবি, যিনি প্রমাণ করেছেন হাজার বিধিবিধান মেনে নিয়েও প্রতিভা তার সত্যস্বর শোনাতে পারে; একটি পরম কৃত্রিম আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কবিতা কত ভালো হ'তে পারে, তার নিদর্শন 'মেঘদূতে'র মতো বিশ্বাস্যভাবে আর-কোনো কাব্য দিতে পারে না। আজকের দিনের সাধারণ শিক্ষিত পাঠক, ন্যূনতম সংস্কৃত ব্যাকরণ জেনে, পাণ্ডিত্যবিষয়ে অনাতঙ্কিত অবস্থায়, যে-একমাত্র সংস্কৃত কাব্য আদ্যন্ত উপভোগ করতে পারেন, সেটি 'মেঘদূত'। ব্যাকরণের চাতুরী তাতে নেই তা নয়, প্রচুর আছে (প্রথম শ্লোকের দুঃসাধ্য অন্বয়

প্রণিধানযোগ্য), কিন্তু কাব্যগুণ আরো বেশি ব'লে এই বাধায় পাঠকের উৎসাহ এলিয়ে পড়ে না। আরো সহজে পড়া যায় বাল্মীকি-রামায়ণ, তার একটি প্রধান গুণ প্রাঞ্জলতা, কিন্তু সেটি অন্য জাতের রচনা, ঐতিহাসিকেরা যাকে 'ক্লাসিকাল' কাব্য বলেন তার নমুনা নয়, সে-গ্রন্থ প'ড়ে আমাদের ঠিক ধারণা হবে না, সংস্কৃত 'কাব্য' বলতে কী বোঝাতো। আর তাছাড়া, বাল্মীকি-রামায়ণের দৈর্ঘ্য তাকে সাধারণের পক্ষে অনুপযোগী করেছে। 'মেঘদূতে'র মস্ত একটি গুণ এই যে তা আকারে ছোটো—অন্তত সংস্কৃত কাব্যের হিশেবে তা-ই—সেটি একবারে প'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, এবং—এই ব্যস্ততার যুগেও—বার-বার পাঠ করাও সম্ভব। 'রঘুবংশ', বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তির গুণে, কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু যদি তিনি 'মেঘদূত' না-লিখতেন তাহ'লে আজ পর্যন্ত সারা ভারতে তাঁর নাম মুখে-মুখে উচ্চারিত হ'তো না।

তাঁর বিষয়ে কিছুই প্রায় জানি না আমরা। আধুনিক কোনো-কোনো পণ্ডিত দেখাতে চেয়েছেন তাঁর জীবৎকাল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক, কিন্তু এ-যাবৎ আমরা যা জেনেছি তারই সপক্ষে প্রমাণ এখনো প্রচুরতর ব'লে মনে হয়। সন্দেহ করা যায় না, হিন্দু সভ্যতার কোনো উজ্জ্বলতম মুহূর্তে তিনি বেঁচে ছিলেন ও লিখেছিলেন—এবং ভারত-ইতিহাসের কোন যুগ গুপ্ত যুগের চেয়ে উজ্জ্বলতর? সেই কাল, যখন ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব ও তজ্জনিত বৈদেশিক সংস্রবের অবসান হয়নি, অথচ হিন্দুধর্মের সগৌরব পুনরুত্থান ঘটেছে, কালিদাসের ছত্রে-ছত্রে তারই বিশেষ আবহটিকে আমরা অনুভব করতে পারি। অশ্বঘোষ উপমাস্থলে হিন্দু দেবদেবীর নাম করেননি তা নয়, কিন্তু কালিদাস, অত্যন্ত বেশি উল্লেখপ্রিয় হ'য়েও, কখনোই কোনো বৌদ্ধ প্রসঙ্গকে স্থান দেননি, এর মধ্যে তাঁর সচেতন অভিপ্রায় দেখলে আমরা হয়তো ভুল করবো না। বুদ্ধপরবর্তী খৃষ্টপূর্ব কালে জন্মালে বুদ্ধকে তিনি কি এমনভাবে এড়াতে পারতেন, না এড়াতে চাইতেন? শিবভক্ত তিনি, যে-কোনো সূত্রে শিবের প্রসঙ্গে উপনীত হ'তে সচেষ্ট; আর সেখানে পৌঁছনোমাত্র তাঁর উৎসাহ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে; ছন্দোবদ্ধ স্মরণীয় বাণীতে তাঁর আদিদেবতাকে যেন নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে চান। 'মেঘদূতে' তিনি বহু দৃশ্যের বর্ণনা লিখেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সপ্রেম ও সবিস্তার বর্ণনা আছে উজ্জয়িনী ও অলকার—উভয় ক্ষেত্রেই শ্লোকের

সংখ্যা বারো—এবং কালিদাসের যে-সব শ্লোক আমরা তৃপ্তিহীনভাবে আবৃত্তি ক'রে থাকি, তার অনেকগুলো ঐ চব্বিশটির মধ্যেই পাওয়া যাবে। এই দুই স্থলেরই অধিপতি হলেন মহাদেব; অলকার উদ্যান তাঁর ললাটজ্যোৎস্নায় প্রক্ষালিত, আর উজ্জয়িনীর মন্দিরে তিনি অরণ্যের মতো বাহু তুলে নৃত্য করেন। লক্ষ্যণীয়, অলকা এক কাল্পনিক দেবনিবাস, আর উজ্জয়িনী এক সমকালীন বাস্তব নগর; অথচ দুয়ের সমৃদ্ধি প্রায় একই রকম মনে হয়, তাদের মধ্যে তথ্যগত সাদৃশ্যও ধরা পড়ে। উভয় স্থলই সুন্দরী নারীতে সমাকীর্ণ; উজ্জয়িনীতে তামসী রাত্রে তারা অভিসারে বেরোয়, আর অলকায় সূর্য উঠলে অভিসারিকাদের গতিবেগচ্যুত ভূষণাদি পথে-পথে দেখতে পাওয়া যায়। স্পষ্টত, উজ্জয়িনীর আদর্শেই কলিদাস তাঁর 'স্বর্গ'টিকে রচনা করেছিলেন। আর উজ্জয়িনীর প্রতি এই বিপুল প্রীতি তাঁর হ'তে পারতো না, যদি না, অতি অনুকূল অবস্থায়, রাজার পৃষ্ঠপোষিত হ'য়ে, তিনি কোনো সময়ে সেই নগরে বাস করতেন। উজ্জয়িনীকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য উপাধিও তিনি নিয়েছিলেন, আর তিনি যে চীন থেকে রোম পর্যন্ত ভারতের পার্থিব ও মানসবাণিজ্য বিস্তার করেন, সে-বিষয়েও ঐতিহাসিকেরা নিঃসংশয়। অতএব, যাঁরা বলেন কলিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন, অর্থাৎ খৃষ্টপরবর্তী পঞ্চম শতকের প্রথমাংশের অধিবাসী, তাঁদের কথা অবিশ্বাস করার কোনো সংগত কারণ পাওয়া যায় না। তাঁর রচনা থেকে দুটি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানতে পারি: কাশ্মীর থেকে দক্ষিণসাগর পর্যন্ত ভারতভূমিকে তিনি জানতেন—হয় নিজে ভ্রমণ ক'রে, নয় পর্যটকদের কাহিনী শুনে; তাঁর ভূগোলে ও প্রাণীতত্ত্বে ভুল নেই, এবং প্রবাদমূলক অলীকের অংশ যা আছে তা বহু পরবর্তী য়োরোপীয় মার্কো পোলোর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর—মোটের উপর, সমগ্র ভারতের একটি অখণ্ড ও বাস্তব সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এবং তাঁর কাল ছিলো ঐশ্বর্যে ও সম্ভোগে দ্যুতিময়, ইন্দ্রিয়বিলাসে ভরপুর, ছিলো বিজয়ী, শক্তিশালী, রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রমিতিসম্পন্ন। আরো: ভারত তখনো জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েনি, তৎকালীন সমগ্র সভ্য জগতের জীবন্ত ও প্রধান একটি অংশ ছিলো, আর তিনিও নিজেকে অনুভব করেছিলেন এক বৃহৎ, বিচিত্র ও চঞ্চল বিশ্বের অধিবাসী ব'লে। সেই কাল, যখন

ভারতের চিত্তের শক্তি নানা দিকে পূর্ণতেজে সক্রিয়, তার মধ্যেও অবক্ষয়ের কোনো বীজাণু প্রচ্ছন্ন ছিলো কিনা, যার পরিণাম তিনি 'রঘুবংশে'র শেষ সর্গে বর্ণনা করেছেন, এই প্রশ্ন আমি উত্থাপনমাত্র করতে পারি, উত্তর দেবার চেষ্টা আমার সাধ্যাতীত।

কালিদাসের মধ্যে ঐতিহ্যবোধ প্রবল; আধুনিক কবিরা নিজেকে যেমন নূতন ও অপূর্ব ব'লে ধারণা করেন ('না জানি কেন রে বহুদিন পরে/জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'; 'কেউ যাহা শোনে নাই, কোনো-এক বাণী/আমি ব'হে আনি), তেমনি, এই রোমান্টিক মানসের বিপরীত মেরুতে, তিনি নিজেকে জানেন এক দীর্ঘ কবিবংশের উত্তরাধিকারী ব'লে, আর তাঁর রচনার মধ্যে দেখতে পান—যবনিকার প্রথম উত্তোলন নয়—মহত্তর পূর্বাঙ্কসমূহের বিনয়বদ্ধ অনুগমন। 'রঘুবংশে'র সূচনায় এই কথাটা খুব স্পষ্ট ক'রে বলা আছে। যে-সব পূর্বসূরীদের তিনি সেখানে নমস্কার জানিয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই নামসুদ্ধ লুপ্ত হ'য়ে গেছে, আর কারো-কারো নামমাত্র কালস্রোতে ভাসমান; তাঁর উত্তমর্ণ কারা ছিলেন, এই অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিকের বেশি কিছু বলবার নেই। মনিয়র-উইলিয়মস লিখেছেন, পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতের গ্রন্থসংখ্যা বিপুলতম; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় যে লুপ্ত সাহিত্যের পরিমাণও কম নয়—নয়তো কালিদাসের পূর্বে বাল্মীকি, অশ্বঘোষ ও ভাস ছাড়া আর-কোনো প্রধান কবির নাম নেই কেন? বেদসমূহ ও কালিদাসের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দু-হাজার বছরের; এই সময়ের মধ্যে বহু কবির বহু কাব্য রচিত হয়েছিলো ব'লে অনুমান করা যায়, যে-সব কাব্য কালিদাসের বিদ্যালয়ের কাজ করেছে, এবং যে-সব কবিকে স্মরণ ক'রে তিনি রঘুবংশের বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন মাত্রই দু-তিনজন। মহাভারত বাদ দিয়ে, আমাদের জানা গ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের 'উৎস' বলা যায় বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'কে, খুব সম্ভব অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'ও তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে যে-গ্রন্থের তিনি অধমর্ণ, সেটি বাল্মীকি-রামায়ণ। বাল্মীকি থেকেই উৎসারিত হয়েছে আদিরস ও করুণরস—সমগ্র কাব্যসাহিত্যের দুটি প্রধান সূত্র; সুন্দরকাণ্ডে রাবণের অন্তঃপুরের যে-বর্ণনা আছে তার প্রভাবে সন্ন্যাসী অশ্বঘোষও বিচলিত হয়েছেন; গৌতমের

মহানিক্রমণকালে, আলুলিত সুপ্ত নারীদের বিবরণে তাঁর এমন শিল্পচাতুরী প্রকাশ পেয়েছে যে আমরা বুদ্ধির দ্বারা সেই দেহিনীদের পরিত্যাজ্য ব'লে জানলেও রক্তের মধ্যে মোহিনী ব'লেও অনুভব করি। কালিদাস এই সূত্রটিকে বিচিত্র ও বর্ণিলভাবে নানাগ্রন্থে ব্যবহার করেছেন; তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন উত্তরমেঘের অলকাচিত্র। তেমনি, বিরহব্যথার প্রথম উচ্চারণও বাল্মীকিতে; কবিতার দিক থেকে রামায়ণের একটি তীব্রতম মুহূর্ত সেটি, যখন, রাবণকর্তৃক সীতাহরণের পরে, রাম সর্বভূতে সীতার প্রতিরূপ দেখতে লাগলেন। রামের সেই আকুলতা যুগ-যুগ ধ'রে সংস্কৃত কবিতায় প্রতিধ্বনিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে; অশ্বঘোষে রাজপুত্রের বিরহকাতর পুরবাসিনীদের শোকদশায়, কালিদাসে রতি-বিলাপে, অজবিলাপে ও যক্ষের বার্তারূপী স্বগতোক্তিতে। 'মেঘদূতে'র বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে মহাকাব্যের লক্ষণ নেই—তার সর্বাঙ্গীণ পাঠযোগ্যতার একটি কারণও তা-ই, অর্থাৎ নবরসের অবতারণার চেষ্টামাত্র না-ক'রে, কবি এখানে আমাদের পূর্বোক্ত সূত্র দুটিকে বেছে নিয়েছেন। এই কাব্য আদিরস ও করুণরসের এক বহুবর্ণ সন্নিপাতরূপে আমাদের মনে প্রতিভাত হয়; যেন কামনার তপ্ত রাগ, অশ্রুর আবরণের মধ্য দিয়ে চালিত হ'য়ে, ইন্দ্রধনুর সিক্ত সাত রঙে বিচ্ছুরিত হ'লো। এবং এই সমন্বয়সাধনে বাল্মীকির আদর্শ কত কাজে লেগেছে, তার প্রমাণ স্তরে-স্তরে পাওয়া যায়।

ঋণের স্বীকৃতি আছে প্রথমতম শ্লোকটিতেই। বিরহী যক্ষ বাসা বাঁধলো রামগিরিতে, যার জলধারায় সীতা কোনো-এক কালে স্নান করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সেটা রাম-সীতার বনবাসের কাল, যখন সীতাহরণ আসন্ন বললে ভুল হয় না। এই একটিমাত্র ইঙ্গিতে কবি জানিয়ে দিলেন তাঁর কাব্যের বিষয়, পাঠককে আমন্ত্রণ জানালেন তুলনার ভাব মনে রাখতে—বিরহী রামের সঙ্গে যক্ষের, অপহৃতা সীতার সঙ্গে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার তুলনা। রাম হনুমানের মুখে সীতাকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন; যক্ষও কি সে-রকম কিছু পারে না? এই চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র—কিংবা তার আগেই—আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ দেখা দিলে। আকারে, প্রকারে ও ক্ষমতায়, এই মেঘটিকে সাগরলঙ্ঘনকারী হনুমানের অনুজ ব'লে চিনতে আমাদের দেরি হয় না। উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকেও বাল্মীকির প্রতিধ্বনি আছে;

অলকায় দেখতে পাই লঙ্কাপুরীর একাধিক লক্ষণ; যক্ষের উন্মত্ততা দেখে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের রামকে মনে পড়ে, তার পত্নীকে দেখে সুন্দরকাণ্ডের সীতাকে। পদে-পদে আমরা তুলনা করতে বাধ্য হই; আর তুলনার ফলে আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি কালিদাস কোথায় বড়ো, আর কোথায় তাঁর দুর্বলতা।

বাল্মীকির সঙ্গে বর্ষা ও বিরহের সম্বন্ধ আরো একভাবে আমরা বুঝতে পারি। 'মেঘদূতে'র বাইরে কালিদাসের উল্লেখযোগ্য বর্ষাবর্ণনা আছে—'ঋতুসংহারে' নয়, 'রঘুবংশে' (১৩।২৬-৩৩), যেখানে, পুষ্পকরথে সীতাকে নিয়ে ফেরার সময়, মাল্যবান পর্বতের কাছে এসে রামের মনে প'ড়ে গেলো তাঁর বিরহকালীন বর্ষার বেদনা। এই আটটি শ্লোকের মধ্যে 'মেঘদূতে'র বহু তথ্যকে আমরা খুঁজে পাই, উভয় অংশই স্মৃতিরাগে রঞ্জিত ও বিরহব্যথায় আর্দ্র—প্রভেদ এই যে রাম পুনর্মিলনের পরে প্রেয়সীর কাছেই সব বলছেন, আর যক্ষের উক্তির প্রেরণা পুনর্মিলনের আশা। এ-দুয়ের মধ্যে কোনটি আগেকার লেখা তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু এটা আমরা বুঝি যে দুটোই বাল্মীকি থেকে প্রবাহিত।

'মেঘদূত' প'ড়ে প্রতীতি জন্মে যে কালিদাস, রচনায় হাত দেবার আগে, মনে-মনে পুরো কাব্যটির পরিকল্পনা ক'রে নিয়েছিলেন; একেবারে সঠিকভাবে বুঝেছিলেন কী তিনি করতে যাচ্ছেন, কতখানি এই কাব্যের বিস্তার, কী-কী প্রসঙ্গ আসবে তার মধ্যে, আর সে-সব প্রসঙ্গের বিতরণের মাত্রাই বা কেমন হবে। আমরা যে-কাব্যটি পড়ছি তা আরম্ভ বা শেষ করার আগে কতবার তিনি নকশা বা খশড়া করেছিলেন, কিছু করেছিলেন কিনা, ভূরিপরিমাণ রচনা থেকে ঐ শতাধিক শ্লোক কি ছেঁকে তুলেছিলেন, বর্জন করেছিলেন কতখানি; পরিবর্তন, পরিশোধন, পুনর্লিখনের পরিশ্রমে কত তালপাতা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো—এই সবই আমাদের অজানা থাকবে চিরকাল। যে-সব পাঠান্তরের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো অতিশয় গৌণ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্টত বর্জনীয়—তারা লিপিকরপ্রমাদও হ'তে পারে, হ'তে পারে কোনো পরবর্তী কাব্যান্ধ সম্পাদকের 'সংশোধন'—তাদের সাহায্যে কালিদাসের কারখানায় উঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু কাব্যটির বিষয়ে অগভীরভাবে চিন্তা করলেও তার মিতাচারে মুগ্ধ হ'তে হয়, সংস্কৃত কাব্যের প্রধান অভিশাপ যে-বাগাড়ম্বর

তা থেকে এটি সগৌরবে মুক্ত ; একটি গর্বিত সক্ষম নৌকোর মতো নিটোল ও নিখুঁত এর গড়ন, কোথাও এতটুকু বাহুল্য বা আতিশয্য নেই ; সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি অংশ সুষমভাবে বিধৃত হ'য়ে আছে। কাব্যের সূচনামাত্রেই গতির বেগ লক্ষ্য করা যায়—নৌকো তার ঘাট থেকে যাত্রা করলে ;—প্রথম শ্লোকে যক্ষের বর্তমান (ও প্রাক্তন) অবস্থা জানিয়ে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না-ক'রে, দ্বিতীয় শ্লোকেই মেঘটিকে আবির্ভূত করা হ'লো ; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে যথাক্রমে আমরা জানতে পেলাম মেঘ দেখে কী মনে হ'লো যক্ষের, কী ভাবলে সে, কী স্থির করলে। বেদনা, চিন্তা ও সংকল্প, এই তিনটি স্তর মাত্র তিন শ্লোকে প্রকাশ ক'রে ষষ্ঠ শ্লোক থেকেই কবি যক্ষের আবেদন শুরু ক'রে দিলেন—তার সংকল্প ও কার্যের মধ্যে আর-কিছুই স্থান পেলো না ; এবং যক্ষের ভাষণ পূর্বমেঘের এই ষষ্ঠ শ্লোকে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হ'লো একেবারে উত্তরমেঘের শেষ শ্লোকে ; কবি তাঁর নিজের জবানিতে আর একবারও কথা বললেন না। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে, অলকা দেখে, যক্ষপ্রিয়াকে অবলোকন ক'রে, তাকে যক্ষের অভিজ্ঞানসমেত বার্তা শুনিয়ে, মেঘ তার কর্তব্য যখন শেষ করলে, তখন যক্ষ আর তিনটিমাত্র শ্লোকে আবার তার আবেদন জানালে (তার শিল্পগত প্রয়োজন ছিলো), একটি সংহত ও বিষয়সম্মত স্বস্তিবাচনের সঙ্গে কাব্য সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হ'লো। আমরা অবাক হ'য়ে যাই যে একটি কথা বেশি বলা হ'লো না, খুব লোভনীয় প্রসঙ্গে এসেও কবির বাণী ফেনিল হ'লো না মুহূর্তের জন্য। আমরা অবাক হ'য়ে যাই যে শ্লোকগুলি পরস্পরে সম্পৃক্ত ; অর্থাৎ, পরেরটিকে উপভোগ করতে হ'লে আগেরটিকেও জেনে নিতে হয় ; কোনো-কোনো শ্লোক বিচ্ছিন্নভাবে স্মরণীয় ও উপভোগ্য হ'লেও পুরো কাব্যটির অভিঘাত ধারাবাহিক পাঠসাপেক্ষ। কালিদাসের দীর্ঘতর কাব্যসমূহে এই ঐক্য আমরা দেখতে পাই না ; সূচনার সঙ্গে সমাপ্তির সংগতি, এবং বিভিন্ন শ্লোকের পারম্পর্যনির্ভর সম্বন্ধ—এগুলো সংস্কৃত কাব্যের সাধারণ লক্ষণ নয়। হরগৌরীর পরিণয়ের অনুষ্ঠানেই 'কুমারসম্ভবে'র সীমা টানা যায়, 'রঘুবংশে'র বিভিন্ন সর্গের ও অংশের মধ্যে সমতা নেই, সব সময় আন্তরিক সম্বন্ধও পাওয়া যায় না—নির্বাচনযোগ্য অংশের গুণেই এই দুই কাব্য আদরণীয়। কিন্তু 'মেঘদূতে'র

আবেদন তার সমগ্রতায় ; যে-সব শ্লোক স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত তাদের বাদ দিয়ে, তার প্রায় কিছুই আমরা হারাতে রাজি নই, এবং পুরো কাব্যটি থেকে দুটিমাত্র শ্লোক আমরা দেখাতে পারি যেখানে আমাদের উৎসাহ নিস্তেজ হ'য়ে আসে—তার মধ্যে একটির বিষয় কার্তিক, অন্যটির রন্তিদেব। যে-গুণে 'মেঘদূত' আমাদের আদ্যন্ত ধ'রে রাখে আমি তার নাম দিতে চাই গতি ; কাব্যে উক্ত মেঘটিকে যে-অনুকূল বায়ু ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তা আমাদের এই সুন্দর তরণীটিরও সহায়। মেঘ চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও চলেছি ; কিন্তু মেঘ মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য থামলেও কাব্যের তরী, ছন্দের ঢেউয়ে প্রতিহত হ'য়ে, হেলে-দুলে এগিয়েই চলে ; তার গতি অন্বর ও সমলয়সম্পন্ন ; প্রথম থেকে সে জানে তার গন্তব্য কোথায়, সেখানে পৌঁছবার আগে অন্য কোথাও একবারও ঠেকে যায় না, আর পৌঁছনোমাত্র, দড়িদড়ার আর্তনাদ না-তুলে, বিনম্রভাবে থেমে যায়। আমরা তার আরোহী হ'য়ে পথে-পথে আলোচনার অবকাশ পাই, কিন্তু ক্লান্তি বা অন্যমনস্কতা সম্ভব হয় না।

সংস্কৃত সমালোচকেরা 'মেঘদূত'কে খণ্ড কাব্য বলেছেন, তাতে তার আকারের পরিচয় আছে, প্রকৃতির নয়। য়োরোপীয় পরিভাষার মধ্যে কোনোটির সঙ্গেই এর সঠিক মিল নেই—এই কাব্য ড্রামাটিক নয়, ন্যারাটিভ বা লিরিকও একে বলা যাবে না। অথচ এই তিনেরই লক্ষণ এর মধ্যে বিদ্যমান ; কাহিনীর একটি সূত্র আছে, মাঝে-মাঝে (উত্তরমেঘে) লিরিকের আভাস, আর আছে একটি নাটকীয় বিন্যাস, যা কাব্যটিকে নম্য ও বন্ধুর ক'রে তুলেছে—নৌকোর গতি একই ভাবে চলছে, কিন্তু ছোটো বা বড়ো ঢেউয়ের সংঘাতজনিত প্রভেদও আমরা বুঝতে পারি। আমাদের মনে প'ড়ে যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকেও কালিদাস শ্রেষ্ঠ, তাঁর নাট্যবোধে কাব্যসমূহ জীবন্ত। একদিক থেকে বলা যায়, 'মেঘদূত' কোনো আধুনিক উপন্যাসের মতো, যাতে প্লট ব'লে কিছু নেই, কিংবা যেটুকু আছে তার পরিণাম গ্রন্থারম্ভেই ব'লে দিয়ে লেখক আমাদের ধ'রে রাখেন শুধু শিল্পিতার চাতুরীতে ; আবার অন্য দিক থেকে এর নাটকীয়তাও স্পষ্ট, কেননা এর মূলে আছে একজন বক্তা ও একজন শ্রোতা, এবং সেই মূল ব্যবস্থারই মধ্যে উত্তরমেঘে পাত্রপাত্রীতে কিছু বদল হ'লো ; কিছুক্ষণ

মেঘ বক্তা ও যক্ষপ্রিয়া শ্রোতা, আর তারপর, যবনিকা নেমে আসার পূর্বক্ষণে, যক্ষ সোজাসুজি তার পত্নীকে তার বার্তা শোনালে, সেই সঙ্গে দৃশ্য বদল হ'লো আবার অলকা থেকে রামগিরিতে। এই বন্ধুরতা আছে ব'লেই কাব্যটি কখনো ক্লান্ত করে না আমাদের। অস্বীকার করার উপায় নেই যে কালিদাস বর্ণনাপ্রধান কবি—যা এ-যুগে কেউ আমরা হ'তে চাই না ; কিন্তু নাটকীয়তার গুণে তাঁর বর্ণনা স্থাবরতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কবি যখন যক্ষপ্রিয়াকে রঙ্গমঞ্চে আনলেন সেই মুহূর্তটি ভেবে দেখা যাক। সংস্কৃত ভাষায় এমন কাব্য আছে যাতে শুধু পার্বতীর স্তনযুগলের বর্ণনায় পঞ্চাশ শ্লোক ব্যয়িত হয়েছে—ভাবতে আতঙ্ক হয় আমাদের, ও-রকম কোনো প্রচেষ্টা কালিদাসের হাত থেকেও আমরা সহ্য করতুম না। যক্ষপ্রিয়াকে উৎসর্গিত শ্লোকের সংখ্যা সতেরো, কিন্তু কবি আমাদের উত্তেজনাকে অক্ষত রেখেছেন নায়িকাকে নানা ভাবে দেখিয়ে, দিনের কাজে, রাত্রির অনিদ্রা ও নিদ্রায়, ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চে মূক অভিনয় দেখছি আমরা, মেঘের দিকে সে কেমন ক'রে তাকাবে, কেমন মন দিয়ে শুনবে তার কথা, এই শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কাব্যের গতির সঙ্গে তার সংযোগ অক্ষুণ্ণ। বর্ণনার অন্তরালে এখানে আছে নাটকীয় ক্রিয়া, যা 'কুমারসম্ভবে' পার্বতীর রূপচিত্রণে নেই, কিন্তু রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় যার তুলনা পাই।

প্রথমে মনে হ'তে পারে 'মেঘদূতে' যক্ষের বিরহ একটি অছিলামাত্র; কবির আসল উদ্দেশ্য তাঁর প্রিয় কয়েকটি ভূদৃশ্যের আর তারপর তাঁর ভূস্বর্গের চিত্ররচনা। পূর্বমেঘে যে-সব নদী, নগর ও পর্বত আমরা পর-পর দেখে যাচ্ছি তারা সকলেই সুন্দর, তবু তারাও সুন্দরতমের ভূমিকার কাজ করছে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন 'স্বর্গের সিঁড়ি'); এই পার্থিব সৌন্দর্যের শেষ প্রান্তে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে অলকা, এলদোরাদো, সব-পেয়েছির দেশ, এবং এক তিলোত্তমা নারী, কবির মানসপ্রতিমা, যাকে দেখাবার জন্য—আমরা দেখামাত্র বুঝতে পারি—কবি এতক্ষণ ধ'রে আয়োজন করছিলেন। কাব্যটির গড়ন যেন পিরামিডের মতো, তার পাদদেশে ভৌগোলিক বিবরণ, মধ্যভাগে অলকা, আর তার চূড়ায় অধিষ্ঠিত এক নারীমূর্তি। আর, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এক চিত্রশালা অতিক্রম ক'রে যাই আমরা ; ভারতীয়

চিত্রকলায় যা দেখতে পাই না সেই ল্যাণ্ডস্কেপ-ছবি সারি-সারি তৈরি আছে এখানে, যক্ষপ্রিয়ার আশিরচরণ পূর্ণ প্রতিকৃতি—বর্ণনা, শুধু বর্ণনার উপর নির্ভর ক'রে এমন স্মরণীয় কাব্য পৃথিবীতে আর লেখা হয়নি। তা-ই মনে হয় আমাদের, প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চম বার কাব্যটি যখন পাঠ করি। মনে হয়, কবির সত্যিকার উৎসাহ যক্ষের বিরহের দিকে নয়, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর দিকে।

যক্ষ তার পত্নীবিরহে সত্যিই খুব কাতর হয়েছে, এ-বিষয়ে—কবি যা-ই বলুন—নিশ্চিত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়। সে রোগা হ'য়ে গেছে, তার মাথার ঠিক নেই—এ-সবই তথ্য হিশেবে বলা হ'লো আমাদের—কিন্তু তার বাক্যে বা ব্যবহারে অপ্রকৃতিস্থতার নামগন্ধ পাই না, বরং পাই একটি বিচক্ষণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, এমনকি প্রায় হিশেবি মনের পরিচয়, যে-মন কোনো প্রয়োজনীয় ছোটো তথ্য ভোলে না, তথ্যগুলিতে গাণিতিক যাথার্থ্য দিতে চায়, এবং যা শিষ্টাচার বিষয়ে অবহিত, আর কিসে নিজের সুবিধে হবে সে-বিষয়েও সর্বদা সচেতন। প্রেমিক বলতে আমরা যা বুঝি, রেনেসাঁস-পরবর্তী য়োরোপীয় সাহিত্য আর আমাদের বৈষ্ণব ও আধুনিকতর কাব্য থেকে এ-বিষয়ে যে-ধারণা আমাদের মনে নিবিষ্ট হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে এই যক্ষের কিছুই মিল নেই ; সে পদে-পদে যুক্তি ও প্রথা মেনে চলে, কাণ্ডজ্ঞান হারায় না, লজিকে ভুল করে না, 'লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল'—এ-রকম একটা অসম্ভব কথা তার পক্ষে বলা অসম্ভব। সে যে মেঘকে বার্তাবহ করে পাঠাতে চাইলে এতে আমরা দেখতে পাই তার কবিস্বভাব, কিন্তু কালিদাসের কাছে এটাই তার অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ, তাই তিনি তখনই মন্তব্য করেন— 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।' এই জবাবদিহিটা কবির, আর সেইজন্যেই আমাদের কাছে গ্রাহ্য—আরো বেশি : এই মন্তব্যের মধ্যে যক্ষের অবস্থার কারুণ্যের স্পর্শ পাওয়া গেলো। কিন্তু, আমরা সন্দেহ করি, এই মন্তব্য যক্ষ নিজেও করতে পারতো, কেননা আসলে সে কবির উক্ত বিহ্বলতা থেকে আশাতীতভাবে মুক্ত, তার কথা শুনে তাকে আমাদের মনে হয়—প্রেমিক নয়, রাজপারিষদ, উন্মাদ নয়, সংসারধর্মী। অর্থ ও কাম, এই দুই বর্গে সে সিদ্ধপুরুষ ; মেঘের উদ্দেশে যে-আবেদন সে উচ্চারণ করছে তাতে রোমিওশোভন প্রলাপের লেশ নেই, আছে চাটুবাক্য, নীতিবাক্য, অনুনয়, প্রলোভন, বিবেচনা,

আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পথনির্দেশ। যক্ষ খুব সুচিন্তিতভাবে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হচ্ছে ; প্রথমে সে কুড়চি ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘকে সম্ভাষণ করলে, তারপর থেকে তার সম্পূর্ণ বক্তৃতাটিকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায় :

পূর্বমেঘ

১। চাটুবাক্য (শ্লোক ৬। যক্ষের ভাষণের প্রথম শ্লোক।)

২। গন্তব্যের উল্লেখ (শ্লোক ৭। কোথায় যেতে হবে, যক্ষ তা প্রথমেই জানিয়ে দিলে, তারপর ধীরে-ধীরে পথের বিবরণ দেবে।)

৩। প্রলোভন (শ্লোক ৮, ৯, ১১। মেঘকে একেবারে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে না, পথে-পথে তার লভ্য বস্তু অনেক আছে : বনিতাদের দৃষ্টি, বলাকার সেবা, রাজহংসের সঙ্গ, ইত্যাদি।)

৪। সদ্বিবেচনা (শ্লোক ১৩। শ্লোক ১২তে মেঘকে বিদায় নিতে বলা হ'লো। কিন্তু মেঘ যেন শ্রান্তির ভয় না করে, কেননা পথে-পথে তার বিশ্রাম ও জলপানের ব্যবস্থা আছে।)

৫। দিকনির্ণয় (শ্লোক ১৪। মেঘকে উত্তর দিকে যেতে হবে।)

৬। পথনির্দেশ বা ভৌগোলিক বিবরণ (শ্লোক ১৬ থেকে শেষ পর্যন্ত।)

উত্তরমেঘ

৭। অলকার বর্ণনা (শ্লোক ৬৪-৭৫)

৮। যক্ষের ভবন (শ্লোক ৭৬-৮১। তোরণ, মন্দারবৃক্ষ, সরোবর, প্রমোদশৈল, মাধবীবিতান, ময়ূরদণ্ড, শঙ্খপদ্মের চিত্র—এই সব লক্ষণ দেখে মেঘ যাতে চিনতে পারে।)

৯। যক্ষপ্রিয়া (তার স্বভাবী রূপ : শ্লোক ৮৩)

১০। যক্ষপ্রিয়া (তার বর্তমান বিরহক্লিষ্ট রূপ : শ্লোক ৮৪-৯৮)

১১। মেঘের আত্মঘোষণা (শ্লোক ১০০, ১০২-৪ : সে কে, কার দূত হ'য়ে এসেছে, তার প্রেরক কী অবস্থায় আছে, এই জরুরি খবরগুলো প্রথমেই জানানো হ'লো।)

১২। যক্ষের বার্তা (শ্লোক ১০৫-১১১)

১৩। যক্ষের অভিজ্ঞান (শ্লোক ১১২-১৩)

১৪। পুনশ্চ অনুনয় (শ্লোক ১১৪)

১৫। অন্তিম চাটুবাক্য ও নীতিকাব্য (শ্লোক ১১৫)

১৬। আশীর্বচন (শ্লোক ১১৬)

পূর্বমেঘের যে-অংশকে পথনির্দেশ নাম দিয়েছি, তার মধ্যেও প্রলোভনের মাত্রা কম নয় ; হয় মেঘ রমণীয় বস্তুসমূহ দেখবে, নয় অন্যের দ্বারা রমণীয় রূপে দৃষ্ট হবে : শুধু সুন্দরীদের কটাক্ষপাতে প্রীত হবে না সে, শুধু দেবদম্পতীর নয়ন-ভোগ্য হবে না, শিবের আরতির লগ্নে পটহের মতো ধ্বনিত হ'য়ে পুণ্যার্জন করবে। পথে-পথে অনেক সুকৃতির অবকাশ রয়েছে তার : দাবাগ্নি নেবানো, ফল পাকানো, কৃষির জন্য ভূমিকে প্রস্তুত করা, পুষ্পচায়িকাদের মুখে ছায়া ফেলা, নদীকে পূর্ণতাদান, পশুপাখির আনন্দসাধন। অর্থাৎ, তার সামনে যে-সব প্রলোভন ধরা হচ্ছে সেগুলো শুধু ভোগের নয়, সদাচারজনিত পুণ্যফলেরও বটে। ('আমার অনুনয়ে, নিজেরও লাভহেতু…' উ ১০২।) অন্য দিকেও যক্ষের বিবেচনা প্রখর : মেঘের বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে পাঁচ বার : আম্রকূট পর্বতে, নীচৈ পর্বতে, উজ্জয়িনীর ভবন-বলভীতে, কনখলের সমীপবর্তী হিমাচলে, ও কৈলাসে ; এবং তার পুষ্টিসাধন ও বিনোদের জন্য উল্লিখিত হয়েছে—কিছুটা পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও—আটটি নদী ও জলাশয় : রেবা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, চর্মন্বতী, সরস্বতী, জাহ্নবী ও মানস সরোবর। এই সুবুদ্ধি ও সাবধানতা উত্তরমেঘেও কিছু কম নেই : মেঘ কোন জায়গা থেকে প্রথম যক্ষপ্রিয়াকে দেখবে, কেমন ক'রে তাকাবে, কথা বলার আগে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, কেমন করে মানিনীর ঘুম ভাঙাবে, কী সম্ভাষণ করবে, প্রথম কথাটি কী উচ্চারণ করবে—যক্ষ এই সমস্তই স্পষ্টভাবে নির্দেশ ক'রে দিয়েছে, কোনো-একটি ধাপও টপকে পেরিয়ে যায়নি। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের আয়োজন, তেমনি যক্ষের কাছেও এই বার্তাপ্রেরণ গণিতনির্ভর ব্যবস্থাসাপেক্ষ।

এ কেমন বিরহী, আমরা মনে-মনে প্রশ্ন করি, যে তার লক্ষ্যের প্রতি তন্ময় হ'য়ে নেই, দূতকে তাড়া না-দিয়ে যে উল্টে তাকে বার-বার বিরাম নিতে বলে, বলে ঘুরে যেতে, নদীতে পাহাড়ে সুখভোগ করতে, উজ্জয়িনীতে রাত কাটাতে, কৈলাসে—অলকার অত কাছে এসে!—নানা প্রমোদে মেতে

উঠতে? আমরা জানি, এই আপত্তি তুললে 'মেঘদূত' কাব্যের অস্তিত্বের হেতুটাকেই অস্বীকার করা হয়, কিন্তু এই প্রশ্ন আজকের দিনের পাঠকের মনে জাগতে বাধ্য। আরো: এই বিরহের প্রকৃতি বিষয়েই শেষ পর্যন্ত আমাদের একটি সন্দেহ ঘোচে না। যক্ষের কাছে—এবং দুঃখের বিষয় কবির কাছেও—নারী ভোগ্য সামগ্রীমাত্র, ইন্দ্রিয়বিলাসের প্রধান উপাদান; পত্নী ও উপপত্নীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে, গীতধ্বনিত রম্যভবনে মদ্যপান ও রতিসম্ভোগ ভিন্ন অলকাবাসীর আর-কোনো কৃত্য আছে ব'লে আমরা জানতে পারি না; অতএব যক্ষ যদি কাতর হ'য়ে থাকে, তার একমাত্র কারণ, আমাদের সন্দেহ হয়, সাংবাৎসরিক অনৈচ্ছিক ইন্দ্রিয়দমন। হয়তো, যদি দৈবাৎ রামগিরিতেই একটি মনোরম সঙ্গিনী জুটে যেতো, তাহ'লেই এই নির্বাসন সহনীয় হ'তো তার কাছে। কাব্যটিতে কিছুদূর অগ্রসর হ'লেই আমরা লক্ষ্য করি যে যক্ষের আকুলতা তার নিজের জন্য নয়, তার পত্নীর জন্য; অর্থাৎ, সে নিজে কষ্টে আছে ব'লে তার দুঃখ নয়, স্ত্রী পাছে বিরহদুঃখে প্রাণত্যাগ করে, এই তার আশঙ্কা। 'তার কাছে আমার খবর নিয়ে যাও, বোলো আমি বেঁচে আছি—'এর উপরেই বার-বার জোর দিচ্ছে সে; 'আমাকে তার খবর এনে দাও,' এ-কথা, উত্তরমেঘের উপান্ত্য অংশে, একবারমাত্র উল্লিখিত আছে। নারী অবলা ব'লে তার প্রতি অধিক সমবেদনা সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই অনুভব ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই নারী যখন আপন প্রেয়সী তখন বিরহী প্রেমিকের কাছে এতখানি পরোপকারবৃত্তি একেবারেই আশা করা যায় না। এ কেমন প্রেম, যা স্বার্থপর নয়, নিজের আবেগ ছাড়া অন্য সব বিষয়েই অন্ধ ও অচেতন নয়?

আমরা যাকে প্রেম ব'লে থাকি কাম তার শিকড় তাতে সন্দেহ নেই, যে-কাম, নানা বিচিত্র রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, আমাদের দেহে-মনে অনবরত কাজ ক'রে যাচ্ছে। যাতে কামগন্ধ নেই তাকে (অন্তত মানবিক অর্থে) প্রেম ব'লে আমরা মানতে পারি না, কিন্তু এও আমাদের কাছে অগ্রাহ্য যে প্রেম বস্তুটি রিরংসারই নামান্তর। এইখানে সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে আমাদের একটি মস্ত বিরোধ দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁদের প্রণয়বিবরণ প'ড়ে আমরা যে সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পারি না, তার কারণ যৌনধর্মের অকপট উল্লেখ নয়, হার্দ্য

আবেদনের অভাব। মনে পড়ছে ছাত্রবয়সে প্রথম যখন 'শকুন্তলা' পড়েছিলাম, আমি রীতিমতো পীড়িত হয়েছিলাম নায়িকার কামজ্বরের বর্ণনা শুনে; চন্দন, পদ্মপাতা প্রভৃতি দৈহিক প্রলেপের সাহায্য সেই তাপ প্রশমনের প্রয়াসটাকে পিচ্ছিল ও অপরিচ্ছন্ন ব'লে অনুভব করেছিলাম—আমি, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে 'অশ্লীলতা'র উদীয়মান প্রতিভূ। পরবর্তী কালে এই বিকর্ষণের ভাব চেষ্টার দ্বারা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি; এখন আমি সংস্কৃত কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারি, কিন্তু তার অংশী হ'তে পারি না। এখনো আমার অবাক লাগে যে কালিদাসের মতো মহাকবি, সারা 'শকুন্তলা' নাটকটিতে, হারেমবিলাসী দুষ্মন্তের পরোক্ষেও একবার নিন্দে করলেন না, মহাভারতের তেজস্বিনী শকুন্তলাকে পরিণত করলেন প্রায় বাংলা সিনেমার নিশ্চরিত্র সতীলক্ষ্মীতে; অবাক লাগে, তৎকালীন সমাজে নারী যে-একটিমাত্র কারণে আদৃতা ছিলো, তাঁর কবিদৃষ্টি তা অতিক্রম ক'রে অন্য কোনো সংসর্গে পৌঁছতে পারেনি। গৃহিণী, সচিব, সখী, সবই ভালো—কিন্তু নারী যে শয্যাসঙ্গিনী, সে-কথাটাই সবচেয়ে জরুরি। জরুরি: তা বাস্তব ব'লে স্বীকার করা যায়, কিন্তু তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতির শর্তই এই যে উভয়পক্ষে সমান স্বাধীনতা থাকবে। গ্রীক সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থা ছিলো প্রাচীন ভারতেরই অনুরূপ; কিন্তু একটি তফাৎ এই দেখা যায় যে গ্রীক পুরাণ বহুচারিণী স্ত্রীকে কল্পনা করতে পেরেছে, গীতিকাব্যেও উদ্গতবিষাণ নায়কেরা বিরল নন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে-মেয়েরা বহুচারিণী তারা বেশ্যা—ঐ শব্দ সম্ভ্রান্ত ছিলো সেকালে, ব্যাপারটাও তা-ই—আর বেশ্যার সঙ্গে পুরাঙ্গনাদের সামাজিক মেলামেশা সম্ভব হ'লেও, কোনো কুলবধূর পক্ষে বহুগমন ছিলো কল্পনার পরপারে। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে কোনো স্বামীঘাতিনী ক্লিটেমনেস্ট্রা নেই, এমনকি কোনো পেনিলোপিও না, যাকে সতী অবস্থায় টিঁকে থাকার জন্য কৌশলের সাহায্য নিতে হয়। 'মেঘদূতে' যে-সব চিত্তহারিণী অভিসারিকাদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের সকলকেই বারবনিতা ব'লে ধ'রে নিতে হবে—বিবাহিতা স্ত্রী সতী থাকবে এটা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। এইজন্যে যক্ষের মনে মুহূর্তের জন্যও এ-চিন্তার উদয় হয় না—'সে এই এক বছর আমার প্রতি একান্তা থাকবে তো? ইতিমধ্যে অন্য কারো সঙ্গে

প্রণয় হবে না তো তার ?'—আমাদের পক্ষে এই অতি স্পষ্ট কথাটা একবারও তার মনে জাগে না, বরং সে নিশ্চিন্তে বলতে পারে যে তার অনুপস্থিতিতে তার গৃহ, 'সূর্যবিহনে পদ্মের মতো', হতশ্রী হয়েছে। তার এই আত্মতৃপ্তি দেখে কৌতুক জাগে আমাদের মনে, তার প্রতি শ্রদ্ধা ক'মে যায়। উপরন্তু, তার অবস্থার সঙ্গে তার কবিকথিত কাতরতার সংগতি আছে ব'লেও মনে হয় না আমাদের। কী হয়েছে ? কোনো মৃত্যু নয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদ নয়, প্রাচীন চীনে কবির মতো সর্প-ব্যাধি-বর্বর-পরিবৃত মফস্বলে বদলি হ'তে হয়নি, অভিদের মতো যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়নি সভ্যালোক থেকে। এমন নয় যে প্রেয়সীকে আর চোখে দেখারও সম্ভাবনা নেই, কিংবা, হেল্ডার্লিনের 'দিওতিমা'র মতো, তার প্রেয়সী পরস্ত্রীও নয়, যাকে সমাজের হাত অমোঘভাবে ছিনিয়ে নিতে পারে। যক্ষের অবস্থার মধ্যে দুঃখের তীব্রতার কোনো কারণ নেই, ব্যাপ্তিরও না। মাত্রই এক বছরের বিচ্ছেদ, তার মধ্যে আট মাস কেটেই গেছে, অবশিষ্ট চার মাসের পর পুনর্মিলনও নিশ্চিত। তার বর্তমান আশ্রম যে-রামগিরি, তা তার অনভ্যস্ত হ'লেও ছায়াস্নিগ্ধ ও বাসযোগ্য। নিঃসঙ্গতায় বা সভ্য সংসর্গের অভাবে সে কষ্ট পাচ্ছে, এমন কোনো ইঙ্গিত কবি দেননি। তার দুঃখের একমাত্র উল্লিখিত কারণ পত্নীবিরহ। এ-অবস্থায় আমরা তাকে অপৌরুষেয় ব'লেও অশ্রদ্ধা করতে পারতাম, কিন্তু যক্ষ, অন্তত 'মেয়েলিপনা'র অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছে নিজের উপর স্ত্রীকে স্থান দিয়ে, সর্ববিষয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, এবং সত্যিকার কোনো কাতরতাও পরিহার ক'রে। এ-দিক থেকে দেখলে, তার অষ্টম মাসে ব্যাকুলতারও সমর্থন পাওয়া যায়—তার স্ত্রী এতদিনও হয়তো কষ্টেসৃষ্টে টিঁকে ছিলো, কিন্তু আর সে সইতে পারবে তো ?

বর্ষা ও বিরহ—এই বিষয় দুটি ভারতীয় কাব্যে আজ পর্যন্ত প্রধান হ'য়ে আছে ; তার একটি মুখ্য কারণ, সন্দেহ নেই, 'মেঘদূতে'র আবহমান প্রতিপত্তি। উভয়ের উৎসস্থল বাল্মীকি হ'তে পারেন, কিন্তু অন্য নানা প্রসঙ্গ থেকে কালিদাস এই দুটিকে বিযুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন ব'লেই তারা উত্তরসাধকের পক্ষে বিশেষভাবে ব্যবহার্য হ'লো। জয়দেব যখন তাঁর 'গীতগোবিন্দে'র প্রথম পংক্তিটি লিখেছিলেন—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ'—তখন তাঁর মনে কি এই ইচ্ছেটি কাজ করছিলো না যে তাঁর শ্লোকটি 'মেঘদূতে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হোক ?

রাধিকা, উজ্জয়িনীর মেয়েদের মতোই, বর্ষার রাত্রে অভিসারে বেরোন ; চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, বর্ষার সঙ্গে প্রেম ও বিরহের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে গেছে। এই যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য যুগ-যুগ ধ'রে গ'ড়ে উঠলো, তার মধ্যে 'মেঘদূতে'র প্রভাব অনস্বীকার্য, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণসমূহের উল্লেখ ক'রে বলতে পারি, এই কাব্যে সত্যিকার বিরহের স্বাদ নেই, বর্ষার আবেগও এতে সঞ্চারিত হয়নি। একটিমাত্র মুহূর্তে বৈষ্ণব কবি যা পেরেছেন, শতোত্তর মন্দাক্রান্তা শ্লোক তাতে বিফল হ'লো :

এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়—

সঘন গহন রাত্রি
ঝরিছে শ্রাবণধারা,
অন্ধ বিভাবরী
সঙ্গ-পরশ-হারা—

প্রেম, বিরহ ও বর্ষায় এই ক্ষুদ্র অংশগুলি যেমন ভরপুর, এদের অন্তর্নিহিত আবেগ যেমন পাত্র ছাপিয়ে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অফুরন্তভাবে উপচে পড়ে, ঠিক সেই ধরনের প্রত্যক্ষ আঘাত বর্ণনাপ্রধান 'মেঘদূতে' আমরা কখনোই পাই না—না তার সমগ্রতায়, না কোনো অংশে। বিরহ, প্রেম, বর্ষা—এই তিনটি সূত্র স্বতন্ত্রভাবে মাঝে-মাঝে দেখা যায়, বিবিধ চিত্রাবলীতে বর্ণযোজনার কাজ করে যেন, কিন্তু তিনটি বিষয় একই মুহূর্তে একত্রিত ও একীভূত হ'য়ে অসীমের দিকে জানলা খুলে দেয় না। 'এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর'—বলামাত্র সারা আকাশ বিরহবেদনায় ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে, আদিগন্ত বিরহের উপর বৃষ্টির ধারা ব'য়ে যায়। এই বেদনা শুধু কোনো নির্দিষ্ট দয়িতের জন্য নয়—'যে এলে আমার মন্দির পূর্ণ হবে আমি তাকে জানি না', এর মধ্যে এ-কথাও বলা আছে।

'মেঘদূত' যেখানে আমাদের সবচেয়ে নিরাশ করে, সেটি তার বিরহপ্রসঙ্গ। বাল্মীকিতে সীতাহরণের পর রাম যখন ফুল, জন্তু, নদী, প্রস্রবণ, বায়ু ও

আদিত্যের কাছে সীতার সন্ধান ক'রে-ক'রে নানা দিকে ধাবিত হচ্ছেন, তখন রোষ ও পরিতাপের মিশ্রণে তাঁর দুঃখ যেন আগুনের মতো দীপ্ত হ'য়ে উঠছে— কাউকে ব'লে দিতে হয় না সে-দুঃখ কত খাঁটি, কত গভীর, কত দুঃসহ। পক্ষান্তরে উত্তরমেঘের শেষাংশে (শ্লোক ১০০-১১৩) যক্ষ যে-কথাগুলি বলছে, তার মধ্য দিয়ে তাকে একটি ভোগবঞ্চিত বিলাসী নাগর-রূপে দেখতে পাই, পুরো উক্তিটি একটি সযত্নসাধিত ও সুগন্ধী প্রেমপত্রের মতো শোনায়। কথাটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য কোনো-কোনো আধুনিক কবির সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করবো। জীবনানন্দ দাশ 'আকাশলীনা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার প্রথম স্তবক—

> সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি,
> বোলো নাকো কথা ঐ যুবকের সাথে ;
> ফিরে এসো, সুরঞ্জনা ;
> নক্ষত্রের রূপালি আগুনভরা রাতে ;

ষোলো লাইনের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি প'ড়ে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, এর নায়িকা মৃতা না বিশ্বাসঘাতিনী, তা বোঝার প্রয়োজনও করে না, কেননা ঐ 'ফিরে এসো' আহ্বানের মধ্যেই তার অভাবের শুদ্ধ বেদনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমের কবিতায় চণ্ডীদাসের বা জীবনানন্দের অস্পষ্টতা নেই, তাঁর নায়িকা স্পষ্টত শরীরিণী, কিন্তু তিনি যে-বিরহের কথা বলেন তাও তার তীব্রতার চাপেই দেহের সীমা অতিক্রম ক'রে যায় :

> চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।
> আজো বলি,
> জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি আজো বলি—
> অভাবে তোমার
> অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
> কাম্য শুধু স্থবির মরণ।...
> আমার জাগব স্বপ্নলোকে
> একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ।

এইরকম 'অতিরঞ্জিত' ও অযৌক্তিক কথা যক্ষ কখনো বলতে পারে না, সে

বলে : 'কল্পনায় আমি তোমার সঙ্গে নিজের দেহকে মেলাই', 'যে-হাওয়া তোমাকে স্পর্শ করেছে তাকে আলিঙ্গন করি', 'শিলায় তোমার ছবি এঁকে নিজেকে তার পায়ে লোটাতে চাই'—অর্থাৎ তার বিরহের অভিব্যক্তিও বাস্তব সম্ভবপরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আধুনিক কবির রচনাটি একটি শূন্যতার হাহাকার, আর যক্ষের উক্তি একটি অভিরাম কারুকর্ম, যাতে বিরহদশার কৃত্যসমূহ প্রথামতো সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'লো—জড় বস্তুতে প্রিয়ার প্রতিরূপ দর্শন। এরও পূর্বাভাস বাল্মীকিতে আছে, পম্পাতীরবর্তী শোভা দেখে রাম সীতার সৌন্দর্য স্মরণ করছেন, কিন্তু বাল্মীকিতে যা একটি সাধারণ অনুভাবের মতো কাজ করছে, বিদগ্ধ কালিদাস তাকে কয়েকটি বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত ক'রে নিয়েছেন :

> শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
> বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
> উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
> হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

> (দেখি প্রিয়ঙ্গুতে তোমার তনুলতা, বদন বিম্বিত চন্দ্রে,
> ময়ূরপুচ্ছের পুঞ্জে কেশভার, চকিত হরিণীতে ঈক্ষণ,
> শীর্ণ তটিনীর ঢেউয়ের ভঙ্গিতে ভুরুর বিলসিত পতাকা,
> কিন্তু, হায়, নেই তোমার উপমান কোথাও একযোগে, চণ্ডী!)

এর পাশাপাশি পড়া যাক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের :

> ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
> অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
> অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
> দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।
> স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম ;
> সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে ;
> পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;
> আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।

দুটি অংশেরই শেষ পংক্তিতে একটি 'কিন্তু' প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেই প্রতিতুলনার জন্যেই এরা বিশেষভাবে ফলদ ; নয়তো কয়েকটি কবিপ্রসিদ্ধির মাল্যরচনার

বেশি হ'তো না। কিন্তু যক্ষের আক্ষেপের কারণ শুধু এই যে তার প্রিয়ার সাদৃশ্য একসঙ্গে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, আর আধুনিক কবির দুঃখ তাঁর প্রাক্তন প্রিয়া এখন অন্য কাউকে ভালোবাসছে ব'লে। দুয়ের মধ্যে কোন দুঃখ দারুণতর তা না-বললেও চলে; যক্ষ যা বলছে তাতে, সত্যি বলতে, দুঃখেরই কোনো কারণ নেই, আমরা তাতে মনোহর একটি ভাবচ্ছবি শুধু দেখতে পাই, যাকে ইংরেজিতে বলে ফ্যান্সি। এই দুই অংশের উপকরণগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এরা জাতে আলাদা—আর তার কারণ কবিত্বশক্তির তারতম্য নয়, আমরা এক জগৎ ছেড়ে আর-এক জগতে চ'লে এসেছি।

আসল কথা, সারা 'মেঘদূতে' কোনো ব্যর্থতাবোধ নেই—যক্ষের অবস্থায় তা থাকতেও পারে না—সেইজন্য তাতে বিরহবেদনা এত দুর্বল। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' ('দূরে, বহুদূরে') কবিতাটি 'মেঘদূতে'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আমরা আবিষ্কার করি যে ঐ কবিতার বিষয়, প্রতিটি স্বতন্ত্র তথ্য, এমনকি বহু ভাষাবিন্যাস 'মেঘদূত' থেকে আহরিত—তাকে বহুলাংশে কালিদাসের অনুলিখন বললে ভুল হয় না—অথচ তাতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা কালিদাস বলতে চাননি, বলতে পারেননি, বলতে পারতেন না। নায়িকার 'বাসস্থল' উজ্জয়িনী, তার প্রসাধন অলকার নারীদের অনুরূপ, তার ভবন যক্ষভবনের অনুকার, আর 'মিলনে'র কাল আরতিমুখর সন্ধ্যালগ্ন। লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম, মহাকাল-মন্দিরে সন্ধ্যারতি, দ্বারপার্শ্বে পুত্রবৎলালিত শিশু তরু ও শঙ্খপদ্ম-চিহ্ন, কপোত, ময়ূর, চন্দন ও কেশধূপ—কবিতার আবহটিকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে 'মেঘদূত' থেকে তুলে নিয়েছেন। পড়তে-পড়তে আমরা প্রথম সেখানে থমকে দাঁড়াই, আধুনিক কবির ব্যক্তিস্বরূপের বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করি, তা এইখানে—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু, আছ তো ভালো?"

কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম চমক কেটে যাবার পর আমাদের মনে পড়ে যে—'হে বন্ধু,

আছ তো ভালো'-র আশ্চর্য হৃৎস্পন্দন—এর মধ্যেও 'মেঘদূতে'র প্রতিধ্বনি আছে। যক্ষ মেঘের মুখ দিয়ে বলছে:

তোমার সহচর, যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে।
অবলা, তোমাকে সে কুশল জিজ্ঞাসে, প্রথমকৃত্য এ-প্রশ্ন,
কেননা প্রাণীদের জীবন অস্থির, বিপদ ঘটে অতি সহজে। (উ ১০২)

কথাটাকে সরল বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—'ভালো আছো তো?' একই প্রশ্ন: তবু দুয়ের মধ্যে কত বড়ো প্রভেদ, কী যুগান্তরকারী ব্যবধান। যক্ষের প্রশ্ন একজন নীতিজ্ঞ জড়বাদীর: তার প্রিয়া যে ম'রে যায়নি, শারীরিক কুশলে আছে, শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছে সে; আর রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নে ধ্বনিত হচ্ছে এক জন্ম-জন্মান্তরের বেদনা, যা হৃদয়ের মধ্যে অনবরত উত্থিত হয় কিন্তু কোথাও যার উত্তর নেই। 'বলো, বলো তোমার কুশল শুনি/তোমার কুশলে কুশল মানি'—এই দ্বিতীয় পংক্তিটি যক্ষের পক্ষে অচিন্তনীয়, অথচ ওটি না-থাকলে আমরা একে কবিতাই বলতুম না। পরিচিত ব্যক্তিরা পথে দেখা হ'লে কুশলপ্রশ্ন করেন, প্রেমিকরাও প্রত্যহ তা করতে পারেন; কিন্তু যে-গুণে দ্বিতীয়টিকে আমরা প্রেমের ভাষা ব'লে চিনতে পারি তার বাণীরূপ আমরা দেখতে পাই—কালিদাসে নয়, এই বৈষ্ণব কবিতায়। 'ঘরে বাইরে'র বিমলার ভাষা ব্যবহার ক'রে বলতে পারি, যক্ষের মুখে যা ছিলো তর্ক, বৈষ্ণব কবিতায় তা হ'য়ে উঠলো গান। আর রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নটি গানের চেয়েও বেশি—তা একটি পরম ব্যর্থতাবোধের নগ্ন উচ্চারণ।

লক্ষ্যণীয়, প্রশ্নটি উক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে 'স্বপ্ন' কবিতার নায়ক ভাষা ভুলে গেলো, নায়িকাও কোনো উত্তর দিলে না (উত্তর সম্ভব নয়), বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা ক'রে পরস্পরের নাম পর্যন্ত মনে আনতে পারলে না তারা। একবার শুধু হাতের স্পর্শ, নিশ্বাসের সংমিশ্রণ, তারপর—

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।

শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

একটি নিঃশেষ শূন্যতার মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে গেলো কবিতাটি, আমাদের মনে প'ড়ে গেলো যে কবিতাটির নাম 'স্বপ্ন'—স্বপ্ন, বাস্তব নয়, কিন্তু পরাবাস্তব, যে-স্বপ্ন থেকে কোনোদিনই আমরা সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠতে পারবো না। এই 'অন্ধকার' শুধু রাত্রির নয়—বিরহের, বিস্মরণের, এক অনাদি ও অনন্ত বিরহের। এই তৃষ্ণা এমন যা কোনোদিন মিটবে না, এই প্রিয়া এমন যে স্পর্শমাত্রে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। কবিতার এই শেষ অংশেই রবীন্দ্রনাথের চরিত্র প্রকাশ পেলো, ঘোষিত হ'লো রোমান্টিক আর্টের বিজয়গৌরব।

৫

মানতেই হয়, 'মেঘদূতে'র যক্ষ একজন লিবিডোভারাতুর জীব, তার প্রেমের ধারণা শৃঙ্গারবাসনায় সীমাবদ্ধ। তাকে প্রেমিকরূপে, বিরহীরূপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা আজকের দিনে কিছুতেই সার্থক হবে না, বরং তার কামাতুরতা স্বীকার ক'রে নিলেই কাব্যটিকে আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারবো। এই স্বীকৃতি মনে রেখে, আমরা যখন গভীরভাবে বার-বার 'মেঘদূত' পড়ি, তখন কাব্যটির আর-একটি দিক আস্তে-আস্তে খুলে যেতে থাকে; আমরা দেখতে পাই, কালিদাস যক্ষের মুখে যা-কিছু কথা বসিয়েছেন তার প্রায় প্রত্যেকটি তার রুদ্ধ রতির ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। আটমাসব্যাপী সম্ভোগের অভাবে, সে এখন যে-দশা প্রাপ্ত হয়েছে তার নাম দেয়া যায় নিখিলকামুকত্ব; সব চিন্তা, সব স্মৃতি, তার মনে যৌন চিত্রকল্প জাগিয়ে তুলছে; তার কাম, যথাযথ পাত্র থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, নিসর্গে ছড়িয়ে পড়লো। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পর' কবিতারও এ-ই বিষয়; তার শেষ স্তবকে 'মেঘদূতে'র অবদানও সুস্পষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাকে বায়বীয় নির্বাসে পরিণত করেছেন, কালিদাসে আমরা পাই সেই রক্তমাংসেরই আকার ও আকৃতি। 'মেঘদূতে' যৌনতার উল্লেখ যে এত বেশি, তার কারণ দেখাতে হ'লে শুধু আদিরসের প্রতি সংস্কৃত কবিদের সাধারণ দুর্বলতার উল্লেখ করলে চলবে না, এ-কথাও মনে রাখা চাই যে যক্ষ তার রমণ-

তৃষ্ণায় সর্বভূতে ঈপ্সিতকে বিম্বিত ক'রে তুলছে। পূর্বমেঘের ভূগোল ও উত্তরমেঘের অলকা—সবই যক্ষের কামনায় অনুরঞ্জিত, যে-সব দৃশ্য আমরা দেখছি তাদেরও মধ্যে তার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে বা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পথে-পথে প্রতিটি পর্বতচূড়ায় মেঘের জন্য বিশ্রামের নির্দেশ আছে; সেই পর্বতসমূহ যে নারীর স্তনের প্রতিরূপ, তা প্রথম সুযোগেই ব'লে দিতে কবি ভোলেননি:

প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক্ব ফল,
বেণীর মতো গাঢ় বর্ণধারী তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে—
দৃশ্য হবে যেন ধরার পয়োধর, অমরমিথুনের ভোগ্য,
গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো। (পৃ ১৮)

'গর্ভিণীর স্তন' ব'লে ব্যাপারটিকে আরো বিশদ করা হ'লো—এরও আগে বকপক্ষিণীর গর্ভাধানের উল্লেখ আছে (পৃ ৯), আছে শিলীন্ধ্রবতী পৃথিবীর উর্বরতার কথা (পৃ ১১), এবং 'মেঘদূতে' অন্য যে-সব পশুপক্ষী দেখা যায় তাদের প্রায় সকলেরই মৈথুনঋতু বর্ষা, কাকাদির নীড়নির্মাণ ও হস্তীর মদস্রাবেও যক্ষের কামনা প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন পর্বতে বিশ্রাম, তেমনি মেঘ পথে-পথে নদীসমূহে অবতরণ করবে; তার এই কর্মে খুবই স্পষ্টভাবে রতিক্রিয়ার ছবি আঁকা হ'লো—একবার নয়, বার-বার—মেঘ নায়করূপে এই ভিন্নপ্রকৃতি নদীনায়িকাদের তৃপ্তিসাধন ক'রে নিজেও পরিতৃপ্ত হচ্ছে। কোনো নদীর ঢেউ রূপসীর ভ্রূভঙ্গির মতো, কোনো নদী তার ঘূর্ণিরূপ নাভি দেখাচ্ছে, কেউ বিরহে কৃশ, কারো বায়ু মিলনোৎসুক প্রিয়ের মতো চাটুকার, কারো বায়ুতে যুবতীর জলকেলির সৌরভ ভেসে আসছে, আর কেউ বা

বসন ধ'রে আছে শিথিল হাতে যেন, তেমনি ঝুঁকে আছে বেতের শাখ
মুক্ত কোরো, সখা, তটনিতম্বের সরিয়ে দিয়ে নীল-সলিল বাস;
সহজে প্রস্থান হবে না সম্ভব, তুমি যে তার 'পরে লম্বমান,
বিবৃতজঘনার বারেক পেলে স্বাদ কে আর পারে, বলো, ছাড়াতে (পৃ ৪১)

'লম্বমান' কথাটি মূলেই আছে—এখানে কালিদাসের রচনা চিত্রকল্পের সীমা পেরিয়ে একেবারে বাস্তব আলেখ্য হ'য়ে উঠলো। যেখানে-যেখানে প্রসঙ্গ

ভিন্ন তেমন অনেক স্থলেও মল্লিনাথ আদিরসাত্মক ধ্বনি আবিষ্কার করেছেন, তাছাড়া আমরা শাদা চোখেও দেখতে পাই যে 'মেঘদূত' কাব্যটি যৌনধর্মের প্রভাবে একেবারে পূর্ণ ও পরিস্ফীত; কী পূর্বমেঘে, কী উত্তরমেঘে, নারী ও রতিপ্রসঙ্গের উল্লেখ বহুলপরিমাণে অত্যধিক; বনবধূ, গ্রামবধূ, পুষ্পচায়িকা, পুরস্ত্রী, বারাঙ্গনা, নর্তকী, যক্ষনারী, দেবকন্যা, কাউকে কবি বাদ দেননি—কোথাও শিলাগৃহে বেশ্যাবিলাসীদের মত্ত যৌবন রাষ্ট্র হচ্ছে, কোথাও স্নানার্থিনী স্বর্গযুবতীরা মেঘকে বাহুবেষ্টনে ধ'রে রাখতে চায়, কোথাও গঙ্গা স্খলিত হচ্ছে অঙ্কশায়িনী প্রণয়িণীর বসনের মতো, আর কোথাও বা মেঘ অগোচরে প্রবেশ ক'রে অন্তঃপুরিকাদের 'স্বজলকণিকা'য় দূষিত ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে। আর যে-সব স্থলে অভিসার, প্রমোদ, রতিক্রিয়া ও উত্তরক্লান্তি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হয়েছে তাদের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত, সারা 'মেঘদূতে' এমন শ্লোকের সংখ্যা অল্পই, যাদের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অযৌন। এর ফলে কাব্যটি ক্লান্তিকর হ'তে পারতো—তা যে হয়নি তাতেই বোঝা যায় কালিদাসের রচনা কত পরাক্রান্ত। পূর্বে বলেছি যক্ষ কামুকমাত্র; এখন যোগ করবো যে তার কাম এমন পরিশীলিত, বহুমুখী ও দ্যুতিময় যে তা-ই, শুধু তা-ই অবলম্বন ক'রে একটি মহৎ কাব্যের সৃষ্টি হ'তে পারলো। এই অতিশয় পরিমিত বিষয়টির মধ্যে কালিদাস যেমন বৈচিত্র্য ও সরসতার সঞ্চার করেছেন, যেমনভাবে অতক্ষণ ধ'রে আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট রাখতে পেরেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার কোনো তুলনা আমার জানা নেই। কালিদাসের নিজেরই কাব্যের মধ্যে 'ঋতুসংহার', 'কুমারসম্ভব' অষ্টম সর্গ ও 'রঘুবংশ' শেষ সর্গ প্রধানত বা সম্পূর্ণত আদিরসাত্মক (তিনটিকেই তাঁর রচনা ব'লে ধ'রে নেয়া যাক), কিন্তু এর একটিও আমরা দ্বিতীয়বার পড়বার জন্য অত্যন্ত বেশি উৎসাহ বোধ করি না। অথচ 'মেঘদূতে'র সঙ্গে আমরা যত বেশি ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি, তত বেশি আনন্দ পাই। তার একটি কারণ এই যে কাম এখানে রোমান্টিক বেদনায় রূপান্তরিত না-হ'লেও বিশ্বের পটভূমিকায় বিন্যস্ত হয়েছে, যক্ষের মানসরমণে অংশ নিচ্ছে রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত সমস্ত জড় ও জীবজগৎ। কামের এই বিশ্বরূপ অন্য কোনো কাব্য আমাদের দেখাতে পারেনি।

এবং আশ্চর্য এই যে কালিদাস শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রায় বিশ্বাস করিয়ে

ছাড়েন যে যক্ষ সত্যি-সত্যি কষ্ট পাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ অনেক: সে তার প্রিয়াকে 'একপত্নী' বা সাধ্বী ব'লে ঘোষণা করলেও নিজেকে মুখ ফুটে কখনো অনন্যমুখী বলছে না (যদি না উ ১১৩-র সে-রকম অর্থ করা যায়); স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার চেয়ে করুণার ভাবই প্রবল; আত্মকরুণাকে সে প্রশ্রয় দেয় মাঝে-মাঝে, তার নির্বাসনের দুঃখকে কোনো বৃহত্তর অর্থে মণ্ডিত করতে পারে না। কিন্তু তবু, উত্তরমেঘের শেষাংশে কাব্যটি যেন ধীরে-ধীরে মর্মস্পর্শী হ'য়ে ওঠে; আমরা ক্রমশ অনুভব করি যে যক্ষের বিলাপের মধ্যে শুধু অলংকার- ও রতিশাস্ত্রের নিয়মরক্ষা করা হয়নি, একটি অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। হ'তে পারে সে-অভিজ্ঞতা আর-কিছু নয়, ইন্দ্রিয়দমনের ক্লেশ—কিন্তু কালিদাস তাকেই দুঃখের মর্যাদা দিতে পেরেছেন, একটি স্নিগ্ধগম্ভীর উদ্ভাসে তাকে করুণ ও সুন্দর ব'লে মনে হয়। ইতিপূর্বে 'মেঘদূত' বিষয়ে 'সমলয়সম্পন্ন' বিশেষণটির প্রয়োগ করেছি—অর্থাৎ তার গতি কোথাও দ্রুততর হয় না, কোন বিষয়ে কতটুকু বলা হবে কবি তা ঠিকমতো মেপে নিয়েছেন—অথচ, যক্ষের নিজ ভবনের প্রসঙ্গ থেকে শুরু ক'রে আমরা যেন মনে-মনে অন্য একটি স্বর শুনতে পাই, একটি উচ্চতর স্বরগ্রাম, কবিতার আন্তরিক ছন্দ বদলে গেলো যেন, হ'য়ে উঠলো—ঐ কৃত্রিম ভঙ্গির সব দাবি মিটিয়ে দিয়েও—ঈষৎ ব্যক্তিগত, বিশেষ মুহূর্তে কোনো-একজন মানুষের উচ্চারণের মতো। এই রকম ছন্দ-বদল আমরা আগেও দু-একবার লক্ষ্য করেছি—যেমন উজ্জয়িনীর নারী বা শিবমন্দির, বা অলকার প্রসঙ্গে—কিন্তু অন্য কোথাও যক্ষের ব্যক্তিত্বকে এমন স্পষ্টভাবে আমরা উপলব্ধি করি না, যেমন উত্তরমেঘের শেষার্ধে। দ্বারপার্শ্বে শিশু মন্দার, সরোবর, প্রমোদশৈল, ময়ূর ও সারিকা—আমাদের পূর্বপরিচিত বিলাসদ্রব্যসমূহ এই প্রথমবার স্মৃতি ও বেদনার সংযোগে তৃতীয় আয়তন লাভ করলে। যক্ষ তার পত্নীর কথা ভেবেই অধিকতর ব্যাকুল হচ্ছে; কিন্তু পত্নীর শোচনীয় দশায় আমাদের মনে যক্ষেরই প্রতি অনুকম্পা জাগে; তার 'জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্'-এর গাঢ় কণ্ঠস্বরকে অবিশ্বাস করতে পারি না; আর তারপর তার বার্তা, তার আশ্বাসবাক্য, তার হৃদয়গ্রাহী অভিজ্ঞান—সবই আমাদের বাধ্য করে তার কামনার প্রতি সশ্রদ্ধ হ'তে; যে-শুভানুধ্যায়ী বন্ধুতা মেঘের কাছে সে প্রার্থনা করছে আমরা তাকে তা দেবার জন্যে উৎসুক

হই। ততক্ষণে মেঘের সঙ্গে আমরা একাত্ম হ'য়ে গিয়েছি (পূর্বমেঘে মেঘ আমাদের দ্রষ্টব্যের বেশি কিছু নয়)—যক্ষপ্রিয়াকে লক্ষ্য করি আমরাই, আমরাই ঘুম ভাঙাই তার, ধীরে-ধীরে যক্ষের কথা নিবেদন করি তার কাছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ব্যাপারের পরে, উপান্ত্য শ্লোকে যক্ষের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এলো—যে-মেঘের মুখ দিয়ে এত কথা সে বলিয়ে নিলে, সেই মেঘ তার কথার কোনো উত্তর দিলে না। কেমন ক'রে দেবে? সে যে জড় বস্তু। যক্ষ মুখে বলছে বটে—'উত্তর না-পেলেও আপনার ধীরতা অনুমান করবো না'—কিন্তু মনে-মনে সে জানে—আর আমাদেরও বুঝতে দেয়—যে এতক্ষণ ধ'রে সে একটি নাটকের অভিনয় করলে মাত্র, আসলে ব্যাপার কিছু নয়, বিশুদ্ধ মায়া, আত্মসম্মোহন। আমরা অনিচ্ছুকভাবে উপলব্ধি করি যে যক্ষ পয়লা আষাঢ় তারিখে রামগিরিতে দাঁড়িয়ে এই শতাধিক শ্লোক আবৃত্তি ক'রে গেলো, তার একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি এটি, এ থেকে অন্য কিছুতে পৌঁছনো যাবে না, আর-কিছুই থাকতে পারে না এর পরে। আর তৎসত্ত্বেও, কাব্যের প্রভাব এত প্রবল যে মেঘের এই কল্পিত অভিযানকেই আমরা 'সত্য' ব'লে অনুভব করি।

৬

আশাতীতের নিরন্তর প্রত্যাশা—এই হ'লো রোমান্টিক আর্টের সারাৎসার। আশাতীত মনে আজগবি নয়, ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন নয়; আশাতীত মানে সেই সব গোপন সম্বন্ধ যা সাধারণ বুদ্ধির ধারণার মধ্যে আসে না, কিন্তু কবির কাছে যার সম্ভবপরতা অনিবার্য। রোমান্টিকতার দাবি এই যে কবিতা হবে সন্ধানধর্মী, আবিষ্কারপ্রবণ; বিশ্বের আপাতবিদৃশ বস্তুরাশি—আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিরকাল যারা পরস্পরের সুদূর ও অপরিচিত হ'য়ে থাকে—তাদের মধ্যে স্থাপন করবে একটি ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ। এইভাবে দেখলে, রোমান্টিকতা শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন আর থাকে না; তা হ'য়ে ওঠে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের একটি চিরকালীন ধারা, যার লক্ষণ আমরা বাল্মীকি বা দান্তের মতো ধ্রুপদী কবিতেও দেখতে পাই, কিন্তু কালিদাসের ন্যায়ধর্মী মানস যাকে দৃপ্তভাবে অস্বীকার করে। কোলরিজ তাঁর 'কুবলা খান' কবিতায় যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সাযুজ্য

নেই; 'stately pleasure-dome', 'caverns measureless to man', 'woman wailing for her demon-lover', 'ancestral voices prophesying war'—এগুলোর মধ্যে কোনো কার্যকারণঘটিত যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না: কিংবা, কবিতার শেষে, কোলরিজ এ-কথাও কবুল করেননি যে এটি তাঁর একটি স্বপ্নমাত্র, এই অসম্ভব সমাবেশরচনার জন্য তাঁর একতিল জবাবদিহি নেই। অথচ আমাদের মনের কাছে যা ধরা পড়ে তা শুধু সমাবেশ নয়, একটি গভীর সমন্বয়, যুক্তির অতীত কোনো শৃঙ্খলার বলে এই স্বভাববিশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ এমন একটি একতায় আবদ্ধ হয় যে কবিতাটির একটি কথাও হারাতে, সরাতে বা বাড়াতে আমরা রাজি হই না। আমরা ইতিহাস প'ড়ে জেনেছি যে কবিতাটি অসমাপ্ত, কিন্তু তাকে অসম্পূর্ণ ব'লে ভাবতেই পারি না; বরং 'দি অ্যানশেন্ট ম্যারিনার'-এর খেদজনক সমাপ্তি স্মরণ ক'রে, ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করি 'কুবলা খান'-এর রচনা আর অগ্রসর হয়নি ব'লে।

পক্ষান্তরে, 'মেঘদূতে' যে-একটিমাত্র স্বভাববিরোধী তথ্য আছে, তার জন্য কালিদাস আমাদের বুদ্ধির কাছে ওকালতি করছেন; স্পষ্ট বলছেন যে মেঘকে সচেতন ব'লে কল্পনা করাটা যক্ষের ভ্রান্তিমাত্র, যে-ভ্রান্তি, আমরা দেখতে পাই, কাব্যের শেষে যক্ষেরও ভেঙে গেলো। কবিতার দুই ভিন্ন জাতের চরম নমুনা ব'লে এ-দুটিকে স্বীকার ক'রে নিতে পারি আমরা; 'কুবলা খান' যেমন কোনোখানেই লজিকনির্ভর যুক্তিকে স্বীকার করে না, তেমনি 'মেঘদূতে' এমন কিছু নেই যা লজিকের বশবর্তী নয়। কথাটা ভালোভাবে বোঝা যাবে 'মেঘদূতে'র উপমা ও উৎপেক্ষা ভালোভাবে পরীক্ষা করলে। কালিদাসের উপমার মধ্যে—তার আবহমান খ্যাতি সত্ত্বেও—আমরা প্রধানত দেখতে পাই—কবির স্বকীয় কোনো দৃষ্টি নয়, কবিপ্রসিদ্ধির বিশিষ্ট ব্যবহার। চকিত হরিণীর মতো দৃষ্টি, ভ্রমরপংক্তির মতো কটাক্ষ, ময়ূরপুচ্ছের মতো চুল, বিম্বফলের মতো অধর, কদলীকাণ্ডের মতো উরু, পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকের মতো স্তন—এই সবই আমরা বহুবার শুনেছি, মুখস্থ-করা বুলির মতো হ'য়ে গেছে এগুলো, কিন্তু কালিদাস এই চিহ্নিত পুঁজির বাইরে দৃষ্টিপাত করতে রাজি নন। অথচ এমনও বলা যায় না যে এ-সব উপমার নির্বিশেষ চরিত্র বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন; অন্তত এক

স্থলে মনে হয় যেন কবিপ্রসিদ্ধির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ক্লান্ত হ'য়ে, তিনি নিজেই নিজের অভ্যাসকে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করেছেন। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গে তরুণী উমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথারীতি বর্ণনা দিতে-দিতে, কবি হঠাৎ যেন থমকে গিয়ে বলছেন :

> নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্ত শৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ।
> লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং জাতাস্তদূর্বোরুপমানবাহ্যা ॥ (১ : ৩৬)

অর্থাৎ—হাতির শুঁড় কর্কশ, কলাগাছ ঠাণ্ডা ; অতএব এরা লোকসম্মত হ'লেও উমার উরুর উপমান হ'তে পারে না। (কেননা তা স্পর্শে কোমল ও কবোষ্ণ)। কিন্তু এই উপলব্ধির ফলে নতুন কোনো উপমা তিনি যে ব্যবহার করেননি এতে বোঝা যায় সমকালীন কাব্যাদর্শের তিনি কতদূর অধীন ছিলেন, কতদূর ইতিহনির্ভর, এমনকি প্রচলে বিশ্বাসী।

অবশ্য আমরা সঠিকভাবে জানি না, কালিদাসের উপমাদির কতটা অংশ তাঁর সময়েই কবিপ্রসিদ্ধি ব'লে গণ্য ছিলো, আর কতকটা অংশ (যদি তেমন কিছু থাকে) তাঁর রচনার পরেই কবিপ্রসিদ্ধিতে দাঁড়িয়ে যায়। বাল্মীকিতে ও অশ্বঘোষে এমন অনেক উপমা ও বাক্যাংশ আছে যা কালিদাস নানা ভাবে নানা স্থলে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিটি উপমাই পূর্বসূরীদের ভাণ্ডার থেকে চয়িত কিনা, এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই।* হয়তো তা-ই, হয়তো তা নয় ; হয়তো অনেক উপমা, পরে যা ধরা বুলিতে পরিণত হয়, তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন—কিন্তু সে যা-ই হোক, তাঁর কোনো উপমাতেই এমন কিছু নেই যা প্রথাসিদ্ধ নয়, আক্ষরিক নয়, অলংকারধর্মী নয়। বস্তুর সঙ্গে ভাবনার, পরিচিতের সঙ্গে দূরবর্তীর, মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের তিনি তুলনা করেন না ; যে-সব বস্তু কোনো-না-কোনো স্বাভাবিক লক্ষণগুণে পরস্পরের অনুরূপ, শুধু তাদেরই একসূত্রে বাঁধেন ; বিশ্বের মধ্যে লুকোনো কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন না, যা

* অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' গ্রন্থে ও অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাল্মীকি ও কালিদাস' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬) দেখিয়েছেন, উপমাদি বিষয়ে বাল্মীকির কাছে কালিদাসের ঋণ প্রায় অগণ্য।

প্রতীয়মান তাকেই মনোরম ক'রে তোলেন। 'মেঘদূতে'র যে-সব উপমা বিশেষভাবে মনোমুগ্ধকর তাদের বলা যায় চিত্রধর্মী সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ছবি হিশেবে তারা ভোলবার নয়, কিন্তু তারা কোনো অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে না।

> মহান তার চূড়া ব্যাপ্ত করে নভে শুভ্র কুমুদের কান্তি,
> নিত্য-জ'মে-ওঠা অট্টহাসি যেন রাষ্ট্র করেছেন ত্র্যম্বক। (পূ ৫৮)
>
> স্বল্পবিলসিত আভাসে নেভে, জ্বলে যেমন জোনাকির পুঞ্জ,
> তেমনি বিজল্লীর স্ফুরিত দৃষ্টিতে তাকাবে ভবনের মধ্যে। (উ ৮২)
>
> বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তনু মনোকষ্টে,
> পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত— (উ ৮৯)
>
> মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে। (উ : ৯১)
>
> স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য,
> সুরার পরিহারে ভুলেছে ভ্রূবিলাস, এমন বাম আঁখি মৃগাক্ষীর
> তোমার আগমনে ঊর্ধ্বকম্পিত আন্দোলনে হবে সুন্দর,
> তুলনা সে-রূপের ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয়। (উ ৯৬)

এর প্রতি ক্ষেত্রে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে একটি আপতিক সাদৃশ্য রয়েছে ; তুষার শুভ্রবর্ণ, সংস্কৃত প্রথানুসারে হাস্যও তা-ই ; তাছাড়া মহাদেব কৈলাসবাসী, তাঁর অট্টহাসি কল্পনা করতে গেলে আমাদের মনে বিরাটের ভাব জেগে ওঠে ; কৈলাসের তুঙ্গ ও ধবল চূড়া তাঁর সঙ্গে একাধিক অনুষঙ্গে জড়িত। তেমনি, জোনাকি ও বিদ্যুতের চমক, বিরহিণী ও শীর্ণ চাঁদ, দুঃখিনী ও মেঘলা দিনের পদ্ম, ক্ষুব্ধ নীলপদ্ম ও কালো চোখের চঞ্চলতা—এই যুগলসমূহ একই ধরনে করুণ বা প্রিয়দর্শন, এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা ভাবগত দূরত্ব নেই। দান্তের উপমা বিষয়ে এলিয়ট যা বলেছেন এদের বিষয়ে তা-ই বললে হয়তো ভুল হয় না ; এদেরও উদ্দেশ্য দৃশ্যগুলিকে আমাদের মনের সামনে আরো সুনির্দিষ্ট ক'রে তোলা, আরো স্পষ্ট ক'রে আমাদের দেখানো। কিন্তু দান্তের যে-উপমাটি এলিয়টকে (আর তাঁর আগে ম্যাথু আর্নল্ডকে) মুগ্ধ করেছে, সেটিকে

কালিদাসের সধর্মী বলা যায় না। নরকের ঘোলা আলোয় পাপীর দল আগন্তুক দু-জনের দিকে তাকাচ্ছে—

> Knitting up their brows they squinnied at us
> Like an old tailor at the needle's eye.
>
> (ইনফার্নো : ১৫। পেঙ্গুইন অনুবাদ।)

এর অব্যবহিত পূর্বে, একই বিষয়ে, আর-একটি উপমা পাওয়া যায় :

> Hurrying close to the bank, a troop of shades
> Met us, who eyed us much as passers-by
> Eye one another when the daylight fades
>
> To dusk and a new moon is in the sky—

কোথায় নরকের পাপীর মিটমিটে চোখ, আর কোথায় বুড়ো দরজির ছুঁচে সুতো পরানো! সন্ধ্যায় যখন প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে, সেই স্বল্প আলোয় আমরা হয়তো পরিচিতকেও হঠাৎ ঠিক চিনতে পারি না, কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে এমন কোনো বীভৎস বা ভীতিকর ভাব নেই, যাতে নরকের কথা স্বভাবত আমাদের মনে পড়তে পারে। কর্মিষ্ঠ বুড়ো দরজি আমাদের শ্রদ্ধা ও করুণা জাগায়, আর সান্ধ্যলগ্নটিকে আমরা রমণীয় ব'লেও অনুভব করতে পারি; নরকবর্ণনায় এ-দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে দান্তে যে-সব তথ্যের মধ্যে যোগসাধন করেছেন, তাঁর কাব্য রচিত হবার আগে সেগুলোকে একত্র ক'রে বা সম্পৃক্তভাবে কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি, বা দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিলো না। এই উপমা দুটিতে শুধু যে বর্ণিতব্য বিষয় স্পষ্ট হয়েছে তা নয়, মানুষের অনুভূতির সীমান্ত চিরকালের মতো প্রসারিত হ'লো।

> Full fathom five thy father lies;
> Of his bones are coral made;
> Those are pearls that were his eyes:

এই কাব্যাংশের কোন গুণে এর আবেদন এমন অন্তহীন ও বিচিত্র? একে ছবির গুণে সমৃদ্ধ বলা যায় না (যা কালিদাসের শ্রেষ্ঠ উপমাকে সর্বদাই বলতে পারি); মৃত মানুষের হাড়ের সঙ্গে প্রবালের, চোখের সঙ্গে মুক্তোর, আকৃতি- বা বর্ণগত সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট নয় (প্রেয়সীর অধরের সঙ্গে প্রবালের ও দাঁতের সঙ্গে মুক্তোর তুলনাই শেক্সপীয়রের সমকালীন কাব্যে চলিত

ছিলো)। কিন্তু এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে-প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে তার ফলে এই ক্ষুদ্র গীতিকাটি প্রাণধর্মে বেগবান হ'য়ে উঠেছে: প্রবাল ও মুক্তো সামুদ্রিক বস্তু ব'লে জলমগ্ন নাবিকের সহবাসী; দুটো জিনিশই প্রাণীর দেহনির্গত ক্ষরণ, মৃত্যুর উপজাতক—অথচ দুটোকেই, বর্ণ, আকৃতি ও দুষ্প্রাপ্যতার গুণে, মানুষ মূল্যবান ব'লে জ্ঞান করে। ফলত, 'coral' ও 'pearl' শব্দ দুটিতে আমরা যখন মৃত্যুর প্রতিধ্বনি শুনছি, তখনই তারা আমাদের মনকে প্রস্তুত ক'রে তোলে পরবর্তী 'rich and strange' বিশেষণ দুটির অভিঘাতের জন্য—ফ্রেমে-বাঁধানো পরিষ্কার কোনো ছবি পাচ্ছি না, কিন্তু মগ্ন নাবিকের এই আশ্চর্য 'সিন্ধু-রূপান্তর', স্বল্প কয়েকটি ইঙ্গিতে, আমাদের মনে ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

নারীদেহের বর্ণনায় সংস্কৃত কবিরা অক্লান্ত, তার কোনো-কোনো অংশের প্রশংসাতেও ভারতীয় সমালোচকেরা ক্লান্তিহীন। কিন্তু এই প্রসঙ্গেও—পূর্বেই বলেছি—উপমাদি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত; প্রতি অঙ্গের জন্য কয়েকটি বাঁধা-ধরা উপমান আছে, সেগুলোকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করতে কালিদাসও লজ্জাবোধ করেন না।

> আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

যাঁরা অল্পস্বল্প সংস্কৃত কবিতা পড়েছেন, তাঁরাও এই বিখ্যাত শ্লোকে দেখতে পাবেন—একটি পুনরাবৃত্তি মাত্র, যা পদলালিত্যের গুণে চমৎকারিত্ব পেয়েছে; একটু চেষ্টা করলে এই চিত্ররূপেরই বহু ভিন্ন-ভিন্ন প্রকরণ অন্যান্য কবির ও কালিদাসের নিজের রচনা থেকে উদ্ধার করা যায়। কোনো উপমাই এমন নয় যাতে আমরা ভাষার পিছনে ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যাতে কালিদাসের স্বকীয় বা অনন্য কোনো দৃষ্টি ধরা পড়ে। সে-রকম দৃষ্টি থাকলে, নারীদেহের মতো 'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত' প্রসঙ্গেও কল্পনার কত বড়ো ব্যাপ্তি ধরা দিতে পারে, তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :

> স্পষ্ট বেয়ে উঠলো উপরে
> দুটি চাঁদের মতো জানু
> উরুর উপচে-পড়া মেঘের মধ্যে ডুব দিলো;

জংঘার কৃশ ছায়াটি হঠলো পিছনে,
পা দুটি এগিয়ে এলো, হ'লো উজ্জ্বল,
আর দেহের সব ক-টি জোড় তেমনি জীবন্ত হ'য়ে উঠলো
যেমন জীবন্ত তাদের কণ্ঠ
যারা পান করছে সুরা।

*　　　　*　　　　*

তারপর এই শরীরের অস্পষ্ট উন্মেষে
লাগলে হাওয়া, উষসীর শিহরণ, প্রথম গভীর নিশ্বাস।
শিরার গাছে-গাছে কোমলতম শাখায় জাগলো গুঞ্জন,
আর তারপর রক্তের রোল আরো গভীরে ছড়িয়ে পড়লো,
আর এই হাওয়া হ'লো প্রবল, আরো প্রবল, আর তারপর
তার নিশ্বাসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তীব্র আঘাত করলো
নূতন স্তন দুটিতে,
ভ'রে তুললো তাদের, নিজেকে ভ'রে দিলো জোর ক'রে তাদের মধ্যে,
আর তারা
দিগন্তে-ভ'রে-ওঠা ভরা পালের মতো
হালকা মেয়েটিকে তীরে নিয়ে এলো ঠেলে।
('ভেনাসের জন্ম' : রাইনার মারিয়া রিলকে)

মহান জংঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।
('সুন্দর জাহাজ' : শার্ল বোদলেয়ার)

এরই পাশাপাশি উদ্ধৃত করি আমাদের অতিপরিচিত

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দ্বীপ যেমন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

'চাঁদের মতো মুখ'-এর চাইতে 'চাঁদের মতো জানু' অনেক বেশি সার্থক মনে হয় আমাদের কাছে, আর তার কারণ শুধু নূতনত্বের চমক ব'লেও মানতে পারি না। দেবী সমুদ্র থেকে উঠছেন (বতিচেলির চিত্র স্মরণীয়), জানুর অস্থি গোলাকৃতি, দিগন্তে যেমন চাঁদের উদয় পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবও তেমনি ; কিন্তু এই চাক্ষুষ সাদৃশ্যই এখানে সব কথা নয় ; জানুর প্রতি এই মনোযোগের কারণ, ঐ অঙ্গ চালনা ক'রেই তিনি তীরে উঠবেন, সকাল ভ'রে ফুটিয়ে তুলবেন 'ফুল আর ঘাস, উষ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত/যেন আলিঙ্গন থেকে উঠে-আসা।' এই গতির ভাবটিকেই ক্রমশ সোচ্চার ক'রে তোলা হচ্ছে : দেবীর জংঘা 'সুরাপায়ীদের কণ্ঠের মতো জীবন্ত', আর 'দিগন্তে ভ'রে-ওঠা ভরা পালের মতো' তাঁর নূতন স্তন দুটি। একই রকম অযৌক্তিকের সাধনায় বোদলেয়ার এক তরুণীর জংঘাকে দুটি ডাকিনী ব'লে ভাবতে পেরেছিলেন, যাদের আন্দোলনে তীব্র কাম উদ্‌গীরিত হচ্ছে ; জীবনানন্দ দেখতে পেয়েছিলেন এমন চোখ, যা নীড়ের মতো স্নেহে ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ। বিদিশার রাত্রির মতো চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ, বা— আরো আশ্চর্য—'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা'—কালিদাসের কাব্যাদর্শ অনুসারে এ-সব উপমার কোনো অর্থই করা যাবে না, কিন্তু আমাদের কাছে এদের অর্থ সব-কিছু। শ্রাবস্তী ও বিদিশা বিষয়ে তবু বলা যায় যে এই দুই নগর যেমন লুপ্ত, সুদূর, স্মৃতিভারাক্রান্ত, তেমনি বনলতা সেনও মানবী নয়, এক স্বপ্নচারিণী, যাকে কখনো পাওয়াও যাবে না, ভোলাও যাবে না। কিন্তু উটের গ্রীবার সঙ্গে নিস্তব্ধতার সম্বন্ধ কী ? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা যখন ভাষা খুঁজে পাই না, তখনও আমরা উপমাটিকে অত্যন্ত সংগত ব'লে অনুভব করি ; এই উপমা আমাদের চিত্ত-বৃত্তিকে জাগ্রত ও কর্মিষ্ঠ ক'রে তোলে, তার প্রেরণায় বিশ্বের দুই সুদূরপরাহত বস্তুর মধ্যে সেতুবন্ধন সহজ হ'য়ে যায়।

এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।
('আট বছর আগের একদিন')

বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে অনর্থক মনে হ'তে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটি যাঁর জানা আছে তিনি বুঝতে চাইলেই বুঝতে পারবেন যে 'উটের গ্রীবা' অদ্ভুত ব'লেই আশ্চর্যরকম সার্থক। মৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিয়েছিলো এই নিস্তব্ধতা; উটের চিত্রকল্পটিতে তারই ভয়াবহতা সূচিত হয়েছে, আত্মহত্যার প্রাক্কালে নৈশ স্তব্ধতার ভয়াবহ রোমহর্ষকতা। আসলে, উটের গ্রীবার উপমেয় এখানে ঠিক নিস্তব্ধতা নয়, মৃত্যু—মৃত্যুই তার ভীষণ গ্রীবা বাড়িয়ে দিলো জানলা দিয়ে, পূর্ব-পংক্তির 'অদ্ভুত' বিশেষণও এই অজানার আভাসে শিউরে উঠছে। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে উট অচেনা জন্তু, তার বাসস্থল মরুভূমি, আকার বৃহৎ ও আকৃতি অসুন্দর—এই তথ্যগুলিতে, পুরো কবিতাটি প'ড়ে ওঠার পর, আমরা লক্ষ্য করি এক গম্ভীর ও অশুভ ইঙ্গিত, যা কবিতাটির মূল ভাবনাকে প্রগাঢ় ক'রে তোলে। যে-সাধর্ম্য আমরা কোনো বিশেষ স্থলে খুঁজে পাই না, তার সামগ্রিক প্রভাবে সম্মোহিত হ'তে হয়।

ইঙ্গিতময় উপমার একটি শর্ত হ'লো এই যে উপমেয় ও উপমানে কোনো যান্ত্রিক যোগ আর থাকবে না, একটি তির্যকভাবে অন্যটির প্রান্ত স্পর্শ ক'রে চ'লে যাবে। অবশ্য কোনো উপমাতেই কোষ-তরবারি সম্বন্ধ থাকতে পারে না; 'চাঁদমুখ' বললেও চাঁদের মনোহারিত্ব শুধু মনে পড়ে আমাদের, তার শৈত্য, গোলত্ব বা মৃত অবস্থা নয়; কিন্তু রোমান্টিক কবিতায় উল্লিখিত উপমানেই কথা ফুরোয় না, তাকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে উপমার অভিপ্রায় আরো দূরে উত্তীর্ণ হয়।

ছোটো-ছোটো মূর্তির মতো, তারা কুঁকড়ে আছে একমনে
সামনে তাদের লালমুখো চুল্লির ফোকর
স্তনের মতো উষ্ণ—

র‍্যাঁবোর এই স্তবক আমাদের বুঝিয়ে দেয়, উপমানের স্থানচ্যুতির ফলে উপমা কত বেশি বলতে পারে। কবিতাটির নাম 'মুগ্ধেরা', বিষয় পাঁচটি দরিদ্র-সন্তান, যারা রুটিওলার দোকানের বাইরে বুভুক্ষুভাবে দাঁড়িয়ে আছে, শীতের রাত্রে, কনকনে হাওয়ায়। ভিতরে সারি-সারি রুটি সেঁকা হচ্ছে, চুল্লির লাল ফোকরটার দিকে মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে আছে তারা। সেই ফোকরটাকে কবি বলছেন স্তনের মতো উষ্ণ। স্তনের মতো কেন? আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে চুল্লির ফোকরটা এখানে একটা ধাপ মাত্র, সেই ফোকরে তৈরি-হ'তে-

থাকা রুটিগুলোই উপমার আসল লক্ষ্য। উষ্ণ, নরম, টাটকা রুটিকে অনেক বিষয়েই 'স্তনের মতো' বলা যায়—এবং উভয় বস্তুই খিদে মেটায়, পুষ্টি দেয়, যা এই ক্ষুধিত শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথা।

রোমান্টিক আর্ট আমাদের শিখিয়েছে বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি দাস্যভাব থেকে মুক্ত হ'তে; তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের রচনায় আমরা দেখেছি, কেমন ক'রে কবির চিত্তে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমান্তরেখা ভেঙে যায়, সব বিপরীত অন্বিষ্ট হ'য়ে ওঠে, কবি আমাদের জন্য জয় ক'রে আনেন অজানাকে—যে-জয়ের উল্লাসে বোদলেয়ার অনুভব করেছিলেন এমন সব গন্ধ, যার কোনোটি 'শিশুর মাংসের মতো সতেজ', কোনোটি 'মুরজনিস্বনের মতো কোমল,' কোনোটি বা 'প্রান্তরের মতো সবুজ,' আর এমন সব প্রতিধ্বনি যা 'রাত্রি ও স্বচ্ছতার মতো' বিশাল। বোদলেয়ার-এর এই কবিতা লেখা না-হ'লে বালক-র‍্যাঁবো বলতে পারতেন না যে কবির পক্ষে দ্রষ্টা হবার উপায়ই হ'লো 'ইন্দ্রিয়সমূহের সুচিন্তিত বিশৃঙ্খলাসাধন', কিংবা রিলকে অর্ফিয়ুসের গীতধ্বনিতে 'দেখতে' পেতেন না কানের মধ্যে আরুহ্যমাণ এক অটবীকে। কালিদাস থেকে, কালিদাসের জগৎ থেকে বহু দূরে চ'লে এসেছি আমরা। বহু দূরে, কিন্তু এই পর্যটন ব্যর্থ হয়নি আমাদের: পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলির সাহায্যে আমরা এখন আরো জোর দিয়ে বলতে পারি যে কবি যেখানে সবচেয়ে বড়ো সেখানে তিনি আবিষ্কারক, অনুসন্ধানী, সেতুনির্মাতা; আমাদের মানস-জগতে নতুন-নতুন রাজ্য তিনি যোজনা করেন; দূর ও নিকট, দৃশ্য ও অদৃশ্য, অতীত ও বর্তমান—এই সব প্রথাসিদ্ধ ভেদ ঘুচিয়ে দেন। কিন্তু কালিদাস বিষয়ে উচ্চতম কথা যা বলা যায় তা এই যে তিনি একটি ঐতিহ্যকে তার পূর্ণতম পরিণতি দান করেছেন, তাকে নিয়ে গেছেন সমৃদ্ধির চরমে।

৭

এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে ক্লাসিক সাহিত্যের একান্ত প্রতিভূ য়োরোপে যেমন হোমর নন, ভার্জিল, ভারতে তেমনি বাল্মীকি নন, কালিদাস। রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে—অতএব রচনারীতিতে—প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ স্বীকৃতিকে আমরা বলতে পারি ক্লাসিক মানসের একটি প্রধান লক্ষণ; অতএব ক্লাসিক সাহিত্যের প্রধান একটি লক্ষণ হ'লো—দুর্বোধ্যতার অভাব। অন্য শব্দের অভাবে

'দুর্বোধ্যতা' লিখলাম ; যে-গুণটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি, ইংরেজি 'obscure' শব্দের আক্ষরিক অর্থে তার ইঙ্গিত আছে। কবিতার কাছে আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা এই যে তার একটি অংশ হবে অন্ধকার—'obscure' —যাকে আমরা কখনো 'বুঝে উঠতে' পারবো না ব'লেই যাতে আমাদের আনন্দ কখনো নিঃশেষ হবে না। এবং আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সেই কবিরাই যাঁরা কোনো-না-কোনো অর্থে বিদ্রোহী—যাঁদের তালিকা দীর্ঘ ও বহুযুগব্যাপী, এবং যাঁদের মধ্যে আছেন শেক্সপীয়র, ব্লেক, হোল্ডার্লিন, বোদলেয়ার রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস্‌-এর মতো আপাতপ্রাঞ্জল কবিগণ। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীতে, প্রাঞ্জল হ'লেও দুর্বোধ : 'প্রদীপ ভেসে গেলো অকারণে' ব্যাকরণের হিশেবে অতিশয় সরল ; কিন্তু এর অর্থ কী বা কতখানি, আমরা যেন সারা জীবন চিন্তা ক'রেও তার কূল পাবো না। 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকে মরণোন্মুখ ক্লিওপ্যাট্রা যখন বলে, 'Dost thou not see this baby at my breast/That sucks the nurse asleep ?' —তখন এই নিঃসন্তান রাজ্ঞীর মুখে 'baby' শব্দ প্রথমে একটি বিস্ময় জাগায়, তারপর অনেকগুলো তথ্যের উপর শিকারি পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন: ক্লিওপ্যাট্রার বক্ষোলগ্ন বিষধর পতঙ্গ, তার হৃদয়ে অ্যান্টনির স্মৃতি, তার অনির্বাণ প্রেম—এই সবই একসূত্রে গাঁথা হ'য়ে যায়। 'O rose, thou art sick !', 'That dolphin-torn, that gong-tormented sea', 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো/বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো'—এই ধরনের বহু পংক্তি বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যায় যে কবিতার 'অর্থ' কৌটোর মধ্যে মুক্তোর মতো একটি নিশ্চল ও নির্দিষ্ট পদার্থ নয়, তা একটা বেগ, গতির বেগ, যা শব্দগুলোকে দূরে কাছে নিশেনের মতো উড়িয়ে দেয়, যাদের ইশারায় মন তার শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে দূর থেকে দূরতরের দিকে চলতে থাকে। অনেক রাত্রে ঠাণ্ডা আকাশে যখন খণ্ড চাঁদ ওঠে—কিংবা যখন ঝোড়ো শ্রাবণ পূর্ণিমাকে মেঘে ঢেকে দেয়—তখনকার সেই ছায়াভরা জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর নগর, প্রান্তর ও কানন যেমন রূপান্তরিত হয়, চেনাকে মনে হয় অচেনা, দূরকে মনে হয় সংলগ্ন, গহ্বর, শিখর ও নীলিমা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়,—এই সব কবিদের রচনাও তেমনি ক'রেই ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়কে ধারণ

করে; এই আলো-আঁধারিকেই আমরা আধুনিক কালে কবিতার প্রধান গুণ ব'লে জেনেছি—এটাই আসল, এটাই সব—এই গুণটি থাকলে কবির হাতে কবিতা শেষ হ'লেও পাঠকের পক্ষে তা নিঃশেষ হয় না।

আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্বন্ধটি একটু অদ্ভুত। যা আমরা একেবারেই বুঝি না তাতে আমরা আনন্দ পাই না; যা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝে ফেলি তাতেও আমরা আনন্দ পাই না। এখন কালিদাসের কবিতা দুরূহ হ'তে পারে, কিন্তু দুর্বোধ নয়; তাঁর অনুশীলন শ্রমসাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু সেই শ্রম এক জায়গায় এসে থামতে বাধ্য। শেক্সপীয়র বা অন্য কোনো রোমান্টিকের কাব্য বিষয়ে সমালোচকেরা যা লিখেছেন, তা পাঠ করলে আমরা সেই-সেই কাব্য কিছুটা, হয়তো অনেকটা ভালোভাবে বুঝতে পারি; তবু শেষ পর্যন্ত কিছু বাকি থেকে যায়—কীটসের সেই 'fine excess'—যার মুখে ছায়ায় ঘোমটা মাঝে-মাঝে ন'ড়ে উঠলেও কখনোই একেবারে স'রে যায় না। কিন্তু 'মেঘদূত' কাব্যটিকে, মল্লিনাথের ও অন্যান্য টীকার সাহায্যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারি, একটি কণাও বাইরে প'ড়ে থাকে না, অর্থ ও ব্যঞ্জনার শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে নিতে পারি তা থেকে। একটি শ্লোকে একাধিক অর্থ যদি থাকে, তার প্রতিটি অর্থই সুনির্ণেয়; তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা বহু অস্পষ্ট সম্ভাবনার সূত্রে আমাদের মনকে ক্ষণে-ক্ষণে উত্তেজিত ক'রে তুলতে পারে। এদিক থেকে 'মেঘদূতে'র—এবং সাধারণভাবে সংস্কৃত কবিতার—সীমাবদ্ধ চরিত্র স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

অথচ এ-কথাও সত্য যে 'মেঘদূত' সংস্কৃত ভাষার সেই একটি কাব্য যা আমরা পৌনঃপুনিকভাবে পাঠ করতে প্রস্তুত ও উৎসুক, যার বহু অংশকে আমরা স্মরণের অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েছি, এবং যাতে—নতুন আবিষ্কারের অবকাশ না-থাকলেও—আমরা বার-বার নতুন ক'রে আনন্দ পাই। তার মানে, 'মেঘদূতে'র অর্থ আমাদের করতলগত হ'লেও তার মধ্যে অন্য দিক থেকে কিছু-একটা উদ্বৃত্ত থাকে, যার আকর্ষণ অফুরন্ত। এই উদ্বৃত্ত 'মেঘদূতে'র ভাবনা নয়—ভাবনায় একে গভীর বলা যায় না; তার দূরস্পর্শী ইঙ্গিত নয়—সে-রকম ইঙ্গিত নেই এতে; এমনকি তার চিত্ররূপময় বর্ণনাও নয়, কেননা এই বর্ণনা গদ্যে লেখা হ'লে আমাদের ক্লান্তি আসতো।

'মেঘদূতে'র ছন্দ, ধ্বনি, আমাদের শ্রবণে ও স্নায়ুতন্ত্রীতে তার আবেদন, এবং তার গতিধর্ম, আভ্যন্তরীণ নাটকীয় ক্রিয়া, যা নিয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি—এই দুটি লক্ষণকে আমি উদ্বৃত্ত ব'লে অভিহিত করবো, যা কাব্যটিকে অক্ষয়ভাবে নতুন ক'রে রেখেছে। ছন্দের গম্ভীর আন্দোলন, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের সুনিয়ন্ত্রিত কল্লোল, অনুপ্রাসের অপ্রকট সৌষম্য, দীর্ঘ সমাসের বিরলতা—এই লক্ষণগুলিতে 'মেঘদূত' হ'য়ে আছে আবৃত্তিযোগ্য, পুনরাবৃত্তিযোগ্য, উচ্চারণের পক্ষে পরম অনুকূল। এর প্রতিদ্বন্দ্বী অংশ 'রঘুবংশে' বা 'কুমারসম্ভবে' পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কালিদাস অন্য কোথাও মন্দাক্রান্তা ব্যবহার করেননি, কিংবা অন্য কোনো সংস্কৃত কাব্য, শুধুমাত্র তার ধ্বনির দ্বারা, এমন আবেশের সৃষ্টি করতে পারে না। আমি জানি, ধ্বনি প্রকৃতপক্ষে অর্থের প্রতিধ্বনি হ'তে পারে না, আমাদের অজানা ভাষার কবিতায় ধ্বনিবিন্যাসে যত চাতুরী থাক তা থেকে কোনো সংবাদই নিতে পারবো না আমরা, এবং কাব্যের দিক থেকে নিছক শ্রবণসুভগতার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু 'মেঘদূতে' আরো কিছু বেশি পাওয়া যায়; ঢেউয়ের পর ঢেউ, তার মন্দাক্রান্তা যখন আমাদের কান ও মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, তখন আমরা ধীরে-ধীরে আক্ষরিক অর্থে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি—কবিতা আর মন্ত্র যখন অভিন্ন ছিলো, যখন ডাইনি-পুরুতের অর্থহীন ও ছন্দোবদ্ধ প্রলাপই ছিলো কবিতা—সেই অতি দূর অতীতের স্মৃতি অবচেতনায় হানা দেয় যেন। 'মেঘদূত' অর্থহীন নয়, কিন্তু তার যে-সব শ্লোক আমরা স্মরণীয় ব'লে স্বীকার করি, অনেক সময় তাদের অর্থ অতি সাধারণ—এমনকি তুচ্ছ। তুচ্ছকে গম্ভীরভাবে প্রকাশ করলে, ফল সাধারণত হাস্যকর বা হাস্যজনক হয়; কিন্তু 'মেঘদূতে' উল্টোটা দেখতে পাই; সেখানে ধ্বনির গৌরবে তুচ্ছ হ'য়ে ওঠে শ্লাঘনীয়।

> প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী (পৃ ৪)
> দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং (পৃ ৩১)
> বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ (পৃ ২৯)।

—এরা এক-একটি পদ বা পংক্তি হ'লেও বাক্য নয়, কোনোটিতেই সম্পূর্ণ কোনো অর্থ বা চিত্র নেই, এবং সমগ্র শ্লোকসমূহে যা বলা হয়েছে তাও

আমাদের ভাবনায় বা কল্পনায় কোনো উত্তেজনা এনে দেয় না। অথচ এই পংক্তি, এবং শ্লোক তিনটি—সমগ্রভাবে 'শ্রোত্রপেয়' 'মেঘদূতে'র মধ্যেও—বিশিষ্টভাবে দাবি করে, শুধু আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়কে নয়, আমাদের স্নায়ুতন্ত্রী-সমন্বিত চৈতন্যকে। এ যেন সেই পংক্তি, যা আমাদের দেহকে রোমাঞ্চিত ক'রেই চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে পারে, যার কোনো আধেয়বস্তুর আর প্রয়োজন নেই—সেই পংক্তি, যাকে হয়তো আমরা মালার্মের ভাষায় বলতে পারি 'শূন্য, একতাল ও ধ্বনিময়।'

বাড়ি

পরমেশ ধর

ইস্পাতের কাঠামোটা ঋজু। দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ।
বাড়ি হবে। ঘরে-ঘরে স্থগন্ধের ধূপ
জলবে প্রত্যহ।
আপাতত সিমেন্ট ইস্পাত ইট বালির বিমর্ষ স্তূপ,
এখানে-ওখানে আঁকা রিভেটের বৃত্তের আল্পনা—
সব ঢাকা প'ড়ে যাবে। এ-বাড়ির ছেলে-বুড়ো
ছাদে যত কাকের আস্তানা
জানবে না কোথায় ইস্পাত আছে কতখানি এর গাঁথা ইটে;
কিংবা এক : দুই : চার মিশ্রণে সুদৃঢ় কংক্রীটে
কোথায় গোপনে জমে তিলে-তিলে শক্তির সঞ্চয়।

কিন্তু তা-ই শেষ কথা নয়,
এই বাড়ি এ-ঘর আমার কোণে সজনের ডাল,
নিরিবিলি বারান্দায় আমের আড়ালে কত
বহুরূপী মেঘের সকাল;
পিয়নের আনাগোনা, মিঠুদের টিপসি কুকুর,
প্রতিবেশী ছেলেটির সেতারের একনিষ্ঠ স্থর,
অন্দরের খিটিমিটি, বাতাসে পরদার কথাকলি,
দেয়ালে, জোৎস্নায় আঁকা, পাতার ছায়ার নামাবলী,
পাড়ার প্রবাসী বন্ধু মুখে হাসি প্রিয় কত দ্বিধাহীন স্নেহ,
সিঁড়িতে টবের ফুল, রংচটা কুশনের পরিচিত দেহ,
সব মিশে একাকার—ডাকে এসো,—বলে চলো বাড়ি।
রাস্তার মোড়ের লাল আলো :
টাঙ্গা রিক্সা পেট্রলের গাড়ি
সবাই থমকে আছে হৃৎপিণ্ডে সদাই অস্থির
এক আর্তি।

পার হয়ে লাল আলোয় নিষেধের অদৃশ্য প্রাচীর
আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে যাবো সব যেন এক কেন্দ্রের সমীপে,
দ্বন্দ্বের সমুদ্র ভেঙে পরিচিত মমতার দ্বীপে।
ছোটো বড়ো কেরানিরা ; ফিরপোর বাহুলগ্না নটী,
বেশ্যার উত্তপ্ত স্পর্শ (কী সুন্দর ক্ষীণ তার কটি !)
ঠাণ্ডা হলে বেসামাল সেই ছেলে ফিরবে সবাই ঘরে,
মাটির কুঁজোর মুখ নিচু ক'রে
দারুণ গ্রীষ্মের ভোরে ঢালবে তৃষ্ণার জল।

জানি এই চুন বালি ইট কাঠে বাড়ির বক্কল
খ'সে যেতে পারে ;
ভূমিকম্পে ঝ'রে যেতে পারে কোনোদিন,
বাতাসের বুক চিরে থাকবে যখন ক'টি
ইস্পাতের সুদৃঢ় সঙিন।

দুটি কবিতা

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

বাদুড়

পাখিদের সগোত্র সে নয়, তাই সামাজিক কিচিরমিচিরে
সে থাকে না। পশুদেরও অনাত্মীয়, তাদের দরবারে
তার কোনো আরজি নেই, তাকে নিয়ে সকালে বিকালে
কারো চাপা কানাঘুষো কখনো শুনিনি। এ সংসারে
সে বিবিক্ত, অতিরিক্ত, যার প্রয়োজনের বালাই
তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে কবে ভূচর, খেচর।

অথচ রাত্রিতে তার ডানা ছোঁয় ভৌতিক আকাশ।
অন্ধকারে জড়োসড়ো শাখামৃগ, পাখিরা বাসায়।
কিন্তু সে অভীক, তীক্ষ্ণ চোখে চেনে গোল ছাতিমের
তলে গূঢ় কবন্ধকে—বন্ধুত্বের উষ্ণতায় মুহূর্ত-তন্ময়।
পরক্ষণে প্রতিপক্ষ সংসারের ঘুম ভেঙে দিয়ে
সে শোনায় : পারো যদি পাল্লা দাও এসে।

তারপর চন্দ্রাহত যুবকের মতো দিশেহারা
ভেসে চলে রাত্রির সাম্রাজ্যে স্বৈর, মাতাল, উড্ডীন,
বাতাসের সিঁড়ি ভেঙে মেঘের শরীর বুঝি ছোঁবে,

সপ্তর্ষির সমাবেশে ছুঁড়ে দেবে ডানার ঝাটপট,···
হঠাৎ কী ভেবে থামে কুতবের কার্নিশের ধারে,
নিচে দেখে : সংসার অনতিব্যক্ত, কী নরম ঘুমে
ঢেকে রাখে পশুদের, পাখিদের। সে কেবল জেগে।

পুনর্ভবাসু

বিকেলবেলা চায়ের জোগান দিতে
দেখে এলাম তোমার চোখে সেদিন
সঞ্চারিত পাখির ডানার বেগ,
আনন্দিত, স্বাধীন।

অথচ এই বিকেলবেলার আকাশ
ক'দিন আগে যেত কেবল ব'কে,
টনটনিয়ে উঠত বুকের পাঁজর
স্মৃতির সুখে, শোকে।

মাঘের শেষে একপশলা যেন
ধুইয়ে দিল তোমার চরিত্র,
সোনালি রোদ, রক্ত মাদার-ডাল,
বসন্তের চিত্রবিচিত্র।

এখন তুমি আবার ঘন হও,
আমার মুখে ফুটুক স্বাদু প্রলাপ,
সময় হোলো—এবার দিতে পারি
বৃষ্টিভেজা একটি শাদা গোলাপ।

আকাশে তখন কান্না

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

ললাটে দীক্ষার ধুলো, দুর্ভিক্ষে কৃপণ ভিক্ষা সে-নারীর মুখ,
বুকের শ্মশানে তার ক্লান্তি নেই, ধারণের অধৈর্য আগুন
লীলায়িত ; মৌন শূন্যে শায়িত হাতের ক্লান্ত শঙ্খচূড় ফণা
কঠিন কারুণ্যে স্থির, প্রয়োজন—দু'চোখের নিষ্ঠুর চাওয়ায় !

যে এলো শিয়রে তার ভয়ে-ভয়ে কামনার শবদেহ নিয়ে,
সমস্ত ফুলের রাজ্য পায়ে-পায়ে প্রদক্ষিণ ক'রেও সে-লোক
দেখেনি ঘ্রাণের মুখ, গানের অস্থির প্রশ্নে কোকিল যৌবন
পায়নি উত্তর কোনো বসন্তের, কোনো নদী পায়নি তৃষ্ণায় ।

যে-সামান্য মুদ্রা তার সংকোচে ইন্ধন হলো আবিল অনলে—
তারই বুকে সে যখন ঘনিষ্ঠে আতুর হয় তখনো, এবং
যখন শ্মশান বাহু টেনে নেয় আরো কাছে তখনো বোঝেনি :
শব নয়, কামনার সত্যবান ধ্যানের গভীরে ছিল বেঁচে ।

যখন একান্তে লীন সে-নারীর ঊর্ধ্বশিখা বুকের শ্মশানে,
অঙ্গের আশ্লেষী জালা দগ্ধ করে মুক্ত মন, দেহের শিকড়,
তখনই সে-কামনায় ক্ষিপ্রবেগে জীবনের ধ্যানভঙ্গ মুনি
নেচে ওঠে—তখন জলেছে মন, ভুজঙ্গের দেহ ভেঙে গেছে ।

আকাশে তখন কান্না, বহু ব্যর্থ হরিণের সজল নয়ন,
ডালে-ডালে ঢ'লে-পড়া বাতাসের ভগ্নকণ্ঠে শোকের গুঞ্জন ।

রাত্রির হাতে

ইমামুর রশীদ

কিছুই হয় না বলা, শুধু চলা অন্ধ এক সুখে ।
সেও ভালো যদি এক পরিপূর্ণ রাত্রির হাতে
ধরা দিয়ে উপনীত হই কোনো পৃথিবীর প্রথম প্রভাতে
আদিম মন্ত্রের আলো সারা মুখে মেখে,
তাহলে হয়তো আমি এই কালো কুৎসিত আলোর
অন্ধকার গুহা থেকে মুক্ত হতে পারি সুনির্ভয়ে ॥

দুটি কবিতা

পাখির মতো

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

পাখির মতো ঘুরছে ছোটো ঘরে।
ভালোবাসা জানিয়ে ফিরে আসি।
নরম বুক ; ছোট্ট বাহু নেড়ে
আদর কাড়ে, এবং প্রতিবেশী।

ভাবা তো নয়। অবোধ ভালোবাসা।
যেন শিশির ডানার ছড়ানিতে
চমক দিয়ে ঝরিয়ে দেয়া ; ডালে
যা থাকে, তা হাওয়ার যাওয়া-আসা।

পাখির মতো ঘুরছে ছোটো ঘরে।
আমিও জানি পালক তুলে নিতে—
ধমকে-থাকা ভিড়ের অবসরে
আমার মুঠো নিবিড় ; জেনে আসি॥

পর্দা

তবুও কোথাও নির্ভুল বাধা থাকে।
অজাত প্রেমের অকরুণ অভ্যাসে
পর্দা ভরায় স্বাগত শূন্যতাকে—
হয়তো, যখন রোদ নেমেছিলো ঘাসে,···

হয়তো যখন ক্লান্তির পরপারে
যে তোমায় চায়, তারি ইচ্ছার রঙে
আকাশ ছেয়েছে নন্দিত বিভ্রমে—
ঋতু পুড়ে থাক সন্ধ্যার অঙ্গারে।

এক-হ'তে-চাওয়া, এক-না-হওয়ার গভীরে
শুধু দূরত্ব কাজ করে! আহা, আড়ালে
বৃথা আশ্লেষ আবর্তমান শরীরে—
পর্দায় বাধে আকাঙ্ক্ষা ; বাহু বাড়ালে॥

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

সিথেরায় যাত্রা

উড্ডীন পাখির মতো, মুক্তছন্দে উৎফুল্ল উত্তাল,
দড়িদড়া ছিন্ন ক'রে হৃদয় আমার ছুটে চলে,
দোলে নৌকা ক্ষণে-ক্ষণে রিক্তমেঘ আকাশের তলে,
যেন এক দেবদূত, রৌদ্রময় দিগন্তে মাতাল্।

দেখা যায় কোন দ্বীপ—কালো, আর বিষাদে মলিন?
—জানো না, সিথেরা ঐ, সেকালের শৌখিনের প্রিয়
মামুলি এলদোরাদো, গানে-গানে অবিস্মরণীয়।
কিন্তু যা-ই বলো, এই দেশ বড়ো ধূসর, শ্রীহীন।

—রহস্যে মধুর দ্বীপ, হৃদয়ের উজ্জ্বল উৎসব!
তার তটরেখা থেকে, যেন এক গন্ধের উচ্ছ্বাস,
ভেসে আসে সনাতন ভেনাসের দৃপ্ত প্রতিভাস,
ব্যাপ্ত করে আত্মায় আলস্য আর প্রেমের বৈভব।

সুন্দর, শ্যামল দ্বীপ পরিপূর্ণ পুষ্পিত বিতানে,
চিরকাল সর্বজাতি যার কাছে অর্ঘ্য নিয়ে যায়,
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস কেঁপে ওঠে তন্ময় পূজায়,
যেমন গন্ধের দোলা গোলাপের বিলোল বাগানে,

কিংবা যেন বনতলে কপোতের শাশ্বত কূজন!
—কিন্তু তা তো নয়! এ যে রুগ্ন এক বিশীর্ণ বিস্তার,
শিলাময় মরু, যাকে দীর্ণ করে কর্কশ চীৎকার।
অথচ অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখি! নয় সে মোহন

ছায়াময় কুঞ্জবনে পরিবৃত মন্দির, যেথায়
তন্বী এক পূজারিণী প্রেম দেয় ফুলের বিলাসে,
এবং গোপন তাপে দগ্ধতনু, ভ্রমে অনায়াসে
অর্ধেক উন্মুক্ত ক'রে বেশবাস চঞ্চল হাওয়ায় ;

যখন আসন্ন তীর, উপকূলে তরী প্রতিহত,
ধবল পালের পটে নাড়ে ডানা ব্যাকুল পাখিরা,
দেখি এক ফাঁসিকাষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, সুদীর্ঘ, ত্রিশিরা,
আকাশেরে দীর্ণ করে উদাসীন সাইপ্রেসের মতো।

ঝুলে আছে শব, তাতে শকুনেরা পংক্তিভোজে ব'সে
হিংস্র বেগে ছিঁড়ে নেয় পক্ব মাংস, রক্তমেদে মাখা,
শটিত পুঞ্জের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ, কদর্য শলাকা,
হানে চঞ্চু অবিরাম, প্রত্যেকেই, নিষ্ঠুর আক্রোশে ;

চক্ষু দুই ছিদ্র তার, বিধ্বস্ত উদর থেকে খ'সে
পরিপুষ্ট অন্ত্রতন্ত্র উরুপ্রান্তে গড়ায় সচ্ছল,
এ-জঘন্য নিমন্ত্রণে পরিতৃপ্ত ঘাতকের দল
চঞ্চুর আঘাতে তাকে নপুংসক করেছে নিঃশেষে।

এদিকে, মঞ্চের তলে, ঊর্ধ্বমুখ, ক্ষুধায় উন্মাদ,
হিংসুক জন্তুর পাল শান্তিহীন ফেরে পাকে-পাকে,
সে-বিক্ষুব্ধ জনতায় সবচেয়ে বড়ো যে, সেটাকে
মনে হয় অনুচরে পরিবৃত ভীষণ জল্লাদ।

সিথেরার পুত্র, যার জন্ম এই স্বচ্ছ নীলিমায়,
পুরাতন অনাচারে যুগান্তের সঞ্চিত দুর্নাম
এবং নিষিদ্ধ পাপ—তুমি তার দিয়ে গেলে দাম
মরণের পরপারে বাক্যহীন অবমাননায়।

অপহত হাস্যকর, তোর কষ্টে আমি-যে তন্ময়!
জেনেছি, বিচ্ছিন্ন তোর প্রত্যঙ্গের দেখে নিপাতন—
আদন্তবিস্তৃত যেন ন্যক্কারের পুনরাহোরণ—
অনাদি দুঃখের ধারা, দীর্ঘায়িত, পিত্তবিষময়।

স্মরণের বরণীয় রে পাতকী, তোর কাছে এসে
মনে জাগে অনেক চঞ্চুর বেগ, কঠিন চোয়াল—
যে-সব সুতীক্ষ্ণ শ্যেন, আর কালো শ্বাপদের পাল
একদা আমার মাংস চূর্ণ করেছিলো ভালোবেসে।

—মনোরম নভোতল, নির্বিকার সিন্ধুর নীলিমা ;
কিন্তু সব অন্ধকার, রক্তমাখা আমার নয়নে,
হায়! যেন ঢেকে দেয় কাফনের ঘন আচ্ছাদনে
আমার চিত্তেরে এই রূপকের নিবিড় কালিমা।

ভেনাস, তোমার দ্বীপে শুধু এই প্রতীক প্রোথিত,
ফাঁসিকাষ্ঠে পচা মড়া—চিত্রকল্প ঝোলে সে আমারই।
—ভগবান, দাও সেই শক্তি ও সাহস, যাতে পারি
দেখে নিতে আমার শরীর-মন, বিতৃষ্ণাব্যতীত।

শয়তান-স্তোত্র

হে তুমি, দেবদূত, জ্ঞানীর শিরোমণি, রূপের নেই যার তুলনা,
দেবতা, যার ভাগে জোটে না বন্দনা, নিয়তি দেয় শুধু ছলনা,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!

রাজ্যহারাদের হে যুবরাজ, তুমি সয়েছো অন্যায় অপমান,
এবং হেরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়েছো নতুন তেজে আরো বলীয়ান,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!

যে-তুমি রসাতলে বিরাজো মহীপাল, কিছুই নেই যার অজানা,
বৈদ্য পরিচিত, জীবন-দুর্ভোগে আনো আরোগ্যের ঠিকানা,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি সমতায় বিলাও বর, একই রতির লিপ্সায় পেতে ফাঁদ,
অধম চণ্ডাল, কুষ্ঠরোগীকেও ক্ষণিক স্বর্গের আস্বাদ,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

মরণ, যে তোমার বৃদ্ধা প্রণয়িণী, অথচ ক্ষমতায় দুর্জয়,
জন্ম দিলে তার গর্ভে আশা, যার মোহন মূঢ়তার নেই ক্ষয় !

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যখন ফাঁসিকাঠ তৈরি, জমে ভিড়, যে-তুমি আসামির দৃষ্টি,
শান্ত নির্ভয়ে জালিয়ে, অভিশাপ করে সে-জনতায় বৃষ্টি,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যাপ্ত বসুধায়, যে-তুমি জানো সব সন্ধান,
রত্নমণি কোন গহন অগোচরে লুকিয়ে রেখেছেন ভগবান,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

দীপ্ত চোখ ফেলে যে-তুমি দেখে নাও গভীর সেই সব ভাণ্ডার,
সুপ্ত রয় যেথা কবরে সমাহিত ধাতুর বহুরূপী সম্ভার,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

এড়িয়ে গহ্বর, বিশাল হাতে তুমি তাদেরও নিয়ে যাও চালিয়ে,
স্বপ্নে, ঘুমে যারা ছাদের কার্নিশে বেড়াতে চ'লে আসে পালিয়ে,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি মাতালের অবশ বুড়ো হাড়ে নম্য করো জাদুবিদ্যায়
যখন রাজপথে ঘোড়ার খুর তাকে মাড়িয়ে দিয়ে বুঝি চ'লে যায়—

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

মানুষ ক্ষীণ আর দুঃখী ব'লে, তাকে পরম সান্ত্বনা জানাতে
লবণ গন্ধক মিশিয়ে কৌশলে শেখালে গোলাগুলি বানাতে,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি বেছে নাও কুবের যত আছে করুণাহীন আর ঘৃণ্য,
ললাটে এঁকে দিতে, হে কূট সহযোগী, তোমার তিলকের চিহ্ন,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি মেয়েদের নয়ন আর মন এমন ক'রে পারো জাগাতে,
নিছক জঞ্জালে বিলিয়ে ভালোবাসা, আরতি করে তারা আঘাতে—

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে।

বাস্তুহারাদের যষ্টি তুমি, আর আবিষ্কারকের দীপালোক,
ফাঁসিতে ঝোলে ষড়যন্ত্রী যারা, হয় তোমার মন্ত্রেই বীতশোক,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে।

সকলে তারা মানে তোমাকে পিতা ব'লে, যাদের স্বর্গের উদ্যান,
অন্ধ আক্রোশে পৃথিবী পার ক'রে দিলেন আদি পিতা ভগবান,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে।

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৩

প্রার্থনা

ধন্য হোক নাম তোমার, শয়তান, ধন্য আকাশের শিখরে
যেখানে ছিলে তুমি রাজার মতো, আর এখন নরকের বিবরে
স্বপ্ন ত্মাখো নিঃশব্দে, পরাজিত, ধন্য সেখানেও হোক নাম!
আমার আত্মাকে এ-বর দাও, যেন সেখানে হয় তার বিশ্রাম,
যেখানে জ্ঞানতরু তোমাকে ছায়া দেয়, এবং উন্নত, গম্ভীর
তোমার ডালে আমি ছড়াই ডালপালা নতুন যেন এক মন্দির।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

লেখকদের বিষয়ে

* **ইমামুর রশীদ** তরুণ লেখক, পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন। * **পরমেশ ধর** শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। **পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য** ত্রিপুরায় আগরতলা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক, সম্প্রতি একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। **বুদ্ধদেব বসু**-র 'মেঘদূত'-অনুবাদ এম. সি. সরকার গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন; এই সংখ্যার প্রবন্ধ সেই গ্রন্থেরই ভূমিকা।

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ। কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।

KAVITA

(Poetry)

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1.50

Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE

Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Navana Printing Works Private Ltd., 47 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13

KAVITA—Vol. 21, No. 3, 1957

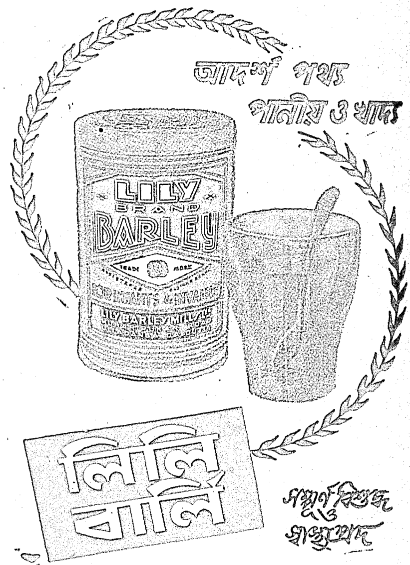

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ,—কলিকাতা-৪

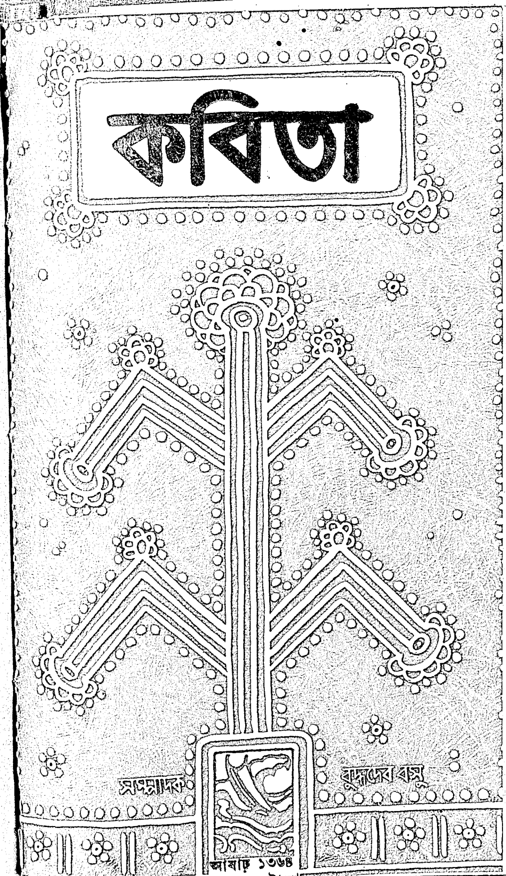

কবিতা

বর্ষ ২০

ও

বর্ষ ২১-এর

সম্পূর্ণ সেট

এখনো পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সেট চার টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাষিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন; নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) **উইকূলী ওয়েষ্ট বেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র—বার্ষিক ৬ টাকা ; ষাণ্মাসিক ৩ টাকা।

(২) **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা।

(৩) **বসুন্ধরা**—গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) **স্বাস্থ্যশ্রী**—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টিবিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা।

(৫) **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা।

(৬) **মগবেরী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয় ;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই ;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার-অধিকর্তার নিকট লিখুন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহাসিনী

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসিতামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।

॥ রবীন্দ্রনাথ প্রহাসিনীর সূচনা

'হালকা হাসি'র অনেকগুলি কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

ধূমকেতু মাঝে মাঝে	অটোগ্রাফ
আধুনিকা	মাল্যতত্ত্ব
নারীপ্রগতি	পত্র
রঙ্গ	নাতবৌ
পরিণয়মঙ্গল	মিষ্টান্বিতা
ভাইদ্বিতীয়া	নামকরণ
ভোজনবীর	ধ্যানভঙ্গ
অপাক-বিপাক	রেলেটিভিটি
গরঠিকানি	নারীর কর্তব্য
অনাদৃতা লেখনী	মধুসন্ধায়ী
পলাতকা	মাছিতত্ত্ব
কাপুরুষ	কালান্তর
গৌড়ী রীতি	তুমি

মূল্য দুই টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

প্রত্যহ প্রাতে
নিম টুথপেস্ট
ব্যবহার করলে সারা-
জীবন দাঁতগুলি নির্দোষ
ও মাঢ়ী সুস্থ থাকবে

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

'নাভানা'র বই

কঙ্কাবতী
বুদ্ধদেব বসু
তিন টাকা

'কংকাবতী' চিরনতুন প্রেমের কাব্য। আবেগের গভীরতায়, অনুভবের সমগ্রতায়, ছন্দ-মিলের সম্মোহনে 'কংকাবতী'র উপভোগ্যতা অফুরন্ত। কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি এমন কয়েকটি নতুন কবিতা এবং কবির বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'পৃথিবীর পথে'র বিশিষ্ট কবিতাগুলি 'কংকাবতী'র নতুন নাভানা-সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে ॥ ৩.০০ টাকা ॥

গড় শ্রীখণ্ড
অমিয়ভূষণ মজুমদার
আট টাকা

'গড় শ্রীখণ্ড' উত্তরবঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চলের নাম। 'গড় শ্রীখণ্ড'র মাটির নিচে সোনার খনি নেই—সেখানকার চাষীরা দেহের রক্ত ও মনের রস নিঙড়ে দিয়ে সোনা ফলায়।...বৃহৎ উপন্যাসের অন্তঃপর্বটি যেন যুগসন্ধির জীবন-জিজ্ঞাসার নির্ভুল জবাব। বিশাল পটভূমিতে বাংলার গণজীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও মহৎ উপন্যাস ॥ ৮.০০ টাকা ॥

বসন্তপঞ্চম
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
আড়াই টাকা

প্রেমের বিচিত্র লীলায় অধ্যাপিকা সুমিতা, পুরীর মনোমোহন হোটেলের কমলা দেবী, হেডমিস্ট্রেস অনীতা সেন আর বস্তির মেয়ে বকুল—সকলেই যেন বিভিন্ন মিশ্র রাগের বিমূর্ত মূর্ছনা। বাংলা ছোটোগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে একজন প্রধান শিল্পী 'বসন্ত-পঞ্চম'-এর গল্পগুচ্ছ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ॥ ২.৫০ টাকা ॥

নাভানা
॥ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

অগুরু

ভারতের সুপ্রাচীন সুগন্ধি, গন্ধমাধুর্যে স্থায়িত্বে ও সুলভতায় বিবিধ গন্ধদ্রব্যের মধ্যে অতুলনীয়। অগুরুবাসিত কেশবেশ দেহ-মন স্নিগ্ধ ও প্রফুল্লিত করে।

অগুরু অননুকরণীয়

নিত্য ব্যবহারে, উৎসবে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, পৌরসভায়, অগুরু অপরিহার্য।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

প্রতিভা বসু
সম্পাদিত
কবিতাভবনের
বার্ষিকী

বৈশাখী

১৩৬২ সংখ্যা
দুই টাকা

১৩৬৪ সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও
প্রবন্ধের সংগ্রহ

(মাশুল স্বতন্ত্র)

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

কালিদাসের মেঘদূত

এই গ্রন্থে মূল সংস্কৃত পাঠের সংলগ্ন পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব বসু-র পদ্য অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে, যার স্বাদ মূলের তুলনায় 'অল্পমাত্র ন্যূন'। ৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃত কবিতার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী টীকায় বহু মনোজ্ঞ তথ্য ও মন্তব্য একত্র করেছেন। এ ছাড়া সন্নিবেশিত হয়েছে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ১৮টি নিদর্শন, এবং সে-সব চিত্র বিষয়ে আলোচনা। এই গ্রন্থে পাঠক লাভ করবেন—শুধু নতুন ক'রে কালিদাসকে নয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি বিষয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি।

মনোরম রেক্সিনে বাঁধাই। সাড়ে-পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

* **কমলেশ চক্রবর্তী** কলকাতার বাইরে থাকেন, ইতিপূর্বে অন্যান্য পত্রিকায় এঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। **জীবনানন্দ দাশ**-এর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নতুন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন সিগনেট প্রেস। * **দেবতোষ বসু** তরুণ লেখক, কলকাতায় থাকেন। **প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পড়ছেন, সম্প্রতি 'এক ঋতু' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। * **প্রদ্যুম্ন মিত্র** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। **বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়** পুরুলিয়ায় শিক্ষকতা করেন, এঁর, কবিতা 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫০-এ। **বিশ্ব চন্দ্যোপাধ্যায়**-এর প্রথম উপন্যাস 'চলোর্মি সফেন' প্রকাশের অপেক্ষা করছে। **বুদ্ধদেব বসু**-র 'কালিদাসের মেঘদূত' এম. সি. সরকার থেকে প্রকাশিত হ'লো। **রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী** হুগলি মহসীন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। **শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়** ইতিপূর্বে 'নমিতা মুখোপাধ্যায়' ছদ্মনামে 'কবিতা' ও অন্যান্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করেছেন। **সুনীল সরকার** বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। **সন্তোষ প্রতিহার** মেদিনীপুর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক; 'কবিতা'র নবম বর্ষে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' ও বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী'র সমালোচনা লিখেছিলেন।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৪

একবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৯০

সনেট

বিষ্ণু দে

যেই দূরে যাও ওঠে বিচ্ছেদের অতল অপার
বঙ্গোপসাগরে ঢেউ, যেন নিত্য মাঘী পূর্ণিমার ;
আমার মুহূর্ত ঘণ্টা দিন কিংবা রাতে বারবার
অতলান্ত উপমায় তোলে মৌন নীল হাহাকার ;
কিংবা যদি আসে কিছু অন্যমনা বিপ্রলব্ধ বাধা
কিংবা কোনো মনান্তরে অমাবস্যা কালিন্দীতে আধা
বিশ্বব্যাপী হতাশার ত্রিকালজ্ঞ মরা অন্ধকার,
তখনই প্রশান্ত বিশ্ব বালিতে উপলে পাড়-বাঁধা
ডুবে যায়, ভেঙে যায়, ডেকে আনে অন্তিম জোয়ার।

তারপরে সূর্যোদয়, পূর্বদেশে পাণ্ডুর রক্তিমা,
তারপরে শিথিল সকালে শুভ্র তোমার মহিমা,
তারপরে শান্ত স্থির আরোগ্যে বিস্তীর্ণ তটসীমা :
বিচ্ছেদে অভ্যস্ত আমি, বাংলায় কোথা মালাবার ?
প্রশ্ন শুধু কেন বারবার এই মূঢ় হিরোশিমা ?

দুটি কবিতা

আমি

জীবনানন্দ দাশ

রাতের বাতাস আসে
আকাশের নক্ষত্রগুলো জলন্ত হয়ে ওঠে
যেন কাকে ভালোবেসেছিলাম—
তখন মানবসমাজের দিনগুলো ছিল মিশরনীলিমার মতো

তার তৎপর হাত জেগে রয়েছে স্বষ্টির
অনাদি অগ্নিউৎসের প্রথম অনলের কাছে আজো
সমস্ত শরীর আকাশ রাত্রি নক্ষত্র-উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাই
আমি টের পাই সেই নগ্ন হাতের গন্ধের
সেই মহানুভব অনিঃশেষ আগুনের
রাতের বাতাসে শিখানীলাভ এই মানবহৃদয়ের
সেই অপর মানবীকে।

সমস্ত নীলিমা—সময়—প্রেম কী উদার অনলসংঘর্ষময়ী বাসনা
মহনীয় অগ্নিপরিধির অন্তহীন কারুশিল্পসংগীতে লীন,
সেই নারীর গুঞ্জরণ শুনছি আমি
আমার গানে হৃদয় বিকম্পিত হয়ে উঠছে তার,
কোথাও মৃত্যু নেই—বিরহ নেই
প্রেম সেতুর থেকে সেতুলোকে—
চলছে—জলছে হ্যাথ। এল আলো
গতির গলিতশরীরী আগুনের;

কোথাও প্রয়াণের শেষ নেই—আমি গতিবহ্নি হে তপতীলোক
হে অন্ধকার
হে বিরাট অন্তরীক্ষ অগ্নি।

রচনাকাল: ১৩৫৪
কবিকর্তৃক পরে ঈষৎ পরিবর্তিত

চিঠি এল

কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার:
এই সকাল-বেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি-কোটি সহচরী
তিমি-র পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে প'ড়ে
নটরাজ্ঞীদের মতো
মহান সমুদ্রের জন্ম দিল।

*

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের-পর-মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই,
তাই বিরাট আকাশ-চিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসের ভিতর আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতির দাগ রেখে গেল শুধু,
তারপর দূর নীড়ের দিকে উড়ে গেল
হৃদয়ের পানীয়ের দিকে।

*

এই পৃথিবীর অব্যবহারের দিকে তাকিয়ে
কেমন-একটা তুহিন ছিল হৃদয়ে:

তোমাকে দেখে ভেঙে গেল ;
সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত-শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয় সে তার জলের ভিতরে
তাদের সমস্ত ক্ষুধা জড়ো ক'রে
আকাশের পানে গভীরভাবে নিক্ষেপ করে সে :
তোমার উত্তাল গম্বুজের উদ্দেশে
আমার অনুভূতির আলোড়ন,—
সেই সব স্ফীত খোঁপার নারী
তোমার নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে
গুঁড়োয়-গুঁড়োয় পৃথিবীর শস্যক্ষেতে ছড়িয়ে দেবে ;
হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব-নব সন্তান কলরব ক'রে উঠবে।

রচনাকাল : ১৩৪৪

তিনটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

ষ্ট্রাটো স্কোয়াড্রন্ : জে. বি. নম্বর ১৩২

প্লেনের চলার যন্ত্র পায়ে-চেপে, ঐ
বসেছে পাইলট উড়বে ব'লে—
রূপোলি আবর্ত গতি শূন্যতলে
রেডারের নিরঙ্কিত দূরে স্পর্শহীন,
আসন্ন মুহূর্তে লীন।
এরি মধ্যে গর্জে ওঠে এঞ্জিনের ফলা,
জ্যোতিঃজ্বলা
পক্ষবিধূনিত দৈত্য তীব্র জেট্ শব্দে, অনধীর
তুমি কি মানসে দেখ, ব্যো-নাবিক, মর্তবেলা স্থির
ছিন্ন ছিন্ন ছেঁড়া ক্ষণে ঘূর্ণির এপারে এরোড্রোমে
সম্পূর্ণ স্থিতির কেন্দ্র ; প্লেন ওঠে, ঐ নীচে রোম-এ
পি-এ-এ-র ম্যাপ-ঘরে এসেছিল ভীরু এলিনোরা
নরম-ভাষিণী স্ত্রী, গোলাপি বনেটে কোলে-করা
ধ'রে বেবী পুষ্পমুখ, ব্যস্ত ভিড়ে
কিছুই হয়নি কথা, ভালো থেকো, কফি-খাওয়া ভুলে
যেন প্রাত্যহিক শুধু হৃদণ্ড বিদায়, বক্ষ চিরে
বাঁকা বিদ্যুতের কক্ষে যেতে নীল ঊর্ধ্বে তুলে
প্রশস্ত ফেরে কি সেই লগ্ন অনাহত।

ঝঞ্ঝাবর্তে কালপক্ষ মেলে চলো যত
ধ্বনি-বাধা ভেদ ক'রে সনিক্ ওপারে মূর্ছার
গ্রহবিশ্বউল্কারাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী, অবর্ণ অপার

তারি পাশে ক্ষীণ কাচে রুমাল-ওড়ানো নিরুদ্দেশ
চোখ-মোছা স্ত্রীর ছবি সর্বাবৃত—এই দৃষ্টি শেষ—
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন ঝন
ঝন ঝন, ঝন ॥

দ্বীপান্তরে

ভেবেছি ওড়াব মানস বাতাসে ফিরে
তোমার সবুজ চুলে ঢেউ তুলে
মূর্ছ শিরি শিরি, কোরাল দ্বীপের বাসী,
ওগো নারকল, সারি নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
দিগন্ত ধ'রে দেখছ আয়না, এলেম যখন কূলে
তখনো স্বপ্নে চারু নীল ঢেউ মর্মরে রাশি রাশি
সেই গ্রেনাডিনে, দ্বীপ গ্রেনাডিনে, শূন্য তোমায় ঘিরে,
ওগো নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
তখন সময় ছিল না কিছুই দেবার
শুধুই সময় ছিল সে দৃষ্টি নেবার
ওগো নারকল সারি গো, সিন্ধুনীরে।
কত যে আর্দ্র ছিল বুক, কথা বন্ধ হবার মতো
হাওয়াই আকাশে ছুটে-চলা অবিরত,
আলাপের তালে তবু সে সকালে
মিলেছি মাটির চ'লে-যাওয়া মন্দিরে—
ওগো নারকল, একা নারকল সারি গো সিন্ধুতীরে ॥

আরো

আবার উঠেছি যানে,
দেখব স্টেশনে পুরোনো হাওয়ায়
হলদে ট্যাক্সি সারি,

সেই নেমে নেমে মুখস্থ সিঁড়ি ভারি—
বাহিরে আবার পরিচিত হায়
ভুরু উঁচু ময়দানে
অচেনা মূর্তি মৃত জেনারেল কারো;
চিনব ঘোড়াটা তারো ॥

হাজার হাজার বার
চিনি না ছড়িয়ে চা তৈরি করা,
জামার বোতাম না হারানো, ভরা
পকেটে কলম, কলমে রিফিল্; বুকে
বেপরোয়া তবু অতি সাবধানী ট্রাফিক-পেরোনো রীতি
জাগায় না বেশি প্রীতি,
চারিদিকে গাড়ি চলেছে সকৌতুকে;
ওপাড়ার ছেলে, ডাক-নাম জানা তার;
প্রতিদিনে এই প্রতিদিন উদ্ধার ॥

কে জানে, শেষের আরো শিখে রাখা
কী কাজে লাগবে শেষে—
আরো নম্বর টেলিফোন বইয়ে
তারিখ ঠিকানা আরো মনে থাকা,
কৌশলে বেয়ে ওঠা উঁচু মইয়ে
কোন্ উদ্দেশে ॥

কুচু ও মন্তুর জন্যে

কমলেশ চক্রবর্তী

আমার জানালার পাশে সেই ফুল
যা দেখে তোমরা একদিন
হাসির তরল ছটায় বলেছিলে : 'ভুল,
ও-নাম, ও-ফুলের নয়। গা ঘিনঘিন
করে যে ও-নাম শুনেই,
সুতরাং অমন নামের ফুল ভূ-ভারতে নেই।'

আমার জানালার পাশে এখানেও সেই ফুল !
কুচু ও মন্তু তোমরা দু'জন
এখানেও তেমনি তরল কণ্ঠে বলো : 'করো নির্মূল,
যেহেতু ও-ফুলের নাম ওর চেয়ে সুন্দর। তোমাদের কূজন
অর্থহীন ;
অথবা এই ভুল অহরহ আমরাও করি,
যা সাধ তা সাধ্যবিহীন
তবুও স্মরি
নিজেদের সবচেয়ে সচেষ্ট মুহূর্ত।

আমার জানালার পাশে সেই ফুল আজ সন্ধ্যায় ফোটে
মনে হয় তোমাদের কল্পনা হয়ত বা বিমূর্ত
তাই ও-তৃপ্তির হাসি দেখি তোমাদের ঠোঁটে।

দু একটি দুপুর

তরুণ সান্যাল

সে বলে মাদ্রাজি শাড়ি, সবুজ আংরাখা
মাকড়সার জাল নয়, তবু আমি জালের শিকার,
রক্তের গোপন গন্ধ সুতোর আড়ালে
মাতাল বিষাদে মৌন, আমি তার স্পর্শের যৌতুকে
কামনার প্রীতি দিই প্রেতভক্ষ্য প্রেমে

আমার নিস্তার নেই চৈতন্যে বা মনে
আমার বিশ্রামে আছে লোভে রক্তস্ফীতি
মুখে বা দুচোখে হেনো রক্তের আবির
অন্ধ কোরো বিকৃত হোলিতে
আচমকা হাওয়ার হাতে স্ফুলিঙ্গ-তর্পণ
সে জানে মাদ্রাজি সাড়ি
আমি জানি শাড়ির আশ্লেষ

একেকটি মধ্যাহ্ন যায় নিহিত তুফানে
সে তখন আবিষ্ট মাস্তুল
আমার রক্তের পাপে ফেনিল উল্লাস
দু'বাহুতে ঝড়ের দু'ডানা
অবশেষে ক্ষোভ কাঁপে শিরার প্রশ্রয়ে
হানো হানো নোঙর চড়ায়
—সে বলে মাদ্রাজি শাড়ি ঢেকে রাখে
শাণিত সংঘাত

আমাকে কামুক বলো, লোভী বা লম্পট
বলো, রক্তে হত্যার বেদনা
আমি জানি, যে জেনেছে আশরীর ঘুমন্ত যন্ত্রণা
তার পায়ে লুটোয় সময়
আমার হাতের নিচে আঙুলে পল্লব
পরিপূর্ণ বেদনার ঘটে

সে বলে মাদ্রাজি সাড়ি রেশমে কার্পাশে
আমি জানি সে-আঙ্গিকে শিল্প-শিল্পী অনন্য প্রতীক
তৃষ্ণাবেদী হোমের জানুতে ॥

সম্ভ্রান্ত চাবুক

অর্চন দাশগুপ্ত

অকস্মাৎ ঘুম ভাঙে, কিছু যেন ঘটেছে কোথাও :
দূরের দিগন্ত থেকে ভেসে এলো বাঘের চীৎকার—
আশঙ্কায় আঁধারের হৃৎপিণ্ড কাঁপে থরোথরো।

বর্বর স্নায়ুতে শুনি শ্বাস ফেলে ঝড়ের জঙ্গল,
আরণ্য সংকেতে নামে উত্তেজিত আদিম জাতিরা,
চোখ জ্বলে, চতুর্দিকে অগণিত হিংস্র চোখ জ্বলে।

(রক্তের আঘ্রাণে আসে বাঘিনীরা অলক্ষ্যে তোমার,
উদ্ধত শিরায় ঋজু শরীরের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার—
নির্ভুল নিক্ষেপে ওই বাঘিনীর অন্ত্রে ফুঁড়ে দাও।)

শহরতলির মাঠে সার্কাসের ঘুমন্ত তাঁবুতে
লোহার গরাদে শুধু বাঘের দু' চোখে ঘুম নেই,
বংশানুক্রমিক স্মৃতি ভ'রে যায় অরণ্যের স্বাদে।

ভদ্রতার পিঠে তবু সামাজিক আর-এক বাঘের
ডোরা-কাটা দাগ জ্বলে প্রত্যহের সম্ভ্রান্ত চাবুকে ॥

একলা হৃদয়ের একলা ঘরে তুমি

রাজলক্ষ্মী দেবী

একলা হৃদয়ের একলা ঘরে তুমি
কখন ফেলে গেছো তোমার ভালোবাসা।
অলস ভাঁজ-ভাঙা সুখের মৃদু ভাষা
কেন যে রেখে গেছো আমারি তরে তুমি!

কেন যে ফেলে গেছো পেছনে এই আশা!
শতেক অগোছালো চাওয়া-পাওয়ার ভিড়ে
কেন যে রেখে গেছো তোমার মায়াটিরে,
কেন যে ফেলে গেছো পুরোনো ভালোবাসা!

কেন যে এলোমেলো করেছো এই ঘর,
—কেন যে নেড়ে গেছো অলস ভীরু হাওয়া,
স্তব্ধ ঘরে কেন করেছো আসা-যাওয়া,
আমার একা সুখ বলে না সে-খবর।

বলে না সে-খবর এলানো চুপচাপ
তোমার দেহতাপে তপ্ত ভালোবাসা,
—তবু তো ভাঁজ-ভাঙা সুখের মূক ভাষা
ছড়ায় ঘরে সেই পুরোনো উত্তাপ!

অরণ্য-রাত্রি

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আনকোরা সিল্কের গুজনির মতো
অন্ধকার ঢেকে রাখলো রূপসী তার শরীরের
বাঁকানো রেখাগুলি, কিন্তু, তখনো, হায়, অসহায়
চোখের সামনে লাল, নীল, সবুজ
নগ্ন শরীরে কতো রঙের চরকিবাজি চলতে থাকলো!

চাইনে, চাইনে আবার মনে করতে অতীত, তাই
এই মৃত মুহূর্তে, এখন, এই শীতল তমসায়
সুন্দরী, ঘনকুটিল, মসৃণ সাপিনীর মতো
যুগল বাহুতে জড়াই নিজেকে, এবং হিমজমানো তার
সোনালি স্তনের নিষ্করুণ স্পর্শে
শিউরে উঠলো শরীর প্রবল জ্বরে, আর
পাহাড়ের কোন নদীতে যেন ঝড় উঠলো হঠাৎ, সশব্দে
আচমকা চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো জীর্ণ সাঁকো, দূরে,
অরণ্যে, নেকড়ের চোখে আগুনের লকলক লোভ
দুই ঠাণ্ডা, কাচের মতো সপ্রাণ মণিকে ঘিরে জ্বলছে, এই
মৃত মুহূর্তে, এখন, এই শীতল তমসায়।

সূর্যনগরীর ইন্‌কাদের রঙিন মেয়ের চন্দ্রমল্লী চুলের গন্ধ
তারপরে ছড়িয়ে গেলো আমার নিমগ্ন সর্বাঙ্গে,
গলনালীতে জ্বালা-ধরানো মদিরার মতো
শরীরে সেই ঘ্রাণের ঝাঁজ লাগলো, আর নরম, পুরু, বিশাল
দুই উরুর মধ্যখানে উথালপাথাল হয়ে গেলো

চেতনা, যেন অদৃশ্য এক বোলতার একটানা অসহ্য,
পাগল-করানো শব্দের সমুদ্রের জোয়ারের ভিতরে
ডুবে গেলো ইহকাল—

অথচ, অন্য আলিঙ্গনে তখনো তাকে ভুলতে পারি কই ?

মানুষ-মাটি-ঘাস
(Pantoum)

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ-তলে হাওয়ার হাটে ঘাসের মাঠে শুয়ে
হঠাৎ মনে ঘা দিলো এক বেদনা-ভরা বাণী
বললো ছোটো ঘাসের শীষ গালের কাছে নুয়ে—
সখা হে, শোনো, তোমাকে বড়ো আপন ব'লে মানি।

হঠাৎ মনে ঘা দিলো এই বেদনা-ভরা বাণী—
আবার ফিরে মিলবে এসো খোলা আকাশ-তলে ;
'সখা হে, শোনো, তোমাকে বড়ো আপন ব'লে মানি,'
কানের কাছে বাড়িয়ে মুখ তৃণাঙ্কুর বলে।

'আবার ফিরে মিলবে এসো খোলা আকাশ-তলে
ঘাসেরই মতো ছিলে তো কেউ, আবার হবে ঘাস।'
কানের কাছে বাড়িয়ে মুখ তৃণাঙ্কুর বলে—
'চাও, না চাও, ভুলবে সব ছাড়ার হা-হুতাশ।

'ঘাসেরই মতো ছিলে তো কেউ, আবার হবে ঘাস।
চরমে ঘাস সবাই হয় তুমিও হবে সখা ;
চাও, না চাও, ভুলবে সব-ছাড়ার হা-হুতাশ—
প্রাণের পিছে চির-প্রাণের নিয়তি রয় ছকা।

'চরমে ঘাস সবাই হয়, তুমিও হবে সখা,
ঘাসেরই মতো শ্যামল কেউ হানলে হাতছানি;
প্রাণের পিছে চির-প্রাণের নিয়তি রয় ছকা—
মানুষ যাকে মৃত্যু বলে আমরা তাকে জানি।

'ঘাসেরই মতো শ্যামল কেউ হানলে হাতছানি
গোপন পায়ে মৌন তুমি আসবে নেমে ঘাসে;
মানুষ যাকে মৃত্যু বলে আমরা তাকে জানি—
সমস্যার অঙ্ক শেষ একটি নিশ্বাসে!

'গোপন পায়ে মৌন তুমি আসবে নেমে ঘাসে
সমাধি হ'য়ে কবর হ'য়ে নরম মাটি মেখে—
সমস্যার অঙ্ক শেষ একটি নিশ্বাসে!
ক্লান্তি ফেলে জিরোবে তুমি আকাশে চোখ রেখে,

'সমাধি হ'য়ে, কবর হ'য়ে নরম মাটি মেখে।'
বলবে ছোটো ঘাসের শীষ গালের কাছে নুয়ে—
'ক্লান্তি ফেলে জিরোও তুমি আকাশে চোখ রেখে
আকাশ-তলে হাওয়ার হাটে ঘাসের মাঠে শুয়ে।'

তিন মুহূর্ত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

তারা আসেনি এক সঙ্গে, যায়নি এক সঙ্গে—তাদের মেলানো গেল না, বলা গেল না ভাই-বোন; শুধু অনিচ্ছায় সারা সকাল কাটালুম তিক্ততায়। কখন দেখলুম, এক নদীরই জল। এনেছি তাই বিন্দু-বিন্দু ক'রে।

এক : লগ্ন

সন্ধ্যার মতো সুন্দর এক অন্ধকার জেগেছিল তার মনে—সদ্যোজাত বেদনার মৃত্যুকে ভয় করে না জেনে সে পাড়ি দিল আমার দরজায়। অস্পষ্ট আলোকে আমি শুধু দেখেছিলুম তার চোখ কম্পিত।

তার বেশি আর কিছুই নয়। আর সেই হাওয়া, সেই আলো যা আলো নয়, আর সেই কী-যেন-বলতে-এসেছিলুম-যা-বলতে-পারলুম-না ভাব নিয়ে হঠাৎ-জেগে-ওঠা আমার বাগানের কাঁঠালিচাঁপা নিথর।

সে আমার দ্বারে এল আমারও এক নবজন্মের মুহূর্তে—সন্ধ্যার কোলে দিনের স্নিগ্ধ ঢ'লে পড়ার মতো আমি মরলুম অস্ফুট মরণে, অপার সুধা-সরোবরের তীরে সবুজ রাত্রে পাব ব'লে অচেনা ধরণীকে।

সে এল আমার দরজায় মরিয়া হ'য়ে, তাকে হারানোর ভয় পেয়ে যা তাকে কামড়ে ধরেছে কাঁকড়াবিছের মতো। সেই ভয়ের কোনো নাম আমি দেখলুম না, তাকে ডাকলুম না আসন পেতে ঘরের কোণে;

—শুধু আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলুম যে-আলোয় ভালো ক'রে কেউ পায়নি কাউকে দেখতে, এক অসহ মুহূর্তের অবসান না-চেয়ে।

দুই : লাফ

সর্বাঙ্গে আমার ধুলো—চোখেও পাইনে ভালো ক'রে দেখতে। এমন সময় খুলে গেল ভেতরের চোখটা। একটি মুহূর্তে খুলে গেল পাষাণদুর্গের প্রকাণ্ড ফটক। আর সে কী আলো, আর সে কী রং, আর সে কী বেদনা!

বাহির বলছে তাগিদ তোমার থামাও—চোখে আমার ধুলো। ভিতর নাচে ধেইধেই ক'রে, বলে বেলা ব'য়ে যায়, আমাকে ধরো তো ধরো, নয়তো পালাব পিছন পথে ধুলো উড়িয়ে—সে-ধুলোয় তোমার ভিতরটা অন্ধকার হ'য়ে যাবে।

আমি স্বার্থপর সেই বাঘের চেয়েও, যার হাতের নাগালের মধ্যে পড়েছে এসে তন্বী হরিণী, পা তার আটকে গেছে পঙ্কিল জলায়। তাই লাফ মারলুম তড়াক ক'রে, ধরলুম মুহূর্ত—হোক না ধুলো সর্বাঙ্গে আমার, নাই বা পেলুম দেখতে চোখে।

আর, কী ক'রে বলি তোমায়—সেই কচি মুহূর্ত, তার ঐ আলো, ঐ রং, ঐ বেদনা, তাকে আমি আত্মসাৎ করলুম। আমি তাকে রসিয়ে-রসিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে খেলুম।

তিন : ভোর

অবশেষে ভোর, এবং এই ভোর সকালে উঠেই আমি তার টুঁটি টিপে ধরতে চাই, তাকে শেষ ক'রে দিতে চাই—আমার কর্তব্য, আমার আবেগ, রক্তজবা হ'য়ে ফুটেছে যে আমার ভিতরে ঐ তরুণ অরুণের মতো।

অরুণ তার লাল ধীরে-ধীরে খসিয়ে ফেলবে, ছুটবে আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আরেক প্রান্তে, ধীরে-ধীরে ছোটো হ'য়ে প্রচণ্ডতর হবে। আমার রক্তজবার নিয়তিও কি হবে সেই সূর্যের অনুগামী, দীক্ষা নেবে পুরো বারো ঘণ্টা ধ'রে জলার, জলানোর? অথবা সে ধরা পড়বে তার ধরা-পড়ার মুহূর্তের সঙ্গে এই পাতায়, শেষে হবে নিছক কাগজের ফুল?

আমি তাকে ছেড়ে দিলুম তার নিয়তিরই হাতে।

ঐ শোনো জীবন জাগছে পাখির ডাকে, আলোয়, হাওয়ায়—এসেছে কেউ তোমার দ্বারে রাত্রির তিমির পেরিয়ে। বার্তা তার রঙিন বেদনার বাক্সে মোড়া। ছুঁয়েছে কি সে তোমার মনে তুলেছে ঢেউ, বুনেছে হাওয়া, ছুঁড়েছে

আলোর বর্শা—জাগছ তুমি ঐ পাখির সঙ্গে এক হ'য়ে, হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে। তোমারও খানিকটা নিল ঐ হাওয়া ঐ পাখি, ঐ আলো, সকলে এক হ'য়ে ছুটতে লাগল, প্রথমে ধীরে-ধীরে, পরে ক্রমশ জোরে—বহু যোজন পরিক্রমায় যেন একদল দৌড়ে প্রতিযোগী।

আমি কিন্তু তা না-ক'রে হঠাৎ ব'সে পড়লুম, ধরলুম কলম তুলে, ধ'রে রাখব ব'লে টিপে ধরলুম এই মুহূর্তের গলা। কিন্তু রক্ত তার ফিনকে উঠল আমার আঙুলের ফাঁকের মধ্য দিয়ে—সেই রক্তে ভরা অমর আলোর লক্ষ-লক্ষ বীজ।

ভয় পেয়ে ফেলে দিলুম মুহূর্ত, সমস্ত আঙুল আমার জ্ব'লে গেল।

—এখন সারাদিন ছুটব উন্মত্ত ভিখারী, সুধার সরোবর চেয়ে।

প্রশ্ন

বিশ্বনাথ সমাজদ্দার

বসন্তের এক মদির মুহূর্তে
নারী ও পুরুষের মিলন হ'লো—
বোধের অব্যক্ত পুলকে উভয়ের দেহযন্ত্র
ক্ষণিকের জন্য এক তরঙ্গের শীর্ষদেশে উঠে
দ্রুত নেমে এল খাদে।

তারপর পুরুষ আপিস যায়,
বাড়িতে এসে খায়, ঘুমোয়,
নারীর বমি পায় খেতে বসলে,
ডাক্তার বললেন গর্ভ-লক্ষণ।

প্রতিদিন স্ফীতায়িত গর্ভভারে
শয়নে চলনে তার অস্বস্তি—
পুরুষ রোজ আপিশ করে!
নারী বললো—এমন ক'রে বন্ধ ঘরে আমি থাকতে পারব না,
আমাকেও দাও বাতাস, দাও আকাশ,
পৃথিবীকে দেখবার পথে এই যবনিকা
কেন পঙ্গু করবে আমাকে!
নিরুত্তর পুরুষ তখন আপিশ করে।

তারপর একদিন গভীর রাতে
নারী পুরুষের কণ্ঠ ধরলো চেপে—
কেন, কেন,

এই অসহ যাতনা আমি কেন বইব?
তোমার খুশি আমার খুশি
কেন চলবে এমন বিষম পথে?
পুরুষ নিরুত্তরে পাশ ফিরে শুলো
অন্ধকারে ফুঁপিয়ে উঠলো নারী।

তারপর দিনের আলোয় নারী ভাবলে
নিজের মধ্যে একটি জীবনকে গ'ড়ে তুলছি প্রতি মুহূর্তে,
এই তো আমার চরম গর্ব;
এমন সৃষ্টি পুরুষ তো পারে না—
তুচ্ছ ওরা।—
পুরুষ তখন আপিশ করছে।

তারপর একদিন নারীর সৃষ্টি
তার দেহের শিরায়-শিরায়
তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত হেনে
আলোয় আসার বাসনা জানালো—
গর্বিতা নারী প্রথমে ঠোঁট চেপে কান্না রোধ করলো,
তারপর জানালো সবিলাপ মৃত্যুর আশঙ্কা,
অবশেষে ছেদনের আগে কসাই যেমন পশুর সন্ধান করে,
নারী তেমনি সন্ধান করলো পুরুষের—
পেল না—পুরুষ তখন আপিশে,
পেল এক কোমল দন্তহীন মুখের স্পর্শ।

তারপর দুজনা হ'য়ে ফিরে এল নারী
হাসপাতাল থেকে।
ক্ষীরভারে বুক তার টনটন করছে—
দেহে নতুন উন্মাদনা ;
পুরুষ আপিশ যায়—
নারী পিছন থেকে পথ চায়,
আপন মনে বলে—আমি যে নারী,—
আকাশে কি প্রাণ বাঁচে ?
খাঁচা আমার চাই।
সন্তানের কচি মুখে স্তনের সুপুষ্ট কালো বৃন্তটি
আবেগভরে চেপে দিয়ে
চক্ষু তার নিমীলিত হ'য়ে আসে,
পুরুষ তখন আপিশে কাজ করছে॥

দ্বিচারিণী

গোপাল ভৌমিক

জনাকীর্ণ এ শহর :
অসহ্য গরম
সুদীর্ঘ সময় ধ'রে
চলে একটানা।
রৌদ্রদগ্ধ রাজপথ
যেন মধ্যরাত্রির সীমানা
পেরিয়ে চলেছে এই দিবা দ্বিপ্রহরে ;
যদিও সকালে ঢুকে আপিশ-কোটরে
শান্তি খুঁজি কয়েক ঘণ্টার,
মনের বীভর
অস্বস্তির মাটি খুঁড়ে মরে
আর দেখে সারাদিন
কাক চিল ওড়ে
বৃষ্টির প্রত্যাশাহীন জলন্ত আকাশে—
বিলম্বিত কৃষ্ণচূড়া তবু কেন হাসে ?

জানালার পাশে
একটি নিমের গাছ
হাওয়ায় দোলায় মাথা,
অকস্মাৎ হ'য়ে ওঠে নারী :
নরম সত্তায় তার
আপাতত সূর্যের সত্তারই
নতুন চেতনা আনে,
যদিও বিবর্ণ পাতা
সবুজের স্বপ্ন দেখে দেখে,
তবু সে কামনা করে বৃষ্টির নিষেকে
ফিরে তার আসুক যৌবন—
দেহে হোক দ্বিচারিণী, একমুখী মন।

'মেঘদূত' ও তার অনুবাদ

সন্তোষ প্রতিহার

১

বিদ্যাসাগর বলেছেন, "যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো কাব্য রচনা না করিতেন তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত।" মেঘদূত বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য এ-বিষয়ে সুধীসমাজে দ্বিমত নেই। অলৌকিক কবিত্বশক্তি, অসামান্য রচনাশক্তি ও অনন্যসাধারণ সহৃদয়তার যে একত্র সংঘটন বিদ্যাসাগরের মতে কালিদাসের বৈশিষ্ট্য, তার পরিচয় মেঘদূতে দেদীপ্যমান হ'য়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার বই সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন—a haunted book, কর্তৃবাচ্যের অর্থে ইংরেজিতে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়। এ কথাটার অর্থ হচ্ছে—a book that haunts। সকল শ্রেষ্ঠ রচনা সম্বন্ধেই এ কথাটা অল্পবিস্তর খাটে। তবে মেঘদূত সম্বন্ধে এ কথাটা যত খাটে অন্য কোনো বই সম্বন্ধে বোধ হয় তত খাটে না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ও প্রবন্ধে এর নিদর্শন রয়েছে। একবার মেঘদূত পড়লে তার রসের আস্বাদ আমাদের রসনায় লেগেই থাকে, এই কাব্যের আবেদনের কুহক কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। মূল রচনার স্বাদ আমাদের রসনায় লেগে থাকে ব'লে অনুবাদকে ঐ কষ্টিপাথরে যাচাই করি। অনুবাদ প'ড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে "চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে, ঘুচলো নাকো মুখের তেতো"।

মেঘদূতের অনুবাদে দুরূহতার সম্বন্ধে সচেতন থেকে তার বিচার করতে হবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাক্ ও অর্থের মিলন হর-গৌরীর মিলনের মত অভেদাত্মক। সুতরাং অর্থকে বাক্ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই জন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুবাদে খানিকটা কাব্য-কসরতের (tour-de-force) ভাব থাকা স্বাভাবিক। যে-রচনার আবেদন শুধু বুদ্ধির কাছে তার অনুবাদ সহজ। যে-অর্থ শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য তার প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ধীময়ী বাক্, কিন্তু যে-অর্থ বোধিগ্রাহ্য তার প্রকাশের

জন্য শুধু ধীময়ী বাক্ যথেষ্ট নয়, তার উপযোগী বাক্ হচ্ছে শ্রীময়ী, হ্রীময়ী, বিভ্রমময়ী। যক্ষ বলেছে, "স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"। বনিতা সম্বন্ধে এ-কথা যেমন খাটে কবিতা সম্বন্ধে তেমনি। কবিতা অর্থপ্রকাশ করে হাবেভাবে, আকারে ইঙ্গিতে। বিধাতার সৃষ্টির মতো কবির সৃষ্টিও যেন "স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে, বলিতে পারে না স্পষ্ট করি, অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।" শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুবাদ এই অব্যক্ত ধ্বনির (suggestion) অনুবাদ। মেঘদূতের অনুবাদ করা সাহসের কাজ। এতে অনুবাদককে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হয় তাতে উত্তীর্ণ হওয়া একটা বড় রকমের কৃতিত্ব।

২

বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূতের অনুবাদ অবিকল। মূলের সঙ্গে তিনি কিছু জোড়েন নি, মূলের কিছু তিনি ছাড়েন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের অনুবাদ বিখ্যাত ও উপভোগ্য, তা এখন অপ্রচলিত। অবিকল অনুবাদের চেষ্টা তিনি করেন নি। একটি শ্লোকের প্রথম দুটি চরণের তাঁর অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে
শোভে তাহে নলিনীর হাট।
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট॥

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।

জল থইথই করে, মূলে নেই। স্বর্ণ নলিনীর ও স্নিগ্ধবৈদূর্যনালের কথা অনুবাদে নেই। এই দুটি চরণের বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদ হচ্ছে—

রয়েছে দিঘি এক, ঘাটের সারি যার কঠিন পান্নায় বাঁধানো,
হৈম অম্ভোজ কত না ফুটে আছে, মৃণালে জ্বলে বৈদূর্য।

এ-অনুবাদে মূলের কিছুই বাদ যায় নি। 'বদ্ধসোপানমার্গা' ও 'ছন্না'র অবিকল. কিন্তু খাঁটি বাংলা অনুবাদ মন হরণ করবে।

অবিকল হ'লেও এ অনুবাদ আক্ষরিক নয়। আক্ষরিক অনুবাদ অনুবাদের প্রহসন মাত্র। "মরম না জানে ধরম বাখানে" এমন ধার্মিক ব্যক্তি যে-দলের, মরমে প্রবেশ না-ক'রে শব্দের অনুবাদ যে করে সে-ও সেই দলের। তারা এই মহাসত্য ভুলে যায় যে the letter killeth। কাব্যের মর্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বুদ্ধদেববাবু তাঁর অনুবাদ রচনা করেছেন। কাব্যের অন্তরের কথা তাঁর অনুবাদে ধরা পড়েছে। নীচে একটি শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হল। এই থেকে তাঁর অনুবাদের পদ্ধতিটা ধরা যাবে।

কামের উদ্রেক যে করে সেই মেঘে সহসা দেখে তার 'সমুখে
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে-মনে বহুখন;
নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন, তারাও হ'য়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন।

শ্লোকের অর্থটি তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝেছেন ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অনুবাদক যেন মূলের কঠিন ভাষাকে আগে গলিয়ে অর্থটি তরল ক'রে নিয়েছেন, তারপর তাকে নিজের ছাঁচে ঢেলেছেন। মূলের সঙ্গে অনুবাদটি মিলিয়ে নেওয়া দরকার। কৌতুকাধানহেতোঃ—কামের উদ্রেক যে করে; কথং—কোনোমতে; অন্তর্বাষ্পঃ—চোখের জল চেপে; চিরং—বহুক্ষণ; কিং পুনঃ—কী আর কথা তবে; দূরসংস্থে—যদি সে থাকে দূরে; কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে—যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন; মেঘালোকে—নবীনমেঘ দেখে, সুখী—মিলিত সুখী জন। মূলে নেই অনুবাদে এমন কথা তিনটি রয়েছে—সহসা, নবীন, মিলিত। কথাগুলি না-থাকলেও ভাবটি মূলে রয়েছে। অনুবাদককে হ'তে হবে ভাবগ্রাহী; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কথার উপর নয়, ভাবের উপর। বুদ্ধদেববাবু ভাবের আনুগত্যকে ভাষার আনুগত্যের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ পড়লে মনে হয় কালিদাস যদি আধুনিক বাঙালী কবি হতেন তাহলে তাঁর মনের কথা তিনি এই ভাবে এই ভাষায় প্রকাশ করতেন। মূলের সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্যের ফলে বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদ যেন আরো মূলানুগামী হয়েছে। তাঁর অবিকল অনুবাদের মধ্যে এই সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নীচে এ-রকমের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। ক্ষণপরিচিতঃ—ক্ষণেক দেখে

নিয়ো; পাদন্যাসৈঃ—নাচের তালে-তালে; চিরবিলসনাৎ—ঝলক তুলে-তুলে অনেকবার; জ্ঞাতাস্বাদঃ—বারেক পেলে স্বাদ; উর্মিহস্তা—ঢেউয়ের মুঠি তুলে; সোপানত্বং কুরু—ধাপে-ধাপে এলিয়ে দিয়ে তনু; শিঞ্জাবলয়সুভগতালৈঃ—ক্বণিত বলয়ের ললিত করতালে। কোনো-কোনো জায়গায় অনুবাদ আমাদের সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে এতো উপরে উঠেছে যে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হই। এ-ধরনের প্রেরণাদীপ্ত অনুবাদের আরো উদাহরণ—করণবিগমাদ্ উর্ধ্বং, মরণ-পরপারে; অন্তস্তোয়ং;—স্বচ্ছ ভূমিতল সজল মনে হয়; জ্যোতিশ্ছায়াকুসুম-রচিতানি, তারার ছায়া দেয় ছড়িয়ে ফুলদল।

৩

চলতি, হাল্কা, খাঁটি বাংলায় মেঘদূতের মত দুরূহ রচনার অনুবাদের জন্য অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভার প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর রচনায় সরলতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মেঘদূতের দুরূহতাদোষের কথা বলেছেন। মেঘদূতের দুরূহতার প্রধান কারণ অন্বয়ের (syntax) জটিলতা। দূরান্বয় ও দুরন্বয়ের একটা সেরা নমুনা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি যার পাশাপাশি স্থান পেতে পারে মিলটনের বিখ্যাত periodic sentence (ব্যূহবদ্ধ বাক্য), তাঁর মহাকাব্যের প্রথম অনুচ্ছেদ। যক্ষ ও তার কান্তার মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান, এখানে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সেই ব্যবধান। কোথায় কশ্চিদ্ যক্ষঃ আর কোথায় বসতিংচক্রে। মেঘদূতের পদসংঘটনা বা রীতিকে অলংকারশাস্ত্রের ভাষায় গৌড়ী রীতি বলা যায়। গৌড়ী রীতি সমাসবহুল। গৌড়ী রীতি বাঙালী কবির রচনার ভাষায় দেখা গেলেও বাঙালীর রসনার ভাষায় দেখা যায় না। বাঙালীর মুখের ভাষা সন্ধিবিমুখ, সমাসবিরাগী। কোনো বাঙালী কবি বলেছেন—

কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

সহজ লোকের সরল ভাষায় বুদ্ধদেববাবু মেঘদূতের অনুবাদ করেছেন, আমার কাছে তাঁর অনুবাদের এইটিই প্রধান আকর্ষণ। সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদের কাঁধে সংস্কৃতের ভূত প্রায়ই চ'ড়ে থাকে। বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদে সংস্কৃতের উৎপাত নেই। পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ দশার্ণাঃ—এর রবীন্দ্রনাথ বাংলা করেছেন—

পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে,
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে?

'পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে' বাংলা দেশের সহজ লোকের মুখের সরল কথা নয়। যে-বাংলা বিভক্তিবিহীন সংস্কৃত সে-জাতীয় বাংলা বুদ্ধদেববাবু বরাবর এড়িয়ে চলেছেন। চলতি ভাষা ও চলতি ভাষার স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল অন্বয় তিনি আগাগোড়া অনুসরণ করেছেন।

প্রসাদগুণ বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুকনো কাঠে যেমন আগুন ছড়িয়ে পড়ে তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনার অর্থটি অতি ত্বরিত-গতিতে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পড়ামাত্র এ-অনুবাদের মানেটি বোঝা যায়। কালিদাস গম্ভীরা নদীর স্বচ্ছ জলের সঙ্গে প্রসাদগুণবিশিষ্ট মনের (চেতসি ইব প্রসন্নে) তুলনা করেছেন। লেখকের মনে প্রসাদগুণ না-থাকলে তাঁর রচনায় প্রসাদগুণ আসতে পারে না। রচনার স্বচ্ছতা মননের স্বচ্ছতার প্রতিবিম্ব। প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনার অর্থটি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করা সত্ত্বগুণের ধর্ম (সত্ত্বং প্রকাশকং)। প্রকাশের পথে বাধা অনেক—রজোগুণের বাধা, তমোগুণের বাধা! বিক্ষিপ্ত মনের আবিলতা, বিমূঢ় মনের মলিনতার আবরণ ভেঙে মনকে নিরাসক্ত, মোহমুক্ত না-করলে সত্ত্বগুণকে জাগানো যায় না। যা আবরক তার ঊর্ধ্বে না-উঠলে যা প্রকাশক তার সন্ধান পাওয়া যায় না। দেশ-বিদেশের সাহিত্য প'ড়ে বুদ্ধদেববাবু তাঁর মনোমুকুরকে মেজে-ঘ'ষে ধুয়ে-মুছে চকচকে ক'রে রেখেছেন। তাই তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে আমরা সর্বত্র প্রসাদগুণ দেখতে পাই।

বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদের একটি বৈশিষ্ট্য যেমন তার প্রসাদগুণ, তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য শ্লেষগুণ। গৌড়ী রীতির দোষ হচ্ছে তার দুরূহতা, কিন্তু এই দোষ

সত্ত্বেও গৌড়ী রীতি কবিদের কাছে আদরণীয় তার প্রগাঢ়তার জন্য (ইষ্টং বন্ধগৌরবাং)। চরিত্রে দোষগুণের মত রচনারীতির দোষগুণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যা দোষ তাই আবার গুণের উল্টো পিঠ, দোষ বাদ দিতে গেলে গুণও চ'লে যায়। দুরূহতা বাদ দিতে গেলে রচনা প্রগাঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সন্ধি-সমাসের সাহায্যে শিথিলবন্ধ রচনাকে সহজেই অর্থঘন গাঢ়বন্ধ ক'রে তোলা যায়। এটা বুদ্ধদেববাবুর অসামান্য কৃতিত্ব যে তিনি দুরূহতা দূর করেছেন অথচ শিথিলতা এড়িয়ে চলেছেন। যে-কবিকৌশলে দুরূহতা ও শিথিলতা দু-ই এড়িয়ে চলা যায় তা তিনি আয়ত্ত করেছেন। লোকোত্তর পুরুষের চরিত্রে যেমন শুধু গুণগুলি থাকে কিন্তু গুণের আনুষঙ্গিক দোষগুলি থাকে না, শ্রেষ্ঠ রচনারীতিতেও তেমনি গুণগুলি থাকে কিন্তু আনুষঙ্গিক দোষগুলি থাকে না। এই রকম রচনারীতিকে "সমগ্রগুণা" বলা হয়। বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদে প্রসাদ ও শ্লেষ দুই গুণের সমন্বয় ঘটেছে। শ্লেষগুণসম্পন্ন রচনায় শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ ক'রে একপদে পরিণত করা হয় না, অথচ এমন একটি অদৃশ্য বন্ধনরজ্জু দিয়ে তাদের বাঁধা হয় যে পদগুলি বহু হ'লেও একপদ ব'লেই প্রতীয়মান হয় (বহুন্যপি পদানি একবদ্ ভাসন্তে)। মেঘদূতে এমন চরণ রয়েছে যা একটিমাত্র শব্দ (word)। বুদ্ধদেববাবুর এই চরণগুলির অনুবাদ দেখলেই বুঝতে পারা যাবে কেমনভাবে তিনি সমাসবিহীন ভাষায় সমাসবদ্ধ ভাষার প্রগাঢ়তা রক্ষা করেছেন। বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ,—'ঢেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা করে তার কাঞ্চীদাম।' অনুবাদে মূল থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই, বিন্দুমাত্র বেশি জায়গা নেয়নি, কাঞ্চীদামে ছাড়া কোথাও সমাসের নাম-গন্ধ নেই। শব্দগুলি দেখতে বিশ্লিষ্ট, সন্ধিসমাসের দড়িদড়া দিয়ে সেগুলিকে বাঁধা হয়নি কিন্তু শব্দগুলির বিন্যাসকৌশল তাদের সংশ্লিষ্ট ক'রে রেখেছে। এখানে সেই শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল রয়েছে যা কৌশল ব'লে টের পাওয়া যায় না। আগাগোড়া দেখা যাবে বুদ্ধদেববাবু তাঁর অনুবাদকে শুধু হাল্কা নয়, ঘন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমন হাল্কা অথচ এমন ঘন বাংলায় মেঘদূতের অনুবাদ করা যেতে পারে তা আমরা কখনো ভাবিনি।

৪

কাব্যের অনুবাদ সার্থক হয় তখনি, যখন অনুবাদক হন কবির সমানধর্মা। কাব্যের আত্মা রস। অনুবাদককে এই রসকে পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। "রসনাদ্ রসঃ"—আস্বাদ্যমানতা আছে ব'লেই রস বলা হয়। অনুবাদকের চিত্তে মূল কাব্যের রসের আস্বাদের অঙ্কুরোদ্গম না-হ'লে অনুবাদ রসাত্মক হ'তে পারে না। যখন তাঁর চিত্তে আস্বাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় তখন অনুবাদ হ'য়ে ওঠে "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"। ভক্ত যেমন হৃদয়ের ভক্তির সঞ্জীবনী রসে কাঠের পুতুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে প্রাণের ঠাকুরে পরিণত করেন, অনুবাদকও তেমনি "ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" এই ব্যাকুল আহ্বানে মূল কাব্যের প্রেরণাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে অনুবাদকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন। বসন্তে তরুলতা যেমন ফলে ফুলে পল্লবে অপূর্ব শোভা ধারণ করে, মূল কাব্যের পরিচিত অর্থ অনুবাদকের অন্তরের রসে অভিষিক্ত হ'য়ে তেমনি নূতনরূপে প্রতীয়মান হয়। কালিদাস আমাদের এই ধূলিময়ী ধরণীর কোলে যে-রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শের সম্পদ আবিষ্কার করেছেন তা আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানি না। মেঘদূত পড়ার সময় মনে হয় যা-কিছু আনন্দ আছে বর্ণে গন্ধে গানে কবি তা সবই উপলব্ধি করেছেন। যে-ঋষিরা বলেছিলেন "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ", "মধুময় পৃথিবীর ধূলি", তিনি তাঁদের সমগোত্রীয়। যে-পৃথিবীতে এতো ঐশ্বর্য, এতো মাধুর্য, সে-পৃথিবীর অধিবাসীরা তো দিব্যধামবাসী। কালিদাসের উপলব্ধি যে-অনুবাদকের অন্তরে নবজন্ম লাভ করেছে তা নীচের দু-চার ছত্রের অনুবাদ থেকেই বোঝা যাবে।

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ,
প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক্বফল।

তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং তোয়ং,
......তীব্রসৌরভ রেবার জল,
......বন্য গজমদগন্ধে ভরা।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈঃ,
নব কদম্বের সবুজপিঙ্গল অর্ধবিকশিত বর্ণ।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃসূচীভিন্নৈঃ,
সেখানে উদ্যানে কেতকী ফুটে উঠে পাণ্ডু ক'রে দেবে সাজানো বেড়া।

ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ,
তোমার মিলনের পুলকে থরে-থরে মুঞ্জরিত হবে কদম্বেরা।

পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ,
তটজ বৃক্ষের জীর্ণ পাতা ঝ'রে পাণ্ডু ক'রে দিলো বর্ণ।

কীটস শেলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের প্রতিটি ফাটলকে মণিতে ভরিয়ে দিতে। কাব্যের ফাটলকে কী ভাবে ঐশ্বর্যে ভ'রে দেওয়া যেতে পারে তার চূড়ান্ত নিদর্শন মেঘদূত। এ-কাব্যে রিক্ততা কোথাও নেই, একটি বিচিত্র পূর্ণতা কাব্যদেহের অঙ্গে-অঙ্গে সন্নদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। বুদ্ধদেববাবু তাঁর অনুবাদে এই পূর্ণতার স্বাদ সঞ্চারিত করেছেন।

৫

মেঘদূতের যে-শ্লোকগুলি কেউ-কেউ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন অনুবাদে তাদের স্থান সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। এ-রকম শ্লোক ছয়টি। তার মধ্যে তিনটি—দুটি উজ্জয়িনী সম্বন্ধে, একটি অলকা সম্বন্ধে—কালিদাসের রচনার দীন, অক্ষম অনুকরণ। এগুলি বর্জন ক'রে মল্লিনাথ প্রৌঢ় বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বাকি তিনটিকে নিয়েই সমস্যা। মল্লিনাথ সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন কিন্তু সযত্নে তার টীকা করেছেন। এতে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলি যদি কালিদাসের প্রতিভার লক্ষণাক্রান্ত ও কাব্যের অঙ্গীভূত বিবেচিত হয় তা-হ'লে এদের অনুবাদে স্থান হওয়া উচিত। মেঘদূতে কোনো শ্লোক কাব্যের অঙ্গীভূত কিনা তা স্থির করা একটু কঠিন। প্রথম পাঠে মনে হয় যে এ-কাব্যের অঙ্গসংশ্লেষ বড়ই শিথিল। মনে হয় এ-কাব্য বিচিত্র বর্ণনার সমষ্টি মাত্র। অলকার পথনির্দেশ একটা উপলক্ষ মাত্র, রামগিরি থেকে কৈলাস এই বিশাল ভূখণ্ডের নদী, গিরি, বন, নগর, জনপদ ও তীর্থক্ষেত্রগুলির বর্ণনাই যেন লক্ষ্য। মনে হয় শ্লোকগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ নেই, প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে-নাড়ির যোগ তা সেখানে নেই,

পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে-দড়ির যোগ, তাদের মধ্যে আছে সেই বহিরঙ্গ-যোগ। আমাদের এই ধারণা যদি সত্য হ'ত তা-হ'লে মেঘদূত কালজয়ী গৌরব পেত না। ঐক্য কাব্যের প্রাণ। তাতে বৈচিত্র্যের স্থান আছে সত্য, কিন্তু সে শুধু ঐক্যকে পরিপুষ্ট করার জন্য। লর্ড অ্যাক্টনের এক ভিষগ্ বন্ধু বলেছিলেন যে তাঁর আয়ুর্বেদিক শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার জন্য তিনি গিবন, গ্রোট ও মিলের ইতিহাসের বইগুলি পড়েছেন। সুশিক্ষিত ব্যক্তির মন বিশেষ অনুশীলিত ও বিচিত্র বিদ্যায় পরিশীলিত। শুধু একটি বিষয় অধ্যয়ন ক'রে যথার্থভাবে শিক্ষিত হওয়া যায় না। স্থায়ী রসকে পরিপুষ্ট করার জন্য বিচিত্র সঞ্চারী রসের প্রয়োজন। মেঘদূতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই কিন্তু সকল বৈচিত্র্যই ঐক্যের কঠিন সূত্রে বিধৃত। বৈচিত্র্যগুলি স্থায়ী শৃঙ্গাররসের অবিচ্ছিন্ন, অবিরল স্রোতে অদ্ভুত, করুণ, ভক্তি, শান্ত প্রভৃতি সঞ্চারী রসের তরঙ্গচাঞ্চল্য। কালিদাস ছবির পর ছবি সাজিয়ে মেঘদূত রচনা করেছেন। মেঘদূত পাঠকে আলেখ্যদর্শন বলা যেতে পারে। এই ছবিগুলি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিহীন স্বতন্ত্র ছবি নয়। কোনো মনস্বী ব্যক্তি বলেছেন—A beautiful landscape is a state of the mind. মেঘদূতের ছবিগুলি শুধু নদী-গিরি-নগর-জনপদের ছবি নয়, সেগুলি কামার্ত যক্ষের অন্তরের ছবি। মেঘদূতের ঐক্যসূত্রটি হচ্ছে কামার্ত যক্ষের দৃষ্টির ঐক্য। মল্লিনাথ যে-তিনটি শ্লোককে বাদ দিয়েছেন সেগুলিকে এই ঐক্যসূত্রে গাঁথা যায় না। বাকি তিনটি শ্লোককে এই ঐক্যসূত্রে গাঁথা যায় কিনা দেখে, তাদের রক্ষণ বা বর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পূর্বমেঘের যে-শ্লোকটি বাদ দেওয়া হয়েছে, শ্রী তন্ময় দত্ত তাঁর সুলিখিত পত্রে সেটি উদ্ধৃত করেছেন। এই শ্লোকটিতে চাতুর্য আছে, মাধুর্য নেই; চমক আছে, চমৎকারিত্ব নেই। পূর্বমেঘের শ্লোকসংখ্যা চৌষট্টি এবং উত্তর-মেঘের চুয়ান্ন, গণিতের এই পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে শ্লোকটিকে রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া এ-শ্লোকটি মেঘদূতের কাব্যদেহে বেমালুম খাপ খায়। অভিশপ্ত রাজপুরুষকে কালিদাস রাজবিরহীতে পরিণত করেছেন। বিরহী যক্ষ

বিশ্বের সকল বিরহীর চিত্তদূত। বিরহের ভূমা তার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। কান্তা থেকে বিযুক্ত হ'য়ে সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিশ্বমানবের প্রতি তার অপার করুণা, মৈত্রীভাবনায় তার অন্তর "মোদিত-মধুর"। কোনো-কোনো সদাশয় ব্যক্তি কোনো দুরারোগ্য রোগে প্রিয়জনকে হারিয়ে ঐ রোগের চিকিৎসার উন্নতিসাধনের জন্য সর্বস্ব দান ক'রে থাকেন, যেন ঐ রোগে অন্য কেউ প্রিয়জনকে না হারায়। যক্ষ এই সদাশয় ব্যক্তিদের দলভুক্ত। যে-সুখভোগে সে বঞ্চিত, যে-ভোগসুখের জন্য সে উৎসুক, সকলে সেই সুখভোগ করুক এই তার আন্তরিক কামনা। মেঘের ডাকে ত্রস্ত সিদ্ধাঙ্গনাগণের কণ্ঠপ্রদেহের ব্যস্ত আলিঙ্গন-সুখ সিদ্ধগণ লাভ করুক, এই ভাবনা বিরহী যক্ষের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। সুতরাং প্রক্ষিপ্ত হলেও এ শ্লোকটি রক্ষণীয়।

উত্তরমেঘের যে-দুটি শ্লোককে মল্লিনাথ প্রক্ষিপ্ত বলেছেন তার একটির অনুবাদ বুদ্ধদেববাবু দিয়েছেন। আরেকটি বাদ দিয়েছেন। এ-দুটি শ্লোকে কালিদাসের হাতের স্পর্শ সুস্পষ্ট নয়। তবে "কেকোৎকণ্ঠাঃ", "প্রতিহততমো-বৃত্তিরম্যাঃ" এই কথাগুলির মধ্যে জাদু আছে। সারা বছরই অলকায় ময়ূর ডাকে এর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু ডাকার সময়ে ময়ূরের ঊর্ধ্ব-প্রসারিত গ্রীবার ছবিটি সুন্দর ও যে-ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়েছে তা আরো সুন্দর। অলকায় রজনীতে আলো-আঁধারের লড়াইয়ে আলো সকল সময় আঁধারকে ঠেকিয়ে রেখেছে এই ভাবটিও আমাদের মনকে স্পর্শ করে। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে অলকায় আনন্দাশ্রু ছাড়া অশ্রু নেই, প্রণয়কলহ ছাড়া কলহ নেই, যৌবনবেদনা ছাড়া বেদনা নেই, যৌবন ছাড়া বয়স নেই। "জগতের গিরিনদী সকলের শেষে" এই যে আশ্চর্য দেশ, এ শৃঙ্গারী যক্ষের কল্পিত রসময় জগৎ, যেখানে শৈশব, কৈশোর, বার্ধক্য প্রভৃতি বয়সের, প্রণয়বেদনা ও কলহ ছাড়া বেদনা ও কলহের প্রবেশ নিষেধ, যেমন রাগিণীতে বিবাদী স্বরের প্রবেশ নিষেধ। এই শ্লোকটিকে এ-কাব্যের স্থায়ী শৃঙ্গাররসের আস্বাদাঙ্কুর, কন্দ বা বীজ ব'লে মনে করা যেতে পারে। এ-শ্লোকটির অনুবাদে স্থান হওয়া উচিত।*

* উল্লিখিত শ্লোক দুটির অনুবাদ 'কালিদাসের মেঘদূত' পুস্তকে যোগ করা হয়েছে।

৬

এ-অনুবাদের একটা বড় আকর্ষণ এর ছন্দ। মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাংলা অনুবাদে বিজোড় মাত্রার ছন্দের আশ্রয় নিতে হবে—এই বোধ প্রতিভাবান ছান্দসিকের অন্তর্দৃষ্টির ফল। এক ভাষার ছন্দকে অন্য ভাষায় চালানোর চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়, কেননা এক ভাষার স্বধর্মকে অবলম্বন ক'রে অন্য ভাষার ছন্দ অনুকরণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি blank verseকে বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরিণত ক'রে মধুসূদন অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষার, বাঙালীর উচ্চারণপদ্ধতির নিয়মকানুন মেনে নিয়েই তিনি বাংলা অমিত্রাক্ষর রচনা করেন, বাংলা অমিত্রাক্ষর বিলেতি iambic pentametre-এর দেশী সংস্করণ নয়। জোড় মাত্রায় বাংলা পর্বকে নানাভাবে মিশিয়ে তা রচনা করা হয়, তার মধ্যে কোথাও জবরদস্তি নেই। সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলায় আমদানি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মত ওস্তাদের হাতেও এ-চেষ্টা সফল হয়নি। মন্দাক্রান্তার চরণে যতিস্থান তিনটি; চার, দশ ও সতেরো অক্ষরের পর। মন্দাক্রান্তার চরণ ত্রিপদী। প্রথম দুটি পদে সত্যেন্দ্রনাথ আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি চরণে যতিস্থান চারটি, যার ফলে মন্দাক্রান্তার কাঠামোই ভেঙে গেছে, সংস্কৃতের তৃতীয় পদ বা পর্বটি বাংলায় দুটি পদ বা পর্বে পরিণত হয়েছে।

ইন্দ্রের দক্ষিণ। বাহু সে তুমি দেব। পূজ্য লও মোর। পূজার ফুল

প্রথম পর্বে চারটি হলন্ত অক্ষর (syllable), দ্বিতীয়টিতে পাঁচটি মৌলিক স্বরান্ত ও একটি হলন্ত—সংস্কৃতের প্রথম দুটি পর্বের চমৎকার অনুকরণ, মনে হয় সংস্কৃত মন্দাক্রান্তাই পড়ছি, কিন্তু বাকি অংশে মিল নেই। সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তা কালোয়াতের কসরৎ। তাঁর ছন্দ উপভোগ্য এইজন্য যে তা বাংলা চতুষ্পদী চরণের ছন্দ যার মূল পর্ব বা পদ (basic foot) সাত মাত্রার, ব্যত্যয় আছে প্রথম ও শেষ পর্বে, প্রথমটিতে ৮ মাত্রা, শেষটি অপূর্ণপদী পাঁচ মাত্রার—এতে-মাত্রার হিসাবে কড়াকড়ি রয়েছে, হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত প্রতিটি অক্ষর দু

মাত্রার। সত্যেন্দ্রনাথের অবচেতন মন অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিল যে সাত মাত্রার অপূর্ণপদী চতুষ্পদী মন্দাক্রান্তার বাংলা প্রতিকল্প। বুদ্ধদেববাবু নিঃসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এই ছন্দ তাঁর অনুবাদে ব্যবহার করেছেন, তাঁর শেষ পদটি তিন, চার বা পাঁচ মাত্রার।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দকে রক্ষা করা অসম্ভব। সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনির ঐশ্বর্য অতুলনীয়, তার তুলনায় বাংলা ভাষা রিক্ত। বাংলার পুঁজি হলন্ত অক্ষর ও মৌলিক ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। শুধু এই পুঁজি নিয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির ঐশ্বর্যকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা বাংলা ভাবার মধ্যে লুকোনো ছিল, এই আবিষ্কার মধুসূদনের এক অপূর্ব কীর্তি। কিন্তু এ-ক্ষমতা রয়েছে শুধু অমিত্রাক্ষর পয়ারে; ছড়ার ছন্দের ও বিজোড়মাত্রার ছন্দে দৃঢ়ধ্বনি যুক্তবর্ণের বজ্র-করতালি নেই, এখানে বর্ণগুলি একত্র হয়, এক হয় না, চোখের কাছে যুক্ত (পঞ্চ), কানের কাছে বিযুক্ত (পন্+চ)। সুতরাং মনে হ'তে পারে মন্দাক্রান্তার অনুবাদ অমিত্রাক্ষর ছন্দেই হওয়া উচিত। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। যে-monotone, ধ্বনির একটা প্যাটার্নের যে-পুনরাবর্তন মন্দাক্রান্তার প্রাণস্বরূপ, তা অমিত্রাক্ষরের বিচিত্র কনসার্টে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। মন্দাক্রান্তা ঐক্যপ্রধান, ঢাকের বাদ্যির মত তার ঐক্য, বৈচিত্র্য সেখানে ঐক্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন। মন্দাক্রান্তার ধ্বনি কাটা-কাটা, তার লয় বিলম্বিত। অমিত্রাক্ষরের প্রাণ তার প্রবহমানতার অখণ্ড কলধ্বনি, সে চলে দীর্ঘত্বরিত পদক্ষেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে। ছড়ার ছন্দের লঘু পরিহাসের ক্ষমতা আছে, কিন্তু অশ্রু-সজল বিষাদগম্ভীর চিত্তভাব প্রকাশের ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ। এ-ক্ষমতা রয়েছে বিজোড় মাত্রার ছন্দের। এর লয় বিলম্বিত, এর গতি যতিবহুল। এর চরণ ও চলন সুনিয়ন্ত্রিত। পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে অক্ষরের সংকোচন ও প্রসারণ দু-ই আছে। এখানে আছে শুধু প্রসারণ। সাত মাত্রার পর্বের বার-বার পুনরাবর্তন একটা মায়া ও মোহ সৃষ্টি করে যা মেঘদূতের সৌন্দর্যের অমরাবতীর দরজা খুলে দেয়। বিজোড় মাত্রার ছন্দ গদ্য থেকে দূরে, এখানে শব্দের উচ্চারণ একটু কৃত্রিম; এই কৃত্রিম ছন্দের যানে চ'ড়ে আমরা মেঘদূতের কৃত্রিম জগতে যেতে

পারি। সে-জগৎ কৃত্রিম কিন্তু তার সম্বন্ধে বলা চলে—"মনোহরাণাং সীমান্তরেখা", "অপরূপানাং অবসানভূমিঃ।"

৭

এ-অনুবাদের দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে দু এক কথা বলা দরকার। এগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বাংলা ভাষার অক্ষমতা, অনুবাদকের অক্ষমতা, ও অনবধান। বাংলা ভাষার অক্ষমতার জন্য অনুবাদককে দায়ী করা চলে না। সমাসের সাহায্যে অনেকখানি বক্তব্যকে গুটিয়ে এনে সংক্ষেপে সমস্ত পদে প্রকাশ করা যায়। বাংলায় বক্তব্যটি থাকে ছড়িয়ে, স্রস্ত হয়ে; সংস্কৃতের সমান আয়তনে বাংলায় বক্তব্যটিকে সকল সময় ধরানো যায় না; সুতরাং অশ্লিষ্ট বাক্যখণ্ডের মধ্যে বক্তব্যকে গূঢ় (obscure) অবস্থায় রাখতে হয়, ব্যাখ্যা না-করলে যার অর্থ বোঝা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল

মহিমা অবসান, বিরহগুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল।
স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য।

সংস্কৃতে মন্দাক্রান্তা শ্লোককে চার চরণের বাংলা চতুষ্পদী স্তবকে অনুবাদ করতে গেলে এ-ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী।

'তা ভেবে, অভিমানবশত' (৯৭), 'কিংবা বন্ধুতাসূত্রে', (১১৮) এগুলি মন্দাক্রান্তার অনুবাদে একেবারে অচল, এ-কথাগুলি চলতি বাংলাতেও অচল। যে-সব জায়গায় অনুবাদ আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিলাম। সেবক ইন্দ্রের (৬), দিশারী (২১), ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে (৯৮), সোচ্চারে (১০৬)।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি নির্বিচারে লঙ্ঘন করতে হবে, এটা কুসংস্কার-আচ্ছন্ন মনোভাব। অবিধবা ও চটুলনয়নাকে সম্বোধন করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার সম্বোধনপদই ব্যবহার করতে হবে, প্রাকৃত ভাষার সম্বোধনে তাদের সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমার মতে এ-অনুবাদের একটা গুরুতর ত্রুটি হচ্ছে চরণান্ত মিলের অভাব। বাংলা কবিতায় অন্ত্য মিল অপরিহার্য; অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল

না-হ'লেও চলে, তার কারণ সেখানে অনুপ্রাস, যমক ও যুক্তবর্ণের প্রাচুর্যে ধ্বনির যে-সমারোহ থাকে তাতে মিলের অভাবের ক্ষতিপূরণ হয়। ধ্বনিসম্পদে বাংলা ভাষা অকিঞ্চন, এতে সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর নেই, ইংরেজির accented syllable নেই; তার উপর যদি মিল না থাকে তা হ'লে বাংলা কবিতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। মিল না-থাকলে মনে হয় গান যেন শমে আসার আগেই থেমে গেল। মিল থাকলে কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয় না। Rhyme-এর music সম্বন্ধে বলা চলে—

The music in my I bore
Long after it was heard no more.

যে-মিল শুধু শ্রোত্ররসায়ন, যার আবেদন শুধু কানের কাছে, মনে যার ছোঁয়া লাগে না তার ফলে কবিতায় যে অতিলালিত্য আসে তাতে রসের অপকর্ষ ঘটায়। সে-রকমের মিল না-রাখাই উচিত। যে-রসের অভিব্যক্তির জন্য উদাত্তগম্ভীর ধ্বনির প্রয়োজন মিলের লালিত্য সেখানে বর্জনীয়, কিন্তু মেঘদূতের করুণ বিপ্রলম্ভের মত অতি-সুকুমার রসের অভিব্যক্তিতে মিলের লালিত্য মাধুর্য সঞ্চার করবে, মিল হবে "ভূষণং ন তু দূষণম্"। আরেকটা কথা। আমার মনে হয় এই ছন্দে শেষ পর্বটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁচ মাত্রার হওয়া উচিত, তিন মাত্রা ও চার মাত্রার পর্ব হবে নিয়মের ব্যতিক্রম, থাকবে শুধু বৈচিত্র্যের জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি তিন ও চার মাত্রার হলে, শুধু শেষ পর্বটি নয়, সমস্ত চরণটিকেই অপূর্ণ মনে হয়। নীচের দুটি চরণ তুলনা করলেই পার্থক্যটা বোঝা যাবে।

অদূরে কমনীয়। বকুল তরু আর। কম্প্র কিশলয়। রক্তাশোক
যেথায় মুকুরিত। তোমার তাড়নায়। পীড়িত ইন্দুর। দৈন্য

পর্বান্ত মিল (middle rhyme) থাকলে চরণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির রূপ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ও ধ্বনি বেশ দানা বাঁধে। যেমন—

প্রান্তে আছে তার আমারি কান্তার পালিত কৃত্রিম পুত্র
আমার মনে হয় স্নেহের উপচয় মহৎ প্রেমে পায় পরিণাম।

এই পর্বান্ত মিল আরো বেশি থাকলে ভাল হত; উত্তরমেঘে পূর্বমেঘের চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে। আরেকটা ত্রুটি, অনুবাদের নামকরণ: মেঘদূত নামই যথেষ্ট, "কালিদাসের মেঘদূত" বলার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

অধিকাংশ ত্রুটি হচ্ছে নিছক অনবধানের ফল। এই ত্রুটিগুলির জন্য অনুবাদককে দোষী করতে আমি সংকোচ বোধ করছি, কেননা অনবধানের মূলে রয়েছে অনবসর। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিমবঙ্গে জ্ঞানীগুণীদের জীবনে অবসর কোথায়? বীণাপাণি শতদলবাসিনী, সে-শতদল ফোটে অবসর-সরোবরে। সে-সরোবর আর যেখানেই থাক, বর্তমানের পশ্চিম বাংলায় নেই। শেলি বলেছিলেন, Hell is a city very much like London। এ-কথাটা এখনকার কলকাতা (আর কলকাতা মানেই পশ্চিম বাংলা) বিষয়ে বেশ খাটে। যে-দেশে জ্ঞানীগুণীদের জীবনে অবসর নেই তার চেয়ে ভয়াবহ নরকের কথা ভাবা যায় না।

হয়তো এই অনবসরের ফলে অনুবাদক দু এক জায়গায় শ্লোকের অর্থটি ঠিক-মত বোঝেন নি। গম্ভীরা নদীর সম্বন্ধে দ্বিতীয় শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের অনুবাদটিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। 'মুক্ত করো সখা তট-নিতম্বেরে সরিয়ে দিয়ে নীল সলিল বাস'—এটা কি মুক্তরোধনিতম্বং নীলসলিল-বসনং হৃত্বার যথাযথ অনুবাদ? আগে থেকেই পশ্চিমশ্রোণিভাগের নীল বসন স্খলিত হ'য়ে গেছে। মেঘকে হরণ করতে বলা হচ্ছে পূর্বশ্রোণিভাগের শিথিল-হস্তে-ধৃত বসনপ্রান্তটি। পরের চরণের লম্বমান কথাটার অর্থসংগতি হয় শুধু পূর্বশ্রোণিভাগের বসন হরণের সঙ্গেই, নিতম্বের বসন হরণের সঙ্গে নয়।

দোষের কথায় সাহিত্যের আলোচনা শেষ করা শুক্তো খেয়ে ভোজ শেষ করার মত। কী আক্ষরিক, কী লাক্ষণিক কোনো ভোজেই "কষায়েন সমাপয়েৎ" নীতি অনুসরণ করা উচিত নয়। সাহিত্যসমালোচনা মূলত রসের কথা, কষের কথা নয়। শিল্পবিচারের নির্মম ক্ষমাহীন মানদণ্ড মেনে নিয়ে স্বীকার করতেই হবে দোষত্রুটি রয়েছে, কিন্তু এ-কথা সকল সময় স্মরণে রাখতে হবে যে অনুবাদে মূলের রস সৃষ্টি করার চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই ব'লে এ-আলোচনা শেষ করব—

> মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
> সুর তবু লেগেছিলো।

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

খুনের মদ

বৌটা ম'রে গেছে, আমি স্বাধীন!
এবার যত খুশি গিলবো খাঁটি।
ছিঁড়েছে টুঁটি তার কান্নাকাটি
ফিরেছি ফাঁকা ট্যাঁকে ঘরে যেদিন।

আকাশ নীল, মেলে বাতাস ডানা···
আমার মতো সুখী বাদশা নেই;
আমরা প্রেমে পড়েছিলুম, সেই
চৈত্রমাস মনে দিচ্ছে হানা।

বিকট তৃষ্ণায় হচ্ছি ক্ষয়,
মেটাতে সেই দাবি চাই এবার
মদের ধারা, যাতে কবর তার
ভরাতে পারে;—সে তো অল্প নয়।

দিয়েছি চাপা সব পাথর ভারি
প্রথমে ফেলে তাকে কুয়োর তলে;
ফিরবে না সে আর, পচবে জলে।
—ভুলতে চাই, যদি ভুলতে পারি!

বাতিল হয় না যা—সোহাগে মেশা
পুরোনো শপথের দোহাই দিয়ে
বলেছি, "হোক ফের নতুন বিয়ে
যখন ছুয়ে ছিলো ছুয়ের নেশা:

লক্ষ্মী, সেইমতো এসো না মিশি
আঁধার ঐ পথে, সন্ধে হ'লে !"
—এলো সে !—নির্বোধ কাকে বা বলে !
পাগল সকলেই, কম কি বেশি !

ক্লান্ত মুখ তার হঠাৎ দেখে
প্রেমের তল যেন খুঁজে না পাই—
তেমনি রূপ তার !—তখনি তাই
বলেছি : "বেরো তুই জীবন থেকে !"

বুঝবে কে আমাকে ?—অন্ধকারে
মাতাল কাঁপে যত যায় না গোনা,
কিন্তু মদে হবে কাফন বোনা
তারা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে ?

নিরেট লম্পট, লোহায় ঠাশা
কঠিন, অচেতন কলের মতো—
গ্রীষ্ম, শীত ঘুরে আসুক যত—
কখনো জানবে না সে-ভালোবাসা,

ডাইনি-জাদু চলে সঙ্গে যার,
মিছিল নরকের অনর্গল,
বিষের শিশি আর চোখের জল,
হাড়ের, শিকলের ঝনৎকার !

—একলা অবশেষে, আমি স্বাধীন !
বেহুঁশ হবো মদে আজ রাতেই ;

ত্রাস কি অনুতাপ কিছুই নেই,
মাটিতে মাথা রেখে, চিন্তাহীন,

পশুর মতো ঘুমে দেবো গা-ঢাকা !
আসুক ছুটে জোর—ভয় না করি—
পাথরে জঞ্জালে বোঝাই লরি
দারুণ ভারি যার দামাল চাকা,

পাপের বাসা এই মাথার খুলি
দিক না পিষে, ধড় হোক দু-ফাঁক,
উড়িয়ে বিদ্রূপে দেবো বেবাক—
দেবতা, শয়তান, ধর্মবুলি !

বিষাদগীতিকা

কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি ?
হও রূপসী, বিষাদময়ী ! অশ্রুজল
নতুন রূপে করে তোমায় শ্রীমতী,
বনের বুকে ঝর্নাধারা যেমতি,
কিংবা ঝড়ে সঞ্জীবিত ফুলের দল।

পরম ভালোবাসি, যখন আনন্দ
তোমার নত ললাট থেকে গেছে স'রে ;
হৃদয় জুড়ে সংক্রমিত আতঙ্ক,
এবং তোমার বর্তমানে, কবন্ধ
গত কালের করাল ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

ভালোবাসি, আয়ত ঐ চক্ষু যখন
তপ্ত যেন রক্ত ঢালে জলের ফোঁটায়,

ব্যর্থ ক'রে আমার হাতের সাধ্যসাধন
অতি পৃথুল দুঃখ তোমার ছেঁড়ে বাঁধন—
নাভিশ্বাসের শব্দে যেন মৃত্যু রটায়।

নিশ্বাসে নিই—স্বর্গসুখের পরিমেলে—
এ কী গভীর স্তোত্র, মধুর আরাধনা!—
কান্না যত ওঠে তোমার বক্ষ ঠেলে;
ভাবি, তোমার হৃদয়তল দেয় কি জেলে
নয়ন দুটি ঝরায় যত মুক্তোকণা?

২

জানি, তোমার হৃদয় শুধু উগড়ে তোলে
জীর্ণ প্রেম, পরিত্যাগে প'চে-ওঠা,
আজো সেথায় কামারশালের চুল্লি জ্বলে,
এবং রয় লুকিয়ে তোমার বুকের তলে
মহাপাপীর অহমিকার ছিটেফোঁটা।

কিন্তু, শোনো, স্বপ্নে তোমার যতক্ষণে
না দেয় ধরা বিকট আভা নরকের,
এবং ডুবে অন্তহীন দুঃস্বপনে
না চাও বিষ, তীক্ষ্ণ ফলা মনে-মনে
বারুদ, ছোরা, কিংবা ছোঁয়া মড়কের,

না পাও ভয় দরজাটুকু খুলতে হ'লে,
করো নিখিল অমঙ্গলের পাঠোদ্ধার,
কেঁপে ওঠো, ঘণ্টা পাছে বাজে ব'লে—

জানলে না, কোন অপ্রতিরোধ অন্ধ বলে
আঁকড়ে ধরে কঠিন মুঠি বিতৃষ্ণার;

রানী, দাসী, সভয় তোমার ভালোবাসায়
তা না-হ'লে ফুটবে না এই উচ্চারণ
অস্বাস্থ্যকর আতঙ্কিত কালো নিশায়
আমার প্রতি পূর্ণ প্রাণের বিবমিষায়—
"রাজা! আমি তোমার সমকক্ষ এখন!"

ফোয়ারা

চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন!
অমনি উদাস ভঙ্গিতে দিক ধরা
হঠাৎ সুখের বিস্মিত শিহরণ।
উঠোনে ফোয়ারা মুখর, বিরতিহীন,
সারা দিনরাত মত্ত প্রলাপে ঝরে,
আজ সন্ধ্যায় যে-আবেশে আমি লীন
সে-রতিপুলকে আরো সে তীব্র করে।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়,
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

এমনি কখনো তোমার অন্তরাত্মা
বিদ্যুৎময় বিলাসের দাবদাহে

মুগ্ধ, বিশাল নীলিমায় করে যাত্রা
ক্ষিপ্র, অধীর আবেগের উৎসাহে।
তারপর, যেন মৃত্যুর মুখে জীর্ণ,
ক্লান্ত ঢেউয়ের বিষণ্নতায় ঝরে,
অদৃশ্য এক ঢালু বেয়ে অবতীর্ণ
হয় সে আমার হৃদয়ের গহ্বরে।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

হে তুমি, রাতের রূপসী, তোমার স্তনে
ঢেকে রেখে মুখ, কী মধুর শুধু শোনা,
এই শাশ্বত বিলাসের আবেদনে,
পাথরে প্রহত কান্নার মূর্চ্ছনা।
জলকলস্বর, পুণ্য যামিনী, চাঁদ,
পল্লবদলে চঞ্চল শিহরণ,
তোমার শুদ্ধ বেদনার অবসাদ
আমার প্রেমের অবিকল দর্পণ।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়,
রঙের সম্ভার লোটে,

অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

প্যারিস-স্বপ্ন

১

ভীষণ দৃশ্য, স্বপ্নের অবদান,
থাকবে যা মর-মানবের অগোচরে,
তার স্মৃতিরূপ, সুদূর, বিলীয়মান,
এখনো, সকালে, আমাকে আকুল করে।

সুপ্তি, তোমার জাদুবিদ্যায় দীপ্ত,
অলৌকিকের অনন্য আবেদনে,
সব উদ্ভিদ—প্রগল্‌ভ, প্রক্ষিপ্ত,
খেয়ালের বশে দিলাম নির্বাসনে,

আর, উদ্ধত প্রতিভার প্রত্যয়ে
রচিত চিত্রে পেলাম অভিজ্ঞান—
মর্মর, ধাতু, জলের সমন্বয়ে
উন্মাদনায় মোহন ঐকতান।

অসীম প্রাসাদ, বাবেল সুবিস্তীর্ণ,
সোপানে বিতানে ধাপে-ধাপে এসে নামে—
উৎস, ফোয়ারা, সরোবরে পরিকীর্ণ—
মলিন অথবা অরুণ কনকদামে;

আর, গুরুভার অনেক ঝর্নাধারা
ধাতুময় তটে ঝোলে গতিহীন বৃষ্টি,

স্ফটিকস্বচ্ছ পর্দার মতো তারা
বিচ্ছুরণের বিলাসে ধাঁধাঁয় দৃষ্টি।

তরুলতা নয়—স্তম্ভশিলার সারি
নিভৃত সায়রে তন্দ্রায় রাখে শান্ত,
দর্পণে যার, যেন মহাকায় নারী,
আত্মালোকনে দানবীরা বিশ্রান্ত।

গোলাপি, সবুজ তটের প্রান্ত ঘেঁষে
আলুলিত নীল সলিল সবিস্তার,
লক্ষ যোজনে ব্যাপ্তির পরিশেষে
বিশ্বলোকের সীমান্ত হয় পার।

মায়াময় ঢেউ, অজানা পাথরে গড়া,
স্তব্ধ সে-জলে পুঞ্জহিমের মতো,
যা-কিছু সেখানে ছায়ারূপে দেয় ধরা
তার উদ্ভাসে নিজেই মূর্ছাহত!

অনেক গঙ্গা, নির্বাক, উদাসীন,
দিগন্ত-জোড়া পাত্র উজাড় ক'রে
ঢেলে দেয় মণিরত্ন অন্তহীন
হীরকে রচিত পাতালের গহ্বরে।

পরিস্থানের স্থপতি, আমার সাধ্য
গড়ে মাণিক্যে সুড়ঙ্গ স্বেচ্ছায়,
যার তল দিয়ে—আমার আদেশে বাধ্য,
মহাসমুদ্র সম্যক ব'য়ে যায়;

সব হ'য়ে ওঠে ভাস্বর, দ্যুতিময়
কালো বরনেও ঝলসে ইন্দ্রধনু;
মহিমান্বিত তরলের পরিচয়
স্ফটিকে বদ্ধ রশ্মিতে পায় তনু।

সূর্য, তারার চিহ্ন দেখা না যায়
যদিও আকাশ দিগন্তে অবনত;
ঐ মায়ালোক জলে যার প্রতিভায়
সে-অনল শুধু আমারই ব্যক্তিগত।

আর এই মহাবিস্ময়ে অবিরল
ঝ'রে পড়ে (এ কী নিদারুণ নূতনত্ব!
শ্রবণে শূন্য, নয়নে অনর্গল!)
চিরন্তনের শব্দবিহীন সত্ত্ব।

২

খুলে যায় চোখ এখনো আগুনে জ্বলা,
সভয়ে তাকাই জঘন্য এই ঘরে,
অভিশাপ, খেদ, দুশ্চিন্তার ফলা
আবার আমার হৃদয় বিদ্ধ করে;

শবযাত্রায় স্বনিত পেণ্ডুলাম
বারোটা বাজায় পাশবিক ইঙ্গিতে,
নভতল থেকে তমসার পরিণাম
ঝরে বিষণ্ণ, মন্থর পৃথিবীতে।

এক শহীদ

খচিত গালিচা, ললিতবিলাসী সরঞ্জাম
এখনো তেমনি ব্যাপ্ত,
মর্মর, ছবি, গন্ধমদির বসনদাম
লাস্যে অপর্যাপ্ত,

উষ্ণ সে-ঘরে, যেথায় বাতাস কালান্তক—
যেন উদ্ভিদভবনে
পুষ্পপংক্তি কাচের কফিনে নিষ্পলক
শেষ নিশ্বাসপতনে,

প'ড়ে আছে শব, ছিন্ন মুণ্ডে রক্ত ঝরে
লাল, সপ্রাণ, দীপ্ত,
বালিশ ভিজিয়ে, উদার চাদর-তেপান্তরে
করে তৃষ্ণায় তৃপ্ত।

অমার প্রসূন, দুঃস্বপ্নের পাংশু রূপ
চোখে চেয়ে করে বিদ্ধ—
তেমনি মাথাটি, ছড়িয়ে নিবিড় কেশর-স্তূপ
রত্নমণিতে ঋদ্ধ,

নৈশ টেবিলে, মহার্ঘ এক অর্ঘ্যভার,
প'ড়ে আছে বিশ্রান্ত,
চিন্তারহিত, আর্ত নয়নে দৃষ্টি তার
শূন্য, ধূমল, সান্ধ্য।

আর শয্যায়, নগ্ন দেহের প্রদর্শনী
খুলে দেয়, নির্লজ্জ,
প্রকৃতির দান, মর্মান্তিক আকর্ষণী,
গোপনীয় সৌন্দর্য ;

এক পায়ে পরা গোলাপি মোজায় সে কার স্মৃতি
সোনার বিন্দুখচিত,
গোপন চক্ষু জলে যেন তার কঠিন বৃতি
দীপ্ত হীরকে রচিত।

অলস, মহান নির্জনতার অঙ্গীকার
আঁকা এ-চিত্রপ্রতীকে,
যেমন কামোদ নয়ন, তেমনি ভঙ্গি তার
জাগায় তামসী রতিকে,

মনে আনে সুখ, চুম্বন আর দুষ্ট ক্ষত
নরকের উদ্বোধনে,
পর্দার ভাঁজে সাঁৎরে বেড়ায় পিশাচ যত
তাদের তৃপ্তিসাধনে ;

তবু দেয় তার যুবতীদশার বিজ্ঞাপন
কাঁধের চকিত দর্প,
সুচারু কৃশতা, তীক্ষ্ণ কটির চটুল কোণ,
আর, যেন বাঁকা সর্প,

লীলায়িত দেহরেখার মাধুরী।—চেতনা তার
নির্বেদে শতছিন্ন,
আত্মাকে বুঝি দূষিত কামের অত্যাচার
ক্ষোভে করেছিলো দীর্ণ ?

জীবিত প্রণয়ে অসন্তুষ্ট কোন পুরুষ—
সে কি, অসূয়ায় আর্ত,
মৃত মাংসের 'পরে মহাকামে নিরঙ্কুশ
করেছিলো চরিতার্থ ?

এঁকেছিলো, তুলে ভীষণ মুণ্ড তপ্ত হাতে—
বল, ওরে অস্পৃশ্য !—
চুম্বন ক'রে নিথর কেশরে, ঠাণ্ডা দাঁতে
শেষ বিদায়ের দৃশ্য ?

—দূরে প'ড়ে থাক পরচর্চার ইতর সুখ,
উকিলের কড়াক্রান্তি,
অজ্ঞেয়া, তোর গহন শয়নে ঘুম নামুক
এবং শান্তি, শান্তি।

প্রেমিক ফেরারি ; তার ঘুম তোর চিরন্তন
প্রতিমায় হয় পিষ্ট ;
র'বে তার কাছে তোর একান্ত সমর্পণ
আমরণ একনিষ্ঠ।

পাঠকের প্রতি

মূঢ়তা, প্রমাদ, কার্পণ্যের পাপে
পূর্ণ হৃদয়, দেহ তিলে-তিলে ধ্বংস,
ভিখিরি যেমন পোষে উকুনের বংশ
আদরে জোটাই খাদ্য মনস্তাপে।

দুর্মর পাপ, অনুতাপ সন্ত্রস্ত,
ঘৃতান্নভোজে পণের মূল্য মানি,
পচা কান্নায় ধুয়ে যাবে সব গ্লানি—
এই ভেবে, হেসে, ফের হই পঙ্কস্থ।

মূঢ় আত্মাকে দোলায় পাপের তল্পে
ত্রিগুণমায়াবী শয়তান, তন্নিষ্ঠ ;
সে-বিজ্ঞানীর বিদ্যায় হয় পিষ্ট
কোনো খাঁটি সোনা থাকে যদি সংকল্পে।

বীভৎসে বাঁধে রমণীয় নির্বন্ধে,
যেখানেই যাই, সে-পিশাচ টানে দড়ি !
দিনে-দিনে তাই নরকে গড়িয়ে পড়ি
আতঙ্কহীন, তমসার পূতিগন্ধে।

বুড়ি বেশ্যার শুকনো শহীদ-স্তনে
দীন লম্পট চুম্বনে করে দীর্ণ ;
আমরাও চাপি গোপন সুখের জীর্ণ
বাসি ফলে আরো কঠিন নিষ্পেষণে।

মগজে, মত্ত পিশাচেরা দল বাঁধে,
যেন কোটি কৃমি, ফেনময়, পরিকীর্ণ;
নিশ্বাস নিই—ফুশফুশে অবতীর্ণ
অদৃশ্য নদী, মরণ, ফুঁপিয়ে কাঁদে।

হায়, আমাদের নেই যথোচিত দৃপ্তি,
নিয়তির পট তাই মালিন্যে মাখা,
ফোটাতে পারে না কোনো মনোজ্ঞ রেখা
ধর্ষণ, বিষ, ঘর-পোড়ানোর দীপ্তি।

কিন্তু পাপের জঘন্য সংসারে
যত শার্দূল, শৃগাল, শকুন, সর্প,
বৃশ্চিক, কীট, মর্কট করে দর্প
নেচে, কুঁদে, ফুঁশে উৎকট চীৎকারে,

সেই দলে এক রয়েছে পরম ঘৃণ্য—
হাঁকে না, ছোটে না, ব'সে থাকে একভাবে,
হাই তুলে যেন সৃষ্টিরে গিলে খাবে,
জঞ্জাল বিনা রাখবে না কোনো চিহ্ন;

—নির্বেদ! চোখে অনভিপ্রেত অশ্রু তার,
হুঁকো টানে আর ফাঁসিকাঠ ছাখে স্বপ্নে।
পাঠক, তুমিও চেনো এ-পিশাচরত্নে,
—কপট পাঠক,—দোসর—যমজ ভাই আমার!

অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু

এক গুচ্ছ রোদ

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

১. আততায়ী

গুচ্ছ-গুচ্ছ শুভ্র রোদ কোথা থেকে লাগলো তার হাতে
পশু-প্রেত সসন্তান সরীসৃপ চমকে দিয়ে সব;
গহ্বরের পেয়ালায় নারী-নাচ, কেয়ার সৌরভ
(কৃত্রিম), ছড়িয়ে পড়ে, ইতস্তত, রক্তাক্ত সংঘাতে।
আততায়ী চিত্রার্পিত; শূন্য ভ'রে শুধু রিভলভার,
হাতকড়া। হঠাৎ কার্তুজ নিয়ে ঘোচায় চিন্তার
মৌমাছির নিষ্ঠুরতা। দু-একটি ম্লান আলো জ্বলে—
রূপসী বৌটি ভাসে অন্তহীন রক্তের পল্বলে।

গ্রাম—অড়হর খেত; কলহাসে শাপলা-পুকুর
কল্লোলিত। রক্তিম কুমুদ-বনে বালকের মুখ:
সেখানে কোথাও নেই আমাদের হৃদয়ের গহন অসুখ
ব্যথা দিতে—শুধু নীল অনশ্বর উজ্জ্বল ময়ূর।

২. কিম্পুরুষ

সুগম্ভীর সেনাপতি এসেছিল তার কুঁড়েঘরে।
শিশ্নোদর ভ'রে এক এনেছিল কঠোর আগুন,
মদিরাভ দুটি চোখে না জানি কী ছিলো তার গুণ,
নাগদন্ত শীর্ণ চাঁদ উঠেছিল সেদিন নগরে।

একটি অপূর্ব তারা কেঁপে-কেঁপে অনন্ত হিল্লোলে
নেচেছিল। কিম্পুরুষ বর্শা তুলে দেখে নাই তাকে ?
ধাবমান সে-নারীর দিকে চেয়ে বলেছে—'তোমাকে
বিদ্ধ করি। আমি সে-ই—লোকে যাকে অন্ধকার বলে।

হয়তো সে কোনোদিন—কতো রাত—ঘুমোবে না আর।
একটি সবুজ শাখা আলম্বিত মায়া দিয়ে ঘিরে ;
পুরোনো গানের টুকরো গুঞ্জরণ করে ধীরে-ধীরে,
উন্মাদিনী হেসে ওঠে ফুল সুদ্ধ খোঁপা নিয়ে তার।

৩. সুন্দরী

নর্দমার তীব্র নাচে ভেসে যায় বসন্তের ফুল।
বাড়ির বুরুজে আলো, তরুলতা শান্ত জানালায় ;
শ্বেতাভ চাঁদের দিকে ধূম্র এক গাছের আঙুল,
অজস্র অস্থির ইচ্ছা সুন্দরীর মুখের আপেল কুরে খায়।

কিছু দূরে রুপোলি ডাকের সাজে নদী ব'য়ে যায়,
তবু কেন ছায়া নামে চিত্রিত ভুরুর সিংহদ্বারে ?
রাশি-রাশি মৃতদেহ প'ড়ে থাকে চোখের কিনারে ?
সে যেন এখন ডুবে যেতে পারে ভালোবেসে গভীর কান্নায়।

বিধ্বস্ত ধনুক নিয়ে ক্লান্ত মেঘে সূর্য পড়ে হেলে,
নিপুণিকা, এমনি কি যাবে দিন ইয়ো-ইয়ো খেলে ?

পর্যাপ্ত

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

'তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দূর'
পূর্বসূরীদের মনোহরণ করেছে।
কিন্তু এদের তো আমি চিনি,—
ছেলেবেলা থেকেই পরগললগ্না হবার প্রত্যাশী,
সযত্নে বাঁধা খোঁপাঢাকা ছোট্ট মগজে
অপরকে আঁকড়ে ধরবার সহজ পটুতা,
সেই একঘেয়ে রান্না, সাজগোজ, রাত্রির বাসর।
কাল আনে জরা, আনে না প্রজ্ঞার শান,—
এরই জন্য কত কবির "সর্বশেষের গান!"
ধন্য কবিরা। কী যে পান।'

আমি এ-যুগের মেয়ে।
রূপসী হ'লেও বাপের রুপোর নেই জোর।
সে-কথা জ্ঞান হবার সঙ্গেই জানা। তাই পড়াশুনো।
তবু কেমন ক'রে ভালোবেসেছি পুঁথিকেই,
এতেই মুক্তি মনের। জীবিকাও বটে (অর্থাৎ ইস্কুলমাস্টারি)।
বিয়ের আশা নেই। তিনটে ব্যর্থ প্রেমের মহড়া পেরিয়েছি।
প্রায় ডুবেছিলুম হতাশায়। কী কাণ্ড!
এই মনোজগৎ বাঁচালো আমায়। বললো, "ওঠো,
চোখ মেলে চাও এ-জগৎটার দিকে। কত অন্ধ,
বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠরোগীর মেলা এ-সভ্যতার প্রাঙ্গণে।
একে সুন্দর করো।"
এদিকে কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বয়স বাড়ে, মেজাজ রুক্ষ।…

"থামো ! থামো !"—বিরক্ত ভাগ্যদেবতা বললেন,
"আর ফিরিস্তি বাড়িয়ো না। বর দেবো ইচ্ছাপূরণের।
পরজন্মে যা চাও, তাই। (অবিশ্যি যদি মানো।)"
স্বপ্নেই চমকে উঠি। বলি, "যদি পরজন্ম থাকে, হে প্রভু !
আবার যেন এ-যুগের মানুষ হ'য়েই জন্মাই,
কেবলমাত্র মেয়ে হ'য়েই নয়,—"
যার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দূর।

অম্বালিকা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার রোগা শরীরটা
বিস্রস্ত বিবর্ণ বিবশ হয়ে প'ড়ে থাকে বিছানায়
এতটুকু। তোমাকে ছুঁতে আমার ভয় করে।
একটি একটি পাঁজর গুনে গুনে যখন
শিশুর চোখের মতন মসৃণ কচি স্তন দুটিতে উপনীত হবো,
বুকের ওপর কান পেতে শুনবো
হয়ত তোমার রক্তেরা কথা ক'য়ে উঠেছে,
নাভিকুণ্ডলীর চারপাশে দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রীগুলো
ছটফট করছে যন্ত্রণায় ;
আর তুমি চোখ বুজে
আমার হিংস্র আক্রমণের প্রতীক্ষা করছো।
তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না
একটিমাত্র দুঃস্বাদ চুম্বনে
তোমার রক্তের সঞ্চয় নিঃশেষে পান করতে পারি ;
তোমার কাতর শীৎকার তখন শুনতেও পাবো না
শুনতে পাবো না অস্ফুট হাসির মতো তোমার কান্না।
তারপর হয়ত এক সময়
কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে তুমি হঠাৎ ম'রে যাবে—
ঠাণ্ডা নিরীহ এতটুকু শরীরটা
মৃত জন্তুর মতো লুটিয়ে থাকবে বিছানায়।

আকাশের জ্যোৎস্না সারা ঘরময় থুতু ছিটিয়েছে
জানলাটা বন্ধ করো, একটু ঘুমোই…
না—না—
অমন ক'রে মাঝরাত্রে আমায় জাগিয়ো না
তোমাকে ছুঁতে আমার ভয় করে॥

দুটি কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

এস্কালেটর

এস্কালেটর বেয়ে প্রথম যেখানে মুখোমুখি দেখা
নয় কিছু রমণীয়, গোছা গোছা ফুল হাতে নেই ; কবিতার কলি
কাঁপন তোলেনি ঠোঁটে :
    সূর্যহীন সুড়ঙ্গের বিদ্যুৎ-ধাঁধাঁনো এক স্বচ্ছ অন্ধকার।

নিরুত্তাপ হিম রাত্রি—পথ যত ভেঙে গেছি আমার শূন্যতা ব'য়ে—
ঘিরেছে নিবিড় ক'রে। পথের ঘুরুনি বাঁক, উঁচু-নীচু, অনুরাগ ঘৃণা,
কৌতুকে উচ্ছল চোখ, অভ্যস্ত ছলনা, হাসি, সব ধুয়ে মুছে
তেলরঙ রূপ নেয় একখানা মুখ।

ঢেউ এসে বুকে লাগে শাদা, নীল, কালো।
আমারও পৃথিবী এই—অনন্তে আলোর বিন্দু—রহস্যের ঘের,
সমস্ত সত্তার স্রোতে আবেগ-কম্পন-তোলা নিরন্ত চেতনা :
যেথানে বস্তুর স্তূপ, শব্দের নির্ঝর বেগ, স্মৃতির বুনোন ;
উদ্দাম ব্যাঞ্জোয় সুর, নাচের আসরে ছায়া, লীলায়িত রূপ ;
কেমন ছুটন্ত সব অথচ কোথায় স্থির অদৃশ্যের কেন্দ্রে।

অবিরাম সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত ওঠা এই অস্তিত্বের অগ্নির ভিতরে,—
বর্ণছত্র ভেঙে ফের দৃশ্যাবলী দুই দিকে—গতিময় মেরুবিন্দু তারা :
কত পিছে সেও আসে—আসে তবু হাসি গান আনন্দবিস্তার ;
আভা ফেলে যায় মনে মুহূর্তের সঙ্গ যার সঙ্গের বেদনা।
নেতির বিলীন ভার, উধাও চলন্ত ধাপ—বিস্তৃত সময়।

ওয়াই ভ্যালি

মেঘ গেল ছায়া ফেলে তোমার সবুজ স্নেহ লাল মাটি উপত্যকা ঘুরে।
আনন্দ কি নদী এক বাঁক নেয় গিরিবর্ত্ম বনান্তের নীলে :
কেমন সহজ লঘু পাখির ডানার ছন্দ—ছন্দে দূর তরঙ্গিত টিলা মাঠ খেত।
ফলের মতন দেহ আতুর ঘুমের ভারে হাসি তবু রৌদ্রের ঝলক ;
তরুপল্লী নিবিড়তা অগাধ রোমাঞ্চ-নীল ভালোবাসা তারি উষ্ণ ছায়া।
ফেরিঘাট একা মেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি···বৃষ্টি ঘুম কুয়াশায় লীন্।

সম্পূর্ণতা···ছুঁয়েছি কি রাত্রির যন্ত্রণা ক্ষত চড়াইয়ের শেষে॥

দুটি কবিতা

সুনীল সরকার

প্রথম ছোঁয়া চাই

পেলুম টলটলে মুক্তোফল
কালের গালে যেন বিন্দুজল।

তখন ভারি এক বুদ্ধি এলো :
আলোর ছুঁচে এর টুকরোগুলো
চমকে দিক্ এই কক্ষতল।

হ'লোও তা-ই। কিছু খ্যাপা প্রহর
কুড়িয়ে ফিরলুম কণিকা তার,
যতই খুঁজি, খাই হৃদয়দোল ;
হঠাৎ পণ করি : সেই নিটোল
প্রথম ছোঁয়া চাই মুক্তোটার।

পাখিটা

বা শূন্যবাদীর প্রতিভাষণ

তোমাদের ধারণাটা কাঁচা,
মনে ভাবো আত্মা এক পাখি
আর, দেহ তার খাঁচা।
আশা করো : খাঁচা খুলে পাখিটা ওড়াবে
বলি, ওড়াবে কোথায় ?

যে-আকাশে পাখা চলে সেটাও ঐচ্ছিক,
তাকে লোপ করা যায়।
এ-সৃষ্টির মানচিত্র যেই পূর্ণ হয়,
ওঠে অতলের ধ্বনি তা নয়, তা নয়…
এর কিছু কিচ্ছু নয়।
তোমার পাখিটা হ'লে মহাব্যোমে
সব-ঝাপটা-সওয়া,
মাধ্যাকর্ষে টেনে তাকে ধরবেই, নেবেই
নির্নাম না-হওয়া।

অপসরণ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যখন স্মরণ করি কেঁপে উঠি এ-প্রৌঢ় বয়সে।
রক্তাতিসারের মতো সাংঘাতিক এখন প্রণয়
চল্লিশের প্রান্তে এসে, তার শুভ্র শরীরের রসে
নির্জনে আপ্লুত হ'য়ে সঞ্চারিত জরাকেই জয়
কখনো সম্ভবপর, ছিলো না ধারণা। রঙ্গালয়
যদিও জীবন, তবু কোনোদিন ভাবিনি রঙ্গিনী
হবে সে-ই আমার নাটকে। ভাবিনি বাসনাভয়
লগ্নশেষে জড়াবে হৃদয়। আমি কখনো দেখিনি

যৌবনের বিচিত্রিত এতো স্তূপ একটি শরীরে।
তাই মিতাচারী হ'য়েও নির্ভয়ে অতি সন্নিধানে
দেখেছি সন্নত দ্বীপে নক্ষত্রমিছিল। ধীরে ধীরে
যখন ঘুচেছে ভয় গন্ধবহ পদ্মের সন্ধানে

রেখেছি নির্ভীক চোখ উচ্চে নীচে শুভ্র সানুদেশে।
ভীত হ'য়ে তারপর স'রে গেছি সংযত স্বদেশে॥

স্মৃতি

দেবতোষ বসু

ভগ্নপক্ষ মেঘের বৈনতেয়
নীলাকাশে চিত্রার্পিত সম্প্রতি
উন্নতধ্বনি সমাগত আষাঢ়েও
খরবায়ু তাকে পাঠায় না আর গতি।
অদূরবর্তী কবন্ধ মরুমায়া
ভ্রান্তিবিলাসে নিরাশা ছড়ায় মনে,
পলাশ-স্মরণ মুখের স্নিগ্ধ ছায়া
সেও বুঝি শেষে গিয়েছে সহমরণে।
শুধু প'ড়ে আছে মৃত মাথুরের স্মৃতি
প্রতিবেশী হাওয়া ডেকে নিয়ে আসে তাকে
অতনুরুচির সুকুমার অনুভূতি
বিদ্রূপ করে বৃদ্ধ বিমূঢ়তাকে।

স্বপ্নবাহিনী ছত্রভঙ্গ আজ
অন্তরীক্ষে ওড়ে বেহিসেবি দিন
শূন্য তূণীরে তবুও তীরন্দাজ
লক্ষ্যভেদেই থাকে অন্তর্লীন।
প্রগত জলের মুখর সপ্তপদী
একদিন তাকে দিয়েছিলো ভালোবাসা,
দুই কূলে আজ ব্যবধান রচে নদী
জলদর্পণে মেলে না ঢেউয়ের ভাষা।

মেলাতে প্রাপ্ত প্রেমের সূত্রাকারে
যা-কিছু হয়েছে বলা সবই নশ্বর,
অনামিকা আজো নাম খোঁজে কান্তারে
দৃষ্টিসীমানা হারায় সবুজ চর।

নিসর্গে তুমি আজকে স্বপ্রকাশ ;
পশ্চাতে টানো আমাকেই বহুরূপে
তবু তো বুঝি না কেন পলাশের মাস
স্মৃতিকে বাঁধে না করুণ অনুষ্টুপে।
অথচ নদীতে প্রস্তুত স্রোতোবেগ
এবং হৃদয় সন্ধিতে বিশ্বাসী,
জলাভাবে মৃতকল্প আদিম মেঘ
স্বগতস্বপ্নে থাকে চিরউপবাসী।
অতএব এক ললাটলিখনই গতি
রক্ষাকবচই বরাভয় অবরোহে—
তাই অর্পিত প্রাণ খোঁজে সংগতি
আপাতত মেকি স্বর্ণসীতার মোহে॥

কবিতা-মেলা

যে-কোনো দেশের পক্ষেই কবিতা-মেলা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা দেশে তো বটেই। গত সাতাশে, আটাশে ও উনত্রিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী-ভবনে যে-কবিতা-মেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল, কবি কিংবা কবিযশঃপ্রার্থী অথবা কাব্যানুরাগী পাঠক—সবার কাছেই সেটি সমান আকর্ষণীয় হয়েছিলো। ছোটোখাটো সাহিত্যসভা নয়, বিগত কবির স্মৃতিসভা উপলক্ষে কবিতাপাঠ নয়, তেপ্পান্ন সালের সেনেট-হলে অনুষ্ঠিত 'কবিসম্মেলন' ছাড়া অন্য কোনো সম্মেলনের সঙ্গে যার তুলনা মনে পড়ে না, সেই তিনদিনব্যাপী কবিতা-মেলা আধুনিক বাংলাদেশের কাব্যচর্চা ও কবিতাপাঠের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। ত্রুটি যে কোথাও ছিল না, তা বলা চলে না, ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি চোখে পড়েছিলো ; শুক্রবার যাঁদের কবিতা পড়ার কথা ছিল, তাঁদের কারো-কারো পরের রাত্রির অনুষ্ঠানের আগে কবিতা পড়বার সুযোগ মেলেনি, কারো-কারো একেবারেই মেলেনি ; প্রথম দিনের প্রথম দিকে মাইকের গোলমালে 'প্রাচীন বাংলা কবিতাপাঠ' সবার কানে পৌছতে পারেনি ; কিন্তু কবিতা-মেলার সামগ্রিক এবং সন্দেহাতীত সাফল্যের তুলনায় এ-সব ত্রুটি অকিঞ্চিৎকর, এবং মার্জনীয়। আলো-জলা মস্ত হল্-ঘরে সুদৃশ্য মঞ্চের ওপর তিনদিন বিভিন্ন কবিতাপাঠ ও নাটক অনুষ্ঠিত হ'লো। শ্রোতারা, বা যাঁরা কবিতা শোনালেন তাঁরা, যে সর্বদাই হল্ঘরের চেয়ারেই বসেছিলেন—তা নয়। কেউ-কেউ দল বেঁধে সামনের মাঠের ঘাসে ব'সে কবিতা শুনছিলেন, কেউ বা নানারঙের নানারকম কবিতার বই-সাজানো বইয়ের-স্টলে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টেছিলেন বইয়ের। ওরই মধ্যে কাব্যগ্রন্থরচয়িত্রী কোনো বর্ষীয়সী মহিলা বুদ্ধদেব বসুর স্বাক্ষর-সংগ্রহের জন্যে আমার কাছ থেকে কলমটা ধার নিয়ে গেলেন। সব মিলিয়ে, বেশ একটা মেলা-মেলা ভাব।

কবিতা-মেলার পক্ষ থেকে শনিবার, আটাশে বৈশাখ, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হ'লো, আমার মতো

অনেকের কাছেই এই ঘটনা অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিলো। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সংবর্ধনার পৌরোহিত্য-সূত্রে তাঁর স্বকীয় ভাবস্নিগ্ধ ভঙ্গিতে এই দুই কবিকে অভিনন্দন জানালেন—বাংলা কবিতার বিবর্তন ও উন্নতির পথে 'কবিতা' ও 'পূর্বাশা'র, বিশেষত 'কবিতা'র, অবদান যে কতখানি, সে-সম্বন্ধেও তিনি শ্রোতাদের সচেতনতা দাবি করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেদিন যে-ক'টি কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তার বক্তব্য লেখকের রচনাসূত্রে আমাদের পরিচিত হলেও, কবিতা-মেলার ঐ আলোক-উদ্ভাসিত মঞ্চে, যাঁরা কবিতা পড়তে ভালোবাসেন একমাত্র তাঁদেরই উপস্থিতির পরিবেশে, অত্যন্ত তাৎপর্যময় মনে হয়েছিলো। আমরা, যারা কবিতা লিখি বা লিখতে চাই, মনে বল পেয়েছিলাম, মনে আছে। শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বক্তব্যও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলো। দুজনেই কবিতা পড়েছিলেন।

সংখ্যায় প্রায় একশো আধুনিক বাঙালি কবির স্বরচিত কবিতা পাঠ ছাড়াও, অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিলো প্রাচীন বাংলা কবিতা পাঠ—যেমন চর্যাপদ বা পদাবলী থেকে; রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় আবৃত্তি করেছিলেন; জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ—পড়েছিলেন শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রী নীরেন্দ্র চক্রবর্তী; বিদেশী কবিদের কাব্যপাঠ—জর্মান অধ্যাপক ডঃ গটফ্রীড ফিশার ও ফাদার আঁতোয়ান থেকে শুরু ক'রে লোকশ্রুত অভিনেতা শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল পর্যন্ত র‍্যাঁবোর কবিতা ও ইংরেজি অনুবাদ প'ড়ে শোনালেন। তদুপরি, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-রচিত সংস্কৃত নাটক 'স্বপ্ন-রঘুবংশম্', শ্রী দিলীপ রায়ের কাব্যনাটিকা 'একটি নায়ক', শ্রী রাম বসুর কাব্যনাট্য 'নীলকণ্ঠে'র অভিনয়, রবিবার সকালে অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক কবিতা-পাঠ ও আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির আলোচনা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রথমদিনের পৌরহিত্য করেছিলেন। ওপরের সমস্ত তালিকাই উল্লেখ-যোগ্যের উল্লেখ মাত্র, ছড়ানো-ছড়ানো ভাবে আরো অনেক কিছু মনে আসছে। বিশেষত, বিদেশ থেকে যে-সব কবি ও বিদগ্ধজন কবিতা-মেলাকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, মাইকের সামনে তাদের পুনরাবৃত্তি

শ্রোতাদের কাছে তৃপ্তিকর হয়েছিলো, মনে পড়ছে। সমস্ত অনুষ্ঠানই তিন দিনে ছড়িয়ে ছিল—প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, বিশেষত দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আরো প্রাণবন্ত হয়েছিলো ব'লে মনে হয়। হয়তো কবিসংবর্ধনার উজ্জ্বল সূচীই তার অন্যতম প্রধান কারণ। কোনো কোনো বর্ষীয়ান ও তরুণ কবির অনুপস্থিতি শ্রোতাদের কাছে বেদনাদায়ক হয়েছিলো।

সমস্ত য়োরোপের মধ্যে, একমাত্র পারীতেই এ-ধরনের কবিতা-মেলার রেওয়াজ আছে। অবশ্য আমরা যতোটা ভেবে থাকি, ততোটা উল্লেখযোগ্য-ভাবে নয়। বিদেশে, টিকিট কেটে, মৃত বা জীবিত কবিদের কবিতা শুনতে যান কেউ-কেউ। সব টিকিট কদাচিৎ বিক্রি হয় ব'লে শুনেছি। সুতরাং, কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই কবিতা-মেলা—নানাভাবে অভিনন্দন ও আলোচনার যোগ্য। কবিতা-মেলা প্রকারান্তরে কবিতা সম্পর্কে আমাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহেরই পরিচয় দেয়, এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সমস্ত পাঠকের কাছে তার দাবি জানায়। নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও, কবিতা সম্পর্কে পাঠকশ্রেণীর শুচিবাই যে এখন অনেকটা ক'মে এসেছে এ-কথা প্রায় জোরগলায় বলা যায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বলা চলে, কবিতার যথার্থ রসাস্বাদ যদিও নির্জনতর পরিবেশেই সম্ভব, কবিতার জনপ্রিয়তার একমাত্র সহনীয় প্রচেষ্টা হিসেবে ও কবিতাপাঠের সার্থক আবহাওয়া-নির্মাতা হিসেবে কবিতা-মেলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এই 'কবিতা-মেলা'র আহ্বায়ক ছিলেন শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী মুরারি সাহা। এঁরা, যাঁরা কবিতা-মেলার শুভানুধ্যায়ী ও সংঘটক মণ্ডলী, এবং যে-কবিরা এই কবিতা-মেলায় কবিতা পড়েছিলেন—তাঁরা সবাই শিক্ষিত বাংলাদেশের ধন্যবাদার্হ।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

চারটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

গ্যেটের অষ্টম প্রণয়

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে মরণ রটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বৃন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জলো ?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা !
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

—হাতেম, হায় কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা !

গ্যেটের নবম প্রণয়

সকলি ভুল ! আসলে নই আমি !
—অস্তমেঘে পদ্মরাগ ফোটে,
ভোরের গাঙে সোনার ঢেউ ওঠে।
এই প্রেমেও অন্য কেউ স্বামী।

ফুরোয় না যে-আগুন, সে কি আমার ?
যে চায় সব, হয় যে তাকে দিতে
মন্ত্রীগিরি, ভ্রমণ ইটালিতে,
গবেষণার সাত-মহলা মিনার।

তেমনি তুমি।—যদিও রাত হ'লো,
জলসাঘরে বিরামহীন বাঁশি,
কেমন ক'রে ঘুমোই আমি, বলো !

তোমায় ছেনে হাওয়ায় আমি রটি,
বাজাই এক নতুন অমরতা ;
আমি সে-নাচ, তুমি কেবল নটী।

গোলাপ, তুমি বুঝবে না এই কথা।
এবং তাই তোমায় ভালোবাসি।

সর্বেশ্বরী

অবশেষে তোমাকে জোগায় খাদ্য যা-কিছু আমার
বিকার, বিক্ষেপ, ব্যাধি, নষ্ট দিন, কষ্টের জীবিকা ;

অজ্ঞান পেশীর পুঞ্জ নেয় টেনে আবৃত শিবিকা,
অন্তরালে নিদ্রাময়ী, অন্য কোনো চিহ্ন নেই যার

ন'ড়ে-ওঠা নিক্বণের এক বিন্দু নিঃসরণ ছাড়া।
—সব, সব তোমাকেই ! আর নেই দ্বন্দ্বের বিচ্ছেদ,
মন্দ ভালো, স্বাস্থ্য রোগ, নিঃশ্রেয়স এবং নির্বেদ
ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায় দেয় অন্ধকারে পরস্পরে সাড়া ;

ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর—
পদার্থের, চেতনায় ; স্পন্দমান মাংসের, মানসে ;
বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে ; অঙ্গারের, নবান্ন-পায়সে ;
এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।

—তবে কেন ভয় ? কেন আজও ত্রাস, আক্রমণ, ঘৃণা,
পাছে চোর নিঃস্ব করে, আয়ু ঝরে যেন মূঢ় মাছি ?
বৎসর হিংস্রক ! কিন্তু আমি তারই চক্রান্তে জেনেছি
যা তোমার সেবা নয়, কিছুতেই আমি তা পারি না।

মুক্তির মুহূর্ত

মাথায় গাধার টুপি, আঁটো গেঞ্জি, ধূসর লুঙ্গিতে
সকালের গোলপার্কে শুরু ক'রে দৈনিক রুটিন,
ফুটপাতে রেখে চোখ, নুয়ে-পড়া মেয়েলি ভঙ্গিতে
চিন্তাশীল মনোযোগে পথে-পথে ঘাঁটে ডাস্টবিন

যতক্ষণ কালিঘাটে স্কুল থেকে না ফেরে ছেলেরা।
—জঞ্জাল, কাচের টুকরো, পচা ফুল, মাছির আহ্লাদ,

কাগজের দামি ঠোঙা, আরো দামি হলুদ সংবাদ,
তা থেকে নিশ্বাস ছেঁকে, জয় ক'রে নৈরাশ্য, কলেরা,

আসে যদি, উজ্জ্বল আধুলি ট্যাঁকে, তোমার বস্তির
ভাঙা গাল, ঝোলা মাংসে গ্যাস-জ্বলা নেশায় অস্থির :—
বোন, তাকে দিয়ো সব, সারসত্য যা-কিছু তোমার,

উদার, উন্মুক্ত বাহু, অনায়াস উরুর বিস্তার,
আর ব্যাপ্ত বিতর্করহিত এক আঁধার গহ্বর—
যার মধ্যে ডুবে গিয়ে, শিখে নেবে সে তোমার কাছে,

এ-জীবনে ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে,
আছে মৃত্যু, মুক্তির মুহূর্ত, আর আছেন ঈশ্বর।

চিঠিপত্র

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপে,

'কবিতা'র আশ্বিন, ১৩৬৩ সংখ্যায় শ্রী নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের "তুজন অসবর্ণ কবি" পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া গেলো। আনন্দ অবিমিশ্র নয় একথা জানিয়েও বলতে ইচ্ছা করে যে এমন বুদ্ধিমান রচনা আমাদের দেশে বিরল। নিরুপমবাবু একাধিক কারণে ধন্যবাদার্হ। জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার মৌল পার্থক্যটি একটিমাত্র উজ্জ্বল উদাহরণেই তিনি পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নকে সন্দেহ ক'রে হয়তো বহুজন বহু কথা জানাবেন, কিন্তু আমি অন্য একটি বিষয়ে আপত্তি জানাতে চাই।

কবিতাটির বক্তব্য সম্পর্কে শ্রী নিরুপম চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন : "প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচার সমাচারই শেষ পর্যন্ত বিচক্ষণ, কেননা কী হয় মানুষের আত্মহত্যায়, জীবনে তার কোনো স্বাক্ষর নেই।" কিন্তু দেখা যাক, মানুষটির মৃত্যুর সমস্ত রকম সম্ভাব্য বাস্তব কারণ খুঁজে কবি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার যে-প্রায়দার্শনিক যুক্তি দেখালেন, তারপরে, কবিতার শেষ তুই স্তবকে প্যাঁচাকে দিয়ে কী বলিয়েছেন :

> তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
> থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
> চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
> চমৎকার !
> ধরা যাক্ তু'একটা ইঁতুর এবার—'

এ বাচনের অর্থ কী ? 'বুড়িচাঁদ বেনোজলে ভেসে' যাওয়ার পরিণামে অন্ধকার এনে দেবে 'চমৎকার' সুযোগ, যখন 'তু'একটা ইঁতুর ধরা' অর্থাৎ জীবনকে উপভোগের উপাদান সব প্যাঁচার পক্ষে সহজলভ্য হয়ে উঠবে! নিরঙ্কুশ ধৈর্যের

আসনে ব'সে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা ক'রে যেতে হবে জীবনের মহাভোজের স্বাদ নেবার। অবশ্যই এ-সিদ্ধান্ত জীবিত পৃথিবীর বিচক্ষণ মানুষদের জীবনাদর্শে পরিপূর্ণ। কিন্তু কবিতার চূড়ান্ত বক্তব্য কি এতটুকুই ?

পূর্বস্তবকে কবি জানিয়েছেন যে নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, সচ্ছলতা সব নয়—দৈনন্দিন পৃথিবীর এ-সব কাম্য বস্তুর উপস্থিতি কি অভাবের সাহায্যে এ-মৃত্যু ব্যাখ্যাত হবার নয়। রক্তের ভিতরের এক বিপন্ন বিস্ময়ের অনিবার্য পরিণতি যে-ক্লান্তিবোধে তাই এ-মানুষটিকে মৃত্যুতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এবং তারপরে প্যাঁচাকে আবার অশথের ডালে বসিয়ে সাধারণ পৃথিবীর জীবনের ফরমূলাই বলবো আউড়িয়েছেন তাকে দিয়ে।

কিন্তু এই প্রগাঢ় পিতামহীটির সিদ্ধান্ত যে কবির চোখেও বিচক্ষণ এমন ইঙ্গিত কবিতার শেষাংশে কোথাও নেই। কবি কদাপি এই বক্তব্যকে স্বাগত করেননি। বরং সেই শেষ স্তবকে জীবনানন্দ বলেছেন :

> হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
> আমিও তোমার মত বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
> কালীদহে বেনোজলে পার ;
> আমরা তুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

এ পংক্তিগুলির অর্থ কী ? জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য ক'রে চ'লে যাওয়া এই অগণিত মানুষের পৃথিবীর জীবনাদর্শ। তুমি তার কথাই বলছো। আমিও সেই "যে পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে" অগ্রসর হবো। কিন্তু, তবু "হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?" নিরুপমবাবু এই জিজ্ঞাসাচিহ্নটি দেখতে ভুলেছেন। এই মৃত মহাজ্ঞানী ব্যক্তি জেনেছিল "যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, তার সাথে মানুষের হয় নাকো দেখা।" তাই সে মৃত্যুতে মুক্তি খুঁজেছে। এই মৃত্যুর এই ব্যাখ্যাটি দেওয়ার পর কবি প্যাঁচাকে অশথের ডালে বসিয়েছেন। তাকে দিয়ে সেই সাধারণ মানুষের জীবনাদর্শের কথা শুনিয়েছেন। নিরুপমবাবু বলেছেন—প্যাঁচাটির সিদ্ধান্ত বিচক্ষণ ব'লেই তাকে কবিতার শেষে আনার দরকার হয়েছে। কিন্তু আসলে মানুষটির মৃত্যুর কারণ

নির্ণীত হওয়ার আলোকে কবি সেই পুরোনো জীবনাদর্শকে প্রশ্ন করেছেন। প্রসঙ্গত, এই প্যাঁচার ভাষণের উল্লেখ আমরা কবিতায় আগে আর একবার পেয়েছি যখন কবি লোকটির মৃত্যুর বর্ণনা এবং কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছিলেন। তখন প্যাঁচার সমাচার লোকটির সিদ্ধান্তকে টলাতে পারেনি। কবি বলেছেন, এই মানুষটির এই অনিবার্য মৃত্যুর পটভূমিকাতেও কি প্রগাঢ় পিতামহীর সমাচার বিচক্ষণ, চমৎকার? তাই, এখন প্যাঁচার সিদ্ধান্ত আরম্ভ করার আগে কবি একটি "তবু" এনেছেন—"তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি।" যেন, এ-মৃত্যুর পর তবুও কি তোমার সমাচারই বিচক্ষণ? কবি যখন "হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?"—ব'লে প্রশ্ন করছেন, তারপরে আসছে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য ক'রে চ'লে যাওয়ার কথা, যেন কবি বলতে চাইলেন জীবনের ভাঁড়ার শেষ ক'রে আমিও হয়তো চ'লে যাবো; তবু আজ এই মুহূর্তে এই মৃত্যুতে এ-সংশয় স্বাভাবিক, সংগত ও সুষ্ঠু যে যে-জীবনের কথা প্যাঁচার তথা পৃথিবীর মুখে শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যই বরেণ্য? এই জন্যই কবি বলছেন, "আমিও তোমার মত বুড়ো হবো।" বার্ধক্যের চরিত্রানুগ উপভোগের লালসা প্যাঁচার কণ্ঠে। কিন্তু যৌবনের যোগ্য সংশয়ের প্রেরণায় কবি প্যাঁচার বিচক্ষণ সমাচারকে প্রশ্ন করেছেন। এই চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাতেই কবির ও কবিতার আসল মানসতা স্পষ্ট। এই মৃত্যুর আলোকে জীবিত পৃথিবীর জীবনের মূল্যবোধকে কবি প্রশ্ন করেছেন। কবিতার শেষ চার স্তবক থেকেই জীবনানন্দের এই সংশয়ের মানসতাটি আভাসিত। এই শেষ চার স্তবকে তাও অনুপস্থিত। "তবু শোনো এ মৃতের গল্প" ব'লে তিনি যে-ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন তাতে ব্যঙ্গ তো নেই, বরং সহানুভূতির আভাস আছে। নিরুপমবাবু বলেছেন—"মৃদু করুণার আভাস আছে।" এই চার স্তবকের আগের সেই রূঢ় ব্যঙ্গময় পংক্তিগুলি স্মরণ করলে মনে হয় যে এতক্ষণ ধরে জীবিত মানুষের বিদ্রূপান্বিত চোখে এ-মৃত্যুর কী রূপ, তা তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন কবি। ব্যঙ্গ থেকে সংশয়ে এই পরিবর্তনই কবির প্রকৃত মানসকে প্রকাশ করেছে। জীবিত লোকের চোখে এ-আত্মহত্যা অর্থহীন। কিন্তু এই আত্মহত্যার আলোকে পুরোনো

জীবনাদর্শে কবির সংশয় জাগ্রত হোলো। এবং এমন একটি সংশয়ই জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যবিচারে স্বাভাবিক। আরও স্বাভাবিক, যখন মনে রাখি এটি 'মহাপৃথিবী'র এক কবিতা।

"ধূসর পাণ্ডুলিপি" যে ঐশ্বর্যময় নিসর্গপৃথিবীর গান তা নিরঙ্কুশ আনন্দের নয়। প্রকৃতির যে-পাঠ নিয়ে কবির পাণ্ডুলিপি রচিত হোলো তা যেন ধূসর। তবু এখানে প্রকৃতির যে-রূপ তা প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পরবর্তী গ্রন্থ "বনলতা সেন"-এ কবির প্রকৃতি-দৃষ্টি ভিন্ন, গভীর এবং গূঢ়, প্রায় দার্শনিক। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভবের বর্জনে নয়, সার্থক অঙ্গীকারে, "বনলতা" এই নামটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতময়, "বনলতা" তথা প্রকৃতি। প্রকৃতিকে তিনি দেখলেন নারীরূপে। এক প্রকৃতি (নিসর্গপৃথিবী) ভাবসাদৃশ্য পেলো আর এক প্রকৃতিতে (নারী)। সংস্কৃত সাহিত্য আর আমাদের বাংলা সাহিত্যেও বনদেবীর কল্পনা যেমন প্রাচীন তেমনি প্রচলিত, তেমনি গূঢ়ার্থময়। 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবি বলছেন তাঁর অন্বেষাজর্জর ক্লান্ত প্রাণকে বনলতা সেন দুদণ্ডের শান্তি দিয়েছিলো, আর শেষ স্তবকে সমস্ত কিছু আলো আয়োজনের শেষে কবি বনলতাকে দেখলেন অন্তহীন প্রশান্তির মধ্যে। ভাবের দিক থেকে এবং রচনার কালের দিক থেকে নিকটবর্তী কবিতাগুচ্ছে আমরা এ-সময়ে কবির প্রকৃতি সম্বন্ধে এক ধরনের দ্বৈত মনোভাব লক্ষ্য করি। প্রথম থেকেই তিনি প্রকৃতির বেদনার, আঘাতের এবং হিংস্রতার দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু একালের কবিতাগুলিতে দেখি তিনি সেই বোধ সম্বন্ধে এক প্রকার সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন। আমাদের জীবন যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিলীন হয় তাহলেই হয়তো নিষ্ঠুর যে অপ্রতিরোধ্য তাকে এড়ানো গেলো। তাই তিনি বলেন, "আমি যদি বনহংস হতাম"। প্রকৃতির জীবন অঙ্গীকার করে নিতে হবে।

পরবর্তী কালে, "মহাপৃথিবী" আর "সাতটি তারার তিমির"-এ তিনি প্রধানত মানবসমাজ সম্পর্কে, যত ভিন্ন এবং হতাশভাবেই হোক না কেন, অবহিত। তবু "মহাপৃথিবী" বলতে বুঝতে হবে নিসর্গপৃথিবী আর মানবপৃথিবীর সমাহার। "মহাপৃথিবী"র কিছু কবিতা যেমন দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ঠ, তেমনি কিছু কবিতা

স্পষ্টত প্রকৃতিকেন্দ্রিক—যেমন, "ঘাস", "সিন্ধুসারস", "হাজার বছর শুধু খেলা করে", ইত্যাদি। এর পর তিনি লিখলেন "সাতটি তারার তিমির"। এ-নামটি আশ্চর্য ইঙ্গিতময়। সপ্তর্ষিমণ্ডল, যাকে আমরা ধ্রুব, অনড় ব'লে জানি, আমাদের এতদিনের বিশ্বাসের যা আশ্রয়, আজকের ক্রান্তিকালে আর সে পথ দেখাচ্ছে না। তাই 'আলো আর আলো নয়, অন্ধকার'। এর পরে আর কোনো গ্রন্থ বেরোয়নি। কিন্তু উত্তরকালে রচিত কবিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টি-ভঙ্গিতে আরও এক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। মানবিক হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার বর্জন নয়, অঙ্গীকারেই প্রকৃতি হবে নূতন অর্থে প্রোজ্জ্বল। তাই তিনি লেখেন "আলো-পৃথিবী" কবিতাটিতে—

> শতকের ম্লান চিহ্ন ছেয়ে দিড়ে যদি
> নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে
> সব গ্লানি না কাটলেও
> তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

এই কবিতাটিতে আমরা জীবনানন্দের প্রকৃতিধারণায় নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখি। প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে, প্রকৃতিপৃথিবীর প্রশান্তির সঙ্গে মানবপৃথিবীর হৃদয়মূল্যের যোগ হলেই পৃথিবী হবে আলোময়—'আলোপৃথিবী'।

নিরুপমবাবু জীবনানন্দের প্রকৃতিদৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছেন তা বহুকাল আগেই আপনি "কালের পুতুলে" জানিয়েছিলেন। জীবনানন্দের প্রকৃতি হেমন্তময় ব'লে দায়মুক্ত হওয়া যায় না। তাঁর প্রকৃতি-দৃষ্টিতে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন, কীটসীয় ইন্দ্রিয়ময়তা থেকে প্রকৃতি-দৃষ্টিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় দার্শনিকতা,—নশ্বর, পরিবর্তনময় প্রকৃতিতে প্রশান্তির সন্ধান পাওয়া, প্রকৃতিলীন জীবনযাপনের ধারণা থেকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে হরিৎ আলোপৃথিবীর চেতনায় উত্তরণ লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শালিখা, হাওড়া — প্রদ্যুম্ন মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশগুহ। কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্র-নাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ১৩ মেট্রপলিটান প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাবলিসিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে আপনার একবিংশ বর্ষের চাঁদা শেষ হ'লো। দ্বাবিংশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৬৪) আগামী নবেম্বরের মধ্যভাগে প্রকাশিত হবে। নূতন বছরের চাঁদা (সাধারণ ডাকে ৪৲, রেজিষ্টার্ড ডাকে ৬৲) আগামী ৭ই নবেম্বরের মধ্যে মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানাই। যাঁরা আগামী বছরে গ্রাহক থাকতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের নিষেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌঁছনো দরকার। যাঁরা চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা না পাঠাবেন, তাঁদের সকলকেই আমরা আশ্বিন সংখ্যা বার্ষিক মূল্যের ভি. পি.তে পাঠিয়ে দেবো। ভি. পি.তে খরচ পড়বে সাধারণ গ্রাহকদের পক্ষে ৫৲, রেজিষ্টার্ড গ্রাহকদের পক্ষে ৭৲; অতএব মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক।

আগামী বছরে যাঁরা নূতন গ্রাহক হ'তে চান, তাঁদেরও উপরোক্ত তারিখের মধ্যে চাঁদা পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানাই। মনি-অর্ডার পাঠাবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুগ্রহ ক'রে দৃষ্টি রাখলে আমরা বাধিত হবো:

(১) নূতন গ্রাহকরা কূপনে "নূতন গ্রাহক" কথাটি লিখে দেবেন।

(২) পুরোনো গ্রাহকরা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করবেন।

(৩) নূতন ও পুরোনো গ্রাহক সকলেই কূপনের উল্টো পিঠে নাম ও ঠিকানা লিখে দেবেন।

এই নিয়মগুলি জরুরি। এর ব্যতিক্রম ঘটলে পত্রিকা পাঠাতে বিলম্ব অথবা গোলযোগ হ'তে পারে।

চিঠিপত্র ও মনি-অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ
কারণ
গুণে অতুলনীয়
লিলি
বিস্কুট
বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ,
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪